শরৎকুমার লাহিড়ী

ও

বঙ্গের বর্ত্তমান যুগ

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear, &c."—*Gray*.

শ্রীসরোজনাথ মুখোপাধ্যায়
বিরচিত

K. LAHIRI AND CO.
56, COLLEGE STREET, CALCUTTA.
1917

মুখবন্ধ।

এক একটি সমাজ যেন এক একটি ফুলবাগান। সযত্নে সুরক্ষিত হইলে উহা যুঁই, শেফালিকা, বেল, গোলাপ, গন্ধরাজ, মালতী, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষে ও বহুবিধ পাতাবাহারে পরিশোভিত থাকে, অযত্নে আগাছা-আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হয়। যাঁহাদের অসাধারণ গুণ আছে, জ্ঞান আছে, ধন আছে, মান আছে, নাম ও পসারপ্রতিপত্তি আছে, তাঁহারা সমাজের গোলাপ-গন্ধরাজ; যাঁহাদের ধন মান পদপসার নাম যশঃ তেমন কিছু নাই, অথচ সদ্‌জ্ঞান সদ্‌গুণ যথেষ্টই আছে, তাঁহারা যেন যুঁই শেফালিকা, যাঁহাদের জ্ঞানগুণ বিদ্যাবুদ্ধি নাই, কেবল ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্য আছে, তাঁহারা মাত্র পাতাবাহার, আর যাঁহারা হিংসক নিন্দক কপটপ্রবঞ্চক তাঁহারা সমাজের আগাছা—কণ্টকবৃক্ষ।

আমাদের এই বহুবাত্যাবেগ বিশৃঙ্খল বঙ্গ-বাগানে বর্ত্তমানে গোলাপ গন্ধরাজ অধিক নাই সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কেবলই যে কণ্টকাবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ বা পাতাবাহারেই পরিশোভিত, তাহাও নহে। এ বাগানে খুঁজিয়া দেখিলে যুঁই কুন্দ শেফালিকা প্রভৃতির অভাব নাই। তবে, দুঃখের বিষয়, তাদৃশ দৃষ্টি-শোভাহীন দেশীয় পুষ্প বলিয়া আমরা ঐ সকলের প্রতি সমুচিত সমাদর করি না।

স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী কে, এবং বঙ্গের বর্ত্তমান যুগের সহিতই বা তাঁহার কি সম্বন্ধ, ইহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তদুত্তরে মাত্র ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ঐ মহাত্মার সবিশেষ পরিচয় এই গ্রন্থপাঠেই জ্ঞাতব্য; তবে, সাধারণতঃ "প্রসিদ্ধ গ্রন্থব্যবসায়ী মিঃ এস্, কে, লাহিড়ী" বলিলে অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারেন। বস্তুতঃ তিনি এই বঙ্গোপবনে একটি বনজাত অপরিজ্ঞাত যূথিকা-বিশেষ,—সৌন্দর্য্যে তাদৃশ নেত্রাকর্ষক না হইলেও সৌরভে সবিশেষ চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নাই।

এই মহাত্মা বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসমাজেরই একজন বিশিষ্ট সামাজিক, এবং বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসমাজে যে সকল দোষ বর্জ্জনীয় ও যে সকল গুণ বাঞ্ছনীয়, উক্ত মহাজনের চরিত্র প্রায়শঃই ঐ সকল দোষ বর্জ্জিত ও ঐ সকল সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত, সুতরাং শ্রেয়ঃপ্রার্থী বর্ত্তমান সামাজিকগণের পক্ষে উহা সবিশেষ শুভদায়ক ও সমাদরণীয় আদর্শ।

যুগপ্রসঙ্গে এই গ্রন্থে বঙ্গের অব্যবহিতপূর্ব্বতন যুগের যৎকিঞ্চিৎ আভাস ও অতীত বর্ত্তমান উভয় যুগেরই বহুবিধ যুগনায়কগণের চরিত্র-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তৎসহ শিক্ষা, বাণিজ্য, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বহুবিধ যুগোপকরণ-বিষয়ের সমালোচনা করা হইয়াছে। ঐ সকল চরিত্রের বা ঐ সকল বিষয়ের সমালোচনা সকলস্থলেই যে ভ্রমশূন্য হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই অস্বীকার্য্য; তবে, কোন চরিত্রের বা কোন বিষয়ের সমালোচনার কোন স্থলেই যে বিদ্বেষ বা একদেশদর্শিতাবশতঃ জ্ঞানতঃ ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয় নাই, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে সাহসী। আমাদের অভিপ্রায়ও সেরূপ নহে। তবে, সমাজের সংশোধন কামনায় আমরা যদি সামাজিক কোন সম্প্রদায়ের, কোন ব্যক্তির বা কোন প্রথার দোষপ্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহা আমরা সদভিপ্রায়ে সহজ কর্ত্তব্যজ্ঞানেই করিয়াছি, বিদ্বেষ-বশতঃ নহে, অথবা যদি গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকি, তাহাও পক্ষপাতিত্ব বা স্তাবকতা প্রবৃত্তিবশতঃ করি নাই। আশা করি, সদাশয় পাঠক মহোদয়গণ তৎতদ্‌বিষয়ে আমাদিগের দোষ গ্রহণ করিবেন না।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থপ্রণয়নে পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থ হইতে আমরা সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

পরিশেষে সানুনয় নিবেদন, এই গ্রন্থে দৃষ্টান্তস্বরূপে বর্ণিত কোন কল্পিত চরিত্রের বর্ণনা পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে উক্তপ্রকার বর্ণনাদ্বারা তাঁহারই বা তৎশ্রেণীরই অপর কোন ব্যক্তির উপর বিদ্বেষকটাক্ষ নিক্ষেপ করা হইয়াছে; অথবা এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া, মাত্র একটি স্থানে কোন একটি বিষয়ের বর্ণনা পাঠ করিয়াই কেহ যেন আমাদিগকে নিন্দক বা স্তাবক বলিয়া অবধারিত না করেন।

এই গ্রন্থপাঠে অধুনাতন উচ্ছৃঙ্খল বঙ্গসমাজে আত্মসংশোধনেচ্ছু ও আত্মোন্নতি-প্রার্থী কোন ব্যক্তিরও যদি কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শে, তবেই শ্রম সার্থক। ইতি—

কলিকাতা,
১১ই বৈশাখ, ১৩২৪।

শ্রীসরোজনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

সূচীপত্র

শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্ত্তমান যুগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গের পূর্ব্বাবস্থা।

আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর অপরার্দ্ধ ভাগের প্রারম্ভকাল; ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ণ প্রভাব। ভারতীয় রাজগণ একে একে সকলেই প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশরাজকে তাঁহাদের সহায়ক শিক্ষক রক্ষকস্বরূপে স্বীকার করিয়া সানন্দে স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব রাজ্যে সুনীতি সুবিধি সুশিক্ষা সুসংস্কারের ব্যবস্থাপন করিতেছেন; চৌরদস্যু ও বিপ্লাবকগণ সমুচিত দণ্ডিত ও সুশাসিত হইয়া শিষ্টশান্ত ভাবে ন্যায়ানুমোদিত জীবিকাহরণে প্রবৃত্ত; বর্গীগণের নিদারুণ অত্যাচার, ঠগীদিগের নির্দ্দয় নরহত্যা ও চৌর্য্যচাতুর্য্য আর কিছুই নাই, গৃহস্থগণ সর্ব্বত্র দিবাভাগে নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিশাকালে নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন; কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যে সিপাহী বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল মহামতি লর্ড ক্যানিংএর নয়-নৈপুণ্যে সংপ্রতি সে অনলও সম্যক্ নির্ব্বাপিত; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতের শাসনরশ্মি এতদিনে মাহামান্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং শান্তিমাতা স্বরূপে স্বকরে গ্রহণ করিয়াছেন; নিবিড় নীরদাচ্ছন্ন ভারতাকাশ পুনর্ব্বার যেন পৌর্ণমাসীর সুনির্ম্মল চন্দ্রিকালোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অভয়বাণী ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে শতকণ্ঠে সমুচ্চারিত হইতেছে,—আর ভয় নাই, ভারত-বাসীর ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাঁহারা রাজচক্ষে ইংরাজ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূনাদরে দৃষ্ট হইবেন না, উপযুক্ত হইলেই সর্ব্বপ্রকার উচ্চাধিকার লাভ করিতে পারিবেন। এ দিকে ইংরাজি শিক্ষার নবপ্রভাবে প্রাচীন সমাজস্রোত সহসা যেরূপ বিপরীত পথে প্রধাবিত হইয়াছিল, প্রথমতঃ প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন

রায়, পরে পূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং ইদানীং মহাতেজস্বী মহাপুরুষ কেশবচন্দ্র সেনের পৌনঃপুনিক প্রয়াসে তাহার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল; ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের শাস্ত্র, ভারতের ভক্ত, ভারতের ভগবান্ সকলই যেন পাশ্চাত্য বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল, সংপ্রতি যেন কি এক আকস্মিক অদ্ভুত বেলাবেগে প্রতিহত হইয়া সকলই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। অনেক দিনের পর প্রজাগণ শান্তসুস্থ চিত্তে নানাবিধ শুভানুষ্ঠানে ও সুখোপভোগে নিরত হইল।

এই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা বড়ই সুন্দর। আমাদের বঙ্গজননী যথার্থই এ সময়ে সুজলা সুফলা নানাশস্য-শ্যামলা; সর্ব্বত্রই জলাগম-নির্গম-পথ সুপ্রশস্ত সুপরিষ্কৃত, ভূমি সরস সমুর্ব্বরা, ঠগীবর্গী অপেক্ষাও অধিকতর মারাত্মক শত্রু ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃৎ ইত্যাদি তখনও বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপন করে নাই, কৃষক-কুল সবল সুস্থকায়, বলীবর্দ্দও বলিষ্ট ও বহুসংখ্যক, ফলতঃ প্রায় প্রতিবর্ষেই প্রচুর শস্যোৎপত্তি; তখনও পল্লীগ্রামে টাকায় পাকি এক মণ চাউল, গাভীগণও যথেষ্ট দুগ্ধবতী, গৃহস্থগণ সুস্থকায় ও নিশ্চিন্ত। ব্যাধি ও কদাচার তখনও বঙ্গে প্রবল নহে, সুতরাং অলসতার মাত্রা নিতান্ত অল্প; আবার ইদানীন্তন সভ্যতা-সংস্কারেরও তখন সূত্রপাত মাত্র, সুতরাং বিলাসিতা ও অভাবের আধিপত্যও নাই বলিলেই হয়।

সে সময়ে বঙ্গের কোন পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলে দেখা যাইত, হয় ত তথায় তখনও একটি চতুষ্পাঠী খুলিয়া একটি দরিদ্র অধ্যাপক দুইচারিটি ব্রাহ্মণ বালককে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিতেছেন, আবার একটি গুরুমহাশয়ও গ্রামের বড়বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে চটাপট্ শব্দে বেত্রব্যবহারে কতকগুলি নিরীহ 'মেষশাবক'কে 'মানুষ' করিয়া তুলিতেছেন; কিন্তু সে বাড়ীর বড়কর্ত্তা হয়ত তখন গ্রামস্থ অপরাপর ভদ্রলোকদিগকে লইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া গ্রামে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনা কল্পনায় নিরত। গ্রামের দু' পাঁচজন কায়স্থব্রাহ্মণ কোন জমীদারী সেরেস্তায় বা কোন নীলকুঠীতে 'কলমবন্দী চাকুরে'; ইহাদের বাড়ীতে বৎসরের মধ্যে দুই চারি বার কোন না কোন উপলক্ষ্যে উৎসবানন্দও হইয়া থাকে, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই যথাসম্ভব অতিথিসৎকারের ত্রুটী নাই; এমন কি দুই একটি নিঃসম্পর্ক আতুর অসমর্থ ব্যক্তিও কোন কোন গৃহস্থের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছেন, গৃহস্বামী দরিদ্র হইলেও তাহাতে বিরক্ত নহেন। নিষ্কপর্দ্দক পীড়াগ্রস্ত প্রবাসী ব্যক্তি এরূপ গ্রামে গিয়া আবশ্যক হইলে বর্ষাধিককালও অক্লেশে বাস করিতে পারিতেন।

সুতরাং রীতিমত দোকান দাতব্যভাণ্ডার ইত্যাদির অভাব তখনও তথায় অনুভূত হয় নাই। গ্রামে একজন 'কবিরাজদাদা' আছেন, তিনি জাতিতে যুগী, ব্যবসায়ে বৈদ্য, বিদ্যায় 'বৃহস্পতি,' প্রত্যেক রোগীর নাড়ীতে হাত দিয়াই তিনি বচন পড়েন,—"দক্ষাপমানসংকুদ্ধ রুদ্র নিশ্বোস সম্ভবা ইত্যাদি।" 'কবিরাজ দাদা' কিন্তু হাত দেখিয়া জীবনে যত রোগীকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছেন, তাহার একটিও ফিরে নাই, বা তীরে গিয়া এক দিনের অধিক কাল বাঁচে নাই। তিনিই গ্রামের শিশুগণের টীকা দিয়া থাকেন, এবং প্রলেপ দ্বারা ক্ষত স্ফোটক এমন কি আঘাত-জনিত অস্থিভঙ্গাদিতেও আরোগ্য বিধান করেন; কিন্তু সংপ্রতি কিয়দ্দূরবর্ত্তী কোন এক গ্রামে জমিদার-বাড়ীতে একটি ডাক্তার আসিয়াছেন, অস্ত্রচিকিৎসাদির নিমিত্ত এখন কোন কোন রোগী তাঁহার নিকটও গিয়া থাকেন। বড় বাড়ীর বড় কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় কোন এক কাঠগোলায় থাকিয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি নামক ইংরাজী স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষার শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন, এবং গ্রামেব আরও দুই একটী বালক বিদেশে থাকিয়া দুই চারিখানি ইংরাজি পুস্তক পড়িয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই এক্ষণে যুবক এবং গ্রামে ইংরাজি স্কুল স্থাপনের নিমিত্ত সবিশেষ উৎসাহী। ইঁহারা তৈল মাখেন না, পান খান না, সাদা থান কাপড় পরেন, গায়ে সাদা কামিজ, তাহাব হাতের ও গলার বোতাম প্রায়ই খোলা থাকে, মিথ্যা কথা বা পবদ্রোহ হইতে একেবারেই বিরত; ইঁহাদিগের মুখে অনেক সময়েই কেশব সেনেব কথা শুনিতে পাওয়া যায়; গ্রামের প্রাচীনেরা ক্বচিৎ কখনও বা 'মৌলবী' রামমোহন রায়ের কথাও কহিয়া থাকেন। বড়কর্ত্তা প্রত্যুষে যখন 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া শয্যাত্যাগ করেন, বড় বাবু অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্র তখন 'ও লর্ড' (হে প্রভো) বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শয্যায় বসিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত সর্ব্ববাদিসম্মত স্তোত্রটী পাঠ করিয়া থাকেন; এবং প্রাচীনবর্গ যখন কেহ প্রাতঃস্নান, কেহ পুষ্পচয়ন, কেহ বা গোগৃহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন, তখন বড় বাবু অন্যান্য যুবকগণ সঙ্গে প্রান্তরে মর্ণিংওয়াক্ অর্থাৎ প্রাতর্ভ্রমণ করিতে যান। বড়কর্ত্তার গৃহিণী গ্রামের অপরাপর স্ত্রীগণের সঙ্গে সাহ্লাদে কহিয়া থাকেন, 'কোম্পানির সাহেবে কহিয়াছিল, আমার বড় খোকা আর ছয়মাস পড়িলেই ডিব্টি কালেক্টর হইতে পারিত, কিন্তু ছেলে পাছে খিষ্টান হয়ে যায়, এই ভয়েই কর্ত্তা ছাড়াইয়া আনিলেন।'

বঙ্গের তৎকালীন লোকালয়ে স্বাস্থ্যশান্তি সুখসুবিধা সুন্দররূপই ছিল, ছিল না কেবল উপযুক্ত বিদ্যালয়, উপযুক্ত দোকানপসার এবং উপযুক্ত রাস্তাঘাট,

আর ছিল না ইদানীং-প্রয়োজনীয় বা বিলাসোপযোগী সামগ্রী। দশখানি গ্রাম প্রদক্ষিণ করিলেও একটি চুরট্, একপয়সার চা বা একটি ওয়েষ্ট্ কোট দেখা যাইত না। মোহর অলঙ্কার নোট কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদির দর্শন অনেকের ভাগ্যে অল্পই ঘটিত বটে, কিন্তু ভিখারিণীর পর্ণকুটীরেও অনুসন্ধান করিলে তখন ভূগর্ভপ্রোথিত যৎকিঞ্চিৎ গুপ্তধন পাওয়া যাইত।

এই সময়ে বঙ্গের ভদ্রসমাজে, ইংরাজি শিক্ষাই আদরণীয় এবং অবশ্যকর্ত্তব্য, সংস্কৃতশাস্ত্র অতিরঞ্জিত ও অসমদর্শী, পরিমিত মাত্রায় সুরাপান ও তৎসহ মাংসাদি-সেবন তেজস্কর স্বাস্থ্যকর ও সুসংস্কার-সম্মত, ন্যায্যবিষয়ে গুরুমর্য্যাদালঙ্ঘন যুক্তি-সঙ্গত, পৌত্তলিকধর্ম্ম বেদবিরুদ্ধ, জাতিভেদ বা ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার কুসংস্কারমূলক, ইত্যাদিরূপ ধারণা ক্রমশঃ মর্ম্মগত হইয়া আসিতেছে। এ দিকে কেশবচন্দ্রের উজ্জ্বল প্রতিভায় ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন দীপ্তিময় হইয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Rev. K. M. Banerji), মাইকেল মধুসূদন দত্ত, লালবিহারী দে (Rev. Lal Behari De) গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (তরুদত্তের পিতা) প্রভৃতি মহামনীষিগণ যে জোয়ারে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সে জোয়ার সরিয়া গিয়াছে; এক্ষণে ইংরাজি শিখিয়া ভদ্রসন্তানগণ সহসা আর খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন না, বরং সহজেই সুস্পষ্টে বা অস্পষ্টে সকলেই যেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন। ব্রাহ্মসমাজেও আবার রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব স্তিমিতপ্রায় কেশবচন্দ্রের দীপ্তিচ্ছটা যেন দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে। ইতঃপূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ-বিধি প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় হিন্দুমতে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে এই বিধবা-বিবাহের কথা লইয়া বাদানুবাদ হাস্যপরিহাস অনেকরূপই চলিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতালপঞ্চবিংশতি,' 'বোধোদয়,' 'উপক্রমণিকা' প্রভৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 'তত্ত্ববোধিনী' বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তত্ত্বজ্ঞান-গাম্ভীর্য্যে ক্রমশঃ গম্ভীর করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ও গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যঙ্গরঙ্গ তখনও কিয়দংশ সমাজের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎসিংহ আয়েসা তিলোত্তমা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রদত্ত সূর্য্যমুখী, বা দীনবন্ধুর রেবতী লীলাবতী নদেরচাঁদ প্রভৃতি তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই; মাইকেল মধুসূদনের মধুরভৈরব ভেরী তখনও বঙ্গে বাজে নাই। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে-লাইনটি মাত্র খুলিয়াছে, তখনও পূর্ব্ববঙ্গবাসী তীর্থযাত্রী শত শত নরনারী লাইনের নিকটে

আসিয়া, হুস্ হুস্ শব্দে বাষ্পযানশ্রেণী আসিতেছে দেখিয়া চমকিতচিত্তে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকেন। তখনও সুদূরপল্লীবাসী প্রাচীনগণ যুবকগণের মুখে হাওড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্মে বাষ্পযান যাতায়াতের কথা শুনিয়া বিজ্ঞতা-ব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিয়া থাকেন,—'পাগল না কি! একি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা? এত লোহা পাইবে কোথা?'

বঙ্গের নারীসমাজের অবস্থা মোটের উপরে তখন ভাল কি এখন ভাল, সে বিচার সহজ নহে। তখন ভদ্রসমাজে শতসংখ্যকের মধ্যে একটী নারীও লিখিতে পড়িতে জানিতেন কি না সন্দেহ; তবে ক্বচিৎ দুইএকটি ভদ্রমহিলা যাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের হাতের বাঙ্গলা লেখা দেখিয়াছি, এখনকার অনেক শিক্ষিত যুবকের হস্তলিপি অপেক্ষা সুন্দর, ইঁহারা প্রায় প্রত্যহই অপরাহ্নে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিতেন। দাশরথি রায়ের পাঁচালীর ছড়া দুই চারিটী প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থকন্যারই কণ্ঠস্থ থাকিত। ভদ্রসমাজে এমন পরিবার ছিল না যাহার মধ্যে কোন না কোন নারী প্রতি বর্ষেই দুর্ব্বাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দ্দশী, অন্নদান, সাবিত্রীচতুর্দ্দশী ইত্যাদি কষ্টসাধ্যব্রতের সকলগুলি না হউক অন্ততঃ দুই একটিরও যথারীতি অনুষ্ঠান করিতেন না। ভদ্রাভদ্র সকল নারীই তখন সাবানের পরিবর্ত্তে খৈল দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতেন, এবং সধবাগণ গাত্রমার্জ্জনে তৈল, হরিদ্রা ও দুগ্ধফেণ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের বস্ত্রালঙ্কার বেশভূষা ইত্যাদির বাহুল্য এককালেই ছিল না. স্বাস্থ্য সাধুতা অনালস্য অমায়িকতা প্রভৃতিজনিত পবিত্রশ্রীতে তাঁহারা সকলেই শ্রীমতী। কুমারীগণ সাধারণতঃ অনায়াসসাধ্য ব্রতাদির অনুষ্ঠান ও অনেকে প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন; বিধবাগণ সকলেই ব্রহ্মচারিণী, পবিত্রদর্শন, পরোপকারিণী, শিশু-রোগী দেবাতিথি ও গবাদির সেবায় সতত নিরতা। কুলীন ব্রাহ্মণকন্যাগণের মধ্যে অনেক চিরকুমারী দেখা যাইত বটে, কিন্তু সমাজে ব্যভিচারমাত্রা তখন অধিক কি এখন অধিক তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এ কথা ঠিক যে তখনকার স্ত্রীগণ এখনকার অপেক্ষা সমধিক বীর্য্যবতী সুতরাং ধৈর্য্যশীলা, শ্রমরতা, বিলাস-বর্জ্জিতা এবং গুরুজনের ও সমাজশাসনের ভয়ে সতত ভীতা। প্রবীণাগণ গর্ব্ভিণী ও শিশু-গণের পালনে ও চিকিৎসায় সবিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন; কোন কোন পল্লীগ্রামে নীচজাতীয়া নিরক্ষর স্ত্রীগণের মধ্যে এমন এক একটি ধাত্রী ছিল যাহারা এমন কি দেশীয় কর্ম্মকারনির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গর্ব্ভিণীর উদর মধ্য হইতে মৃত সন্তান খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিতে পারিত।

এই সময়ের স্ত্রীগণ কেহ কেহ বড়ই তেজস্বিনী, বলিষ্ঠা কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়-সঙ্কল্পা ছিলেন। কেহ পদব্রজে পুরীধামে যাত্রা করিয়াছেন, কেহ সর্ব্বজয়ার ব্রতাবলম্বনে অনাহারে অনাবৃত দেহে অঙ্গনের মধ্যস্থানে শ্রাবণের ধারামুখে নিপতিত রহিয়াছেন, কেহ বা পরিবারস্থ কাহারও উপর অভিমান করিয়া অন্নাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাত্র শাকাদি ভোজন দ্বারা প্রাণধারণ করিতেছেন, কোথাও বা কোন ভীমা গভীর রাত্রিতে গৃহপ্রবিষ্ট দুর্ব্বুদ্ধি চৌর বেচারাকে ধৃত করিয়া আমিষখণ্ডিকা (আঁইষবটী) দ্বারা উগ্রচণ্ডা স্বকরে তাহার নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছেন, এরূপ সংবাদ সে সময়ে মধ্যে মধ্যেই শুনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু, এখনকার তুলনায় তখনকার কুলাঙ্গনাগণের মধ্যে আত্মহত্যারূপ মহাপাপের প্রসার ছিল না বলিলেই হয়। কলিকাতা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে তখন শিক্ষা সভ্যতা ও বিলাসিতার সূত্রপাত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রতনিয়মাদির ও বৈধব্য-ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতাও কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেই রাজা রামমোহন রায় তথা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ মহানুভবদ্বয়ের চেষ্টায় সহমরণপ্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে ; সুতরাং সে সময়ে আর কুত্রাপি সতীদাহের সংবাদ বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না।

তখনও বঙ্গে তান্ত্রিক সাধনপ্রথা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। দশবিশ-খানি গ্রাম খুঁজিলেও অন্ততঃ একটি 'পাগ্‌লা ভট্টাচার্য্য' বা 'জটে ঠাকুর' দেখিতে পাওয়া যাইত। এই সকল সাধক মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করিতেন, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার বা জাতিবিচার বিষয়ে এবং অন্যান্য সাংসারিক বিষয়েও ইঁহারা অনেকাংশে উদাসীন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে যথার্থই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ভক্তিমান্ মহাপুরুষ ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। মেহার, মিত্রা, সেনহাটী, ব্যান্দা, মেঢ়তলা প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচার্য্যবংশ ও কালিয়ার বৈদ্যবংশ সে সময়ে ঘোর তান্ত্রিক। এই সকল বংশে তখন অনেক শাস্ত্রজ্ঞ সাধু মহাপুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। আবার মুসলমানগণের মধ্যেও তখন অনেক উচ্চশ্রেণীর ফকীর দেখা যাইত ; ইঁহাদের পান ভোজন আচার ব্যবহার ইত্যাদিতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ লক্ষিত হইত না ; একারণ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ইঁহাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এই সকল তান্ত্রিক সাধু ও মুসলমান ফকীরগণ, ঘোষপাড়ার স্বনামখ্যাত ঘোষঠাকুরগণ, বাউল বৈষ্ণবগণ, এবং রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণই বঙ্গে জাতিভেদ বিষয়ে অধুনাতন সর্ব্বজনীন সাম্যবুদ্ধির প্রধান প্রবর্ত্তক।

আচারবিচারে জাতিগত পার্থক্য তখন অপেক্ষা এখন অনেক কমিয়াছে সত্য, কিন্তু জাতিগত বিরোধ এখন অপেক্ষা তখন কম ছিল কি অধিক ছিল তাহা অবধারিত করা কঠিন। একথা নিশ্চিত যে, এখনকার ব্রাহ্মণগণ শূদ্রগণের প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত, তখনকার ব্রাহ্মণগণ তাহা যদিও করিতেন না, তথাপি শূদ্রগণ তখন ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য এখন অপেক্ষা অবিরোধে অধিক মাত্রায় মানিয়া চলিতেন; নবশাখ, যোগী (যুগী) বা নমঃশূদ্রাদি জাতীয় ব্যক্তিগণও কায়স্থের শ্রেষ্ঠত্ব অনাপত্তিতে স্বীকার করিতেন। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ তখন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জাত্যভিমান তখন অধিক ছিল কি এখন অধিক হইয়াছে তাহা স্থির করা সহজ নহে।

এই সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, কেশবচন্দ্র সেন, প্রভৃতি মহোদয়গণই শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের আদর্শপুরুষ। ইঁহাদের উপদেশ এবং ইঁহাদের চরিত্রই ক্রমশঃ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শিক্ষিত যুবকগণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতেছিল।

উক্ত স্বর্গীয় মহাপুরুষ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ই আমাদের গ্রন্থনায়ক স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের পিতা; জননীর নাম গঙ্গামণি দেবী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বংশপরিচয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধভাগ অতীত হইয়া অপরার্দ্ধকালের আরম্ভ হইলে রামতনুলাহিড়ী মহাশয় শিক্ষকতা উপলক্ষ্যে সপরিবারে কলিকাতা নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই কলিকাতা নগরীতেই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ভাদ্র তারিখে শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়।

রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত এমন কি প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া পরিগণিত। এই স্বনামধন্য দেবর্ষিকল্প সাধুপুরুষের বিস্তৃত জীবনচরিত পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাতব্য। এস্থলে মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল :—

নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে লাহিড়ীগোষ্ঠী ও রায়গোষ্ঠী দুইটিই পুরাতন এবং প্রসিদ্ধ। রায়গোষ্ঠীর অনেকেই কৃষ্ণনগর রাজএষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন। স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল রায় এখনও উক্ত রাজ এষ্টেটের দেওয়ানি পদে নিযুক্ত আছেন। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার ও ঔপন্যাসিক স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় ডি, এল, রায় (৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) এই কার্ত্তিকেয় রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র। এই রায়বংশের সংস্রবেই কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠা, এবং এই লাহিড়ী বংশের অনেকেও অনেক সময়ে রাজএষ্টেটে উচ্চপদে কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ রায়বংশের কন্যা বিবাহ করিয়া মাটিয়ারি নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রায়মহাশয়েরাও তখন মাটিয়ারিতেই বাস করিতেন। তখনও ইঁহারা দেওয়ান। পরে এই দেওয়ানবংশ আসিয়া কৃষ্ণনগরে বাস করিলে, সেই সঙ্গে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামহরি লাহিড়ী মহাশয়ও আসিয়া কৃষ্ণনগরে বাস করিলেন।

রামতনু বাবুর প্রপিতামহ রামগোবিন্দ লাহিড়ী মহাশয় বড়ই ঈশ্বরপরায়ণ সদ্গুণালঙ্কৃত সাধুপুরুষ ছিলেন। রামগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকিঙ্কর লাহিড়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান মুন্সী, গোবিন্দও মহারাজের একজন প্রধান পারিষদ। পুণ্যশ্লোক রামতনু ও তৎপুত্র সাধু সৌভাগ্যবান্ শরৎকুমার উভয়েই

যে গুণে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই অকৃত্রিম সাধুতা, শিষ্টাচার, সহানুভূতি, ঈশ্বরানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণগ্রাম ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষীয় অপূর্ব্ব স্থাবর সম্পত্তি।

মহারাজের মুন্‌সী রামকিঙ্কর ওরফে কিঙ্কর লাহিড়ী যথেষ্ট উপার্জ্জনশীল ছিলেন, অথচ নিঃসন্তান। কিঙ্করের কনিষ্ঠভ্রাতা, রামতনুর প্রপিতামহ রামগোবিন্দ ওরফে গোবিন্দ লাহিড়ী পঞ্চপুত্রের পিতা, কিন্তু নিঃসম্বল। সেকালে যাঁহারা জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারা প্রায়ই কূটবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উঠিতেন। কিঙ্করও এইরূপ কূটনীতির অনুসরণ করিয়া গোবিন্দকে পৃথক্ করিয়া দিলেন। সুচতুর জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মানুরাগী সরল-প্রকৃতি কনিষ্ঠের মনোভাব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি এক অংশে অধিকাংশ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং অপরাংশে শালগ্রামশিলা ও অল্পাংশ পৈতৃক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া কনিষ্ঠকে যথামনোনীত অংশ গ্রহণ করিতে কহিলেন। সাধু গোবিন্দ সাগ্রহে শালগ্রামশিলা ও সেবার্থ যৎকিঞ্চিৎ দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। সুতরাং সাধুতার সহজসহচর চিরদারিদ্র্য আসিয়া তাঁহার সহবাসী হইল। এই কিঙ্কর ও গোবিন্দ লাহিড়ীরই পরিচয় কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তৎপ্রণীত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

> "কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুন্‌সীপ্রধান।
> তার ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান্॥"

গোবিন্দের পাঁচপুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র কাশীকান্ত লাহিড়ীই রামতনুর পিতামহ, শরৎকুমারের প্রপিতামহ। কাশীকান্তের দুই পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস লাহিড়ী কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশচন্দ্রের দেওয়ান ও প্রতিনিধি স্বরূপে অনেক সময়ে কলিকাতায় থাকিয়া এমন কি বড়লাটের সভাতেও যাতায়াত করিতেন; কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ সাধু ও ধর্ম্মশীল। ইনি শেষ-জীবনে প্রায় সততই দেব-দ্বিজ-সেবায় নিরত থাকিতেন; প্রত্যহ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমে যে ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দেখিতে পাইতেন তাঁহাকেই যৎকিঞ্চিৎ দান করিতেন। এই সাধুবদান্য রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয়ের পঞ্চম পুত্রই বঙ্গের সুবিখ্যাত নর-দেবতা স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী। দেওয়ান রাধাকান্ত রায়ের কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবীই রামতনুর জননী।

১৮১৩খৃঃ অব্দে রামতনু লাহিড়ীর জন্ম এবং ১৮৯৮খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়। এই কিয়ন্ন্যূন সুদীর্ঘ শতাব্দী পরিমাণ কাল সেই দেবমানব এই মর্ত্ত্যধামের প্রবাসী

হইয়াছিলেন। এই কাল ব্যাপিয়া সেই স্বর্গচ্যুত নন্দন-মন্দারের সুপবিত্র মকরন্দ পানে বঙ্গবাসী পরিতৃপ্ত, পুলকিত, ও পরমোপকৃত হইয়াছেন, ভাগ্যক্রমে কেহ বা অমরত্বও লাভ করিয়াছেন। স্বর্গের পারিজাত যথাকালে পুনর্ব্বার স্বর্গে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার অবিনশ্বর পুণ্যসৌরভে অদ্যাপি বঙ্গভূমি—কেবল বঙ্গভূমি কেন,—সমগ্র ভারতভূমি, এমন কি ইউরোপখণ্ড পর্য্যন্ত আমোদিত রহিয়াছে; অধ্যাপকতা বিষয়ে অদ্যাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'The Arnold of the East' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

রামতনু বাবুর মাতা জগদ্ধাত্রী দেবী নারীকুলের আদর্শ। তিনি যথেষ্ট ধনমান-সম্পন্ন দেওয়ানবংশের কন্যা হইয়াও সাতিশয় নিরভিমান ও অমায়িকস্বভাব ছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'সাক্ষাৎ লক্ষ্মী' বলিয়া জ্ঞান করিত। রামতনুর জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশবচন্দ্র লাহিড়ীর ন্যায় মাতৃভক্ত মহাপুরুষ একাল সেকাল সকল কালেই সুবিরল। কথিত আছে, কেশবচন্দ্র জননী জগদ্ধাত্রী দেবীকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় তাম্রকুণ্ডে স্থাপন করিয়া সচন্দন তুলসীপত্রে পূজা করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মভীরু রামকৃষ্ণপত্নী কম্পিত কলেবরে 'কেশব কেশব, কর কি! আমার যে গা কাঁপচে!' বলিয়া চরণদুখানি সরাইয়া লইতে উদ্যত হইলে, প্রগাঢ়ভক্তিমান্ সাধু পুত্র কহিতেন, 'রাখ রাখ, মা তুমিই আমার পরমারাধ্য প্রত্যক্ষ দেবতা'। কেশবচন্দ্রের পিতৃভক্তিও অনুকরণীয়। তিনি ইংরাজি ও পারস্য ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া যশোরে জজের সেরেস্তা-দারের পদ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, এই সময়ে বাটী হইতে পিতার পত্র আসিলে কেশবচন্দ্র অগ্রে উহা মস্তকে ধারণ করিয়া তৎপরে খুলিয়া পাঠ করিতেন। দুঃখের বিষয়, রামকৃষ্ণ ও জগদ্ধাত্রী দেবীর বহুপুণ্যার্জ্জিত হৃদয়ের ধন এই পুত্ররত্নটিকে যশোরের কাল-ম্যালেরিয়াজ্বরে অকালে হরণ করিয়াছিল।

রামতনুর কনিষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণনগরের স্বনামখ্যাত ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ীও বড় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার পরোপচিকীর্ষা, মধুরভাষিতা ও সহৃদয়তার বিষয় স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের আত্মজীবনীপাঠে সবিশেষ জ্ঞাতব্য।

জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ কালীচরণ ব্যতীত রামতনু বাবুর আরও কয়েকটি ভাই ও দুইটি ভগিনী ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন।

রামতনু বাল্যকালে স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ ডেভিড্ হেয়ারের

ছাত্র ছিলেন। এই মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের পরার্থপরতা, অমায়িকতা, বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি গুণের তুলনা নাই। বঙ্গবাসিগণ এই সাধুমহাজনের নিকট প্রকৃতই অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। ইঁহার স্বার্থত্যাগের কথা অধিক আর কি বর্ণনীয়, ইনি এদেশে আসিয়া ঘড়ির কারবার করিয়া যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই এদেশের বালকগণের বিদ্যা ও নীতি শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিয়া অবশেষে বড়ই দরিদ্রদশায় পতিত হইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর জন্য ইনি শেষদশায় স্বদেশীয়গণ কর্ত্তৃক, কথায় সমাদৃত হইলেও, কার্য্যতঃ একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছিলেন। এদেশীয় লোকের সহিত অনেক বিষয়ে বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা ও ঐকমত্য থাকায়, এই মহাত্মার মৃত্যুঅন্তে ঈর্ষাপরায়ণ খৃষ্টিয়ান্ সম্প্রদায় তাঁহাদের সাধারণ সমাধিভূমিতে ইঁহার মৃতদেহ সমাহিত করিতে দেন নাই। অগত্যা তাঁহার জীবনব্যাপী কার্য্যক্ষেত্র—হিন্দুপল্লীর মধ্যস্থলে অর্থাৎ গোল-দিঘীর দক্ষিণ ধারে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হইল। তথায় তাঁহার প্রস্তর-ময় স্মৃতিস্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান। মহাত্মা ডেভিডের কোন একটি ছাত্র বৃদ্ধবয়সে একদিন আমার নিকট তাহার এই পরমারাধ্য শিক্ষাগুরুর সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প বলিতেছেন, বলিতে বলিতে—দেখিতে লাগিলাম—ক্রমে তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত ও চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিতে লাগিল; কিয়ৎকালপরেই একেবারে কণ্ঠরোধ! আর বাক্যনিঃসরণ হইল না, নেত্রদ্বয় কিন্তু অনিবার্য্যবেগে অশ্রুধারা-বর্ষণে তাঁহার অন্তরের সকল কথাই কহিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ মাতৃহারাবালকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই হৃদয়ারাধ্য গুরুর অসীম গুরুত্ব ধ্যান করিয়া এবং সেই গুরুগতপ্রাণ প্রশস্য শিষ্যের বিশুদ্ধ ভক্তি ও অনুরাগসূচক সাত্ত্বিক লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া আমারও তখন চক্ষু হইতে অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু আনন্দাশ্রু নিপতিত হইল। মনে মনে কহিলাম,—ধন্য গুরু! ধন্য শিক্ষা! ধন্য শিষ্য! বোধ করি বলিলে বাধা হইবে না,—রামতনুও আমাদের এই হর-গুরুর হরি-শিষ্য।

১৮১৭খৃঃ অব্দে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামতনু হেয়ার সাহেবের স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া পরে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। ডি, রোজিও নামক একজন এদেশীয় সাহেব তখন হিন্দুকলেজে অধ্যাপকতা করিতেন। ইঁহার সদুপদেশ সদ্ব্যবহার ও সহৃদয়তাগুণে অধিকাংশ ছাত্রের চিত্তই ইঁহার প্রতি সাতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। ডি, রোজিও স্বয়ং সুপণ্ডিত ও সুকবি। অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের আবিষ্কারক বঙ্গের অদ্বিতীয় মহাকবি মাইকেল

মধুসূদন দত্ত এই ডি, রোজিওর একজন প্রধান ছাত্র। ইঁহার অপরাপর ছাত্রগণ অনেকেই বর্ত্তমান অনেক শিক্ষিত বঙ্গসন্তানের পিতা অথবা পিতামহ এবং বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভাবলে অনেকে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছিলেন। ডি, রোজিওর শিক্ষাগুণে সুনীতি ও সুবিবেকের অনুসরণবিষয়ে রামতনু তাঁহার সতীর্থ ও সহচরগণের মধ্যে ক্রমশঃ আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। অকপটাচার ও স্বকৃত-পাপের নিমিত্ত অনুতাপ এই দুইটিই তাঁহার বাল্যসাধনার মূলমন্ত্র। বাল্যকাল হইতেই তিনি কপটাচার ও অন্যায়াচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। এমন কি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজপতিরও যখন সুবিবেকানুসরণে কিঞ্চিন্মাত্র পদস্খলন হইত, ন্যায়ের কৃপাণধারী এই নবীন বীরসাধক তৎক্ষণাৎ তাহার তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করিতেন। নিজমনে যখনই যাহা যুক্তি ও বিবেকসঙ্গত বলিয়া বুঝিতেন, তদ্দণ্ডেই শতস্বার্থবিসর্জ্জনেও সেই বিবেকানুবোধ সম্যক্ রক্ষা করিতে রামতনু যেন রণোন্মুখ! এ সাধনে সে সাধক সেকালের বঙ্গে যথার্থই অদ্বিতীয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি জীবনে একদিন যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, কোন দিনই আর তাহা মন্দ বুঝেন নাই, সুতরাং কোন দিনই আর তাঁহাকে সেজন্য হায় হায় করিতে হয় নাই। অবশ্য, তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন, সর্ব্বসমাজে বা সর্ব্বকালে তাহা যে ভাল বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, ইহা অসম্ভব। সেরূপ সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বকালীন সর্ব্ববাদিসম্মত ভাল বা মন্দের সংখ্যা এ সংসারে করপর্ব্বপরিমেয় মাত্র। কিন্তু তিনি যেরূপ উৎসাহে, যেরূপ অসঙ্কোচে, যেরূপ স্বার্থের শতবন্ধন ছিন্ন করিয়া, যেরূপ জানিয়া শুনিয়া কলঙ্ক লাঞ্ছনা ও গ্লানি গঞ্জনার পশরা শিরে তুলিয়া লইয়া, স্ববিবেকের অনুসরণ করিয়াছেন, এরূপ সুবিশ্বস্ত বিবেকসেবক চিরস্বাধীন চিরঅপরাজিত পুরুষসিংহ যথার্থই জননী বসুন্ধরার অঙ্কালঙ্কার, সমাদরের সামগ্রী। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন; তাঁহার ঈশ্বরানুরাগও বড়ই প্রগাঢ়। সাধক মহাজনগণের দেহে ভগবৎপ্রেমের যেরূপ সাত্বিক লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, পুণ্যশ্লোক রামতনুর জীর্ণ শীর্ণ তনুতেও ইদানীং অনেকে সেইরূপ অনেক লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি এ কাজ ও কাজ করিতে করিতে গুন্ গুন্ করিয়া ভগবানের গুণগান করিতেছেন বা কাহারও সহিত ভগবৎ-কথালাপ করিতেছেন আর দুই চক্ষে প্রেমধারা পড়িতেছে, ইহা কৃষ্ণনগরস্থ রামতনু-তীর্থের এক অপূর্ব্ব রমণীয় নিত্যদৃশ্য ছিল। তিনি জাত্যভিমান আদৌ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; আহার বিহারে জাতিবিচার বা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার কিছুমাত্র

করিতেন না বটে, কিন্তু মিথ্যাবাদী ধূর্ত্ত পাষণ্ডদিগের কোন দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। শুনিয়াছি দক্ষিণেশ্বর-ধামের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার প্রিয়শিষ্যগণকে পাষণ্ডগণের প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্য-গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিতেন,—'ওরে শালারা, তোরা ও সব খাস্ না, খাস্ না, খাস্ না; ও শালাদের জিনিষের ভেতর শতসঙ্কল্প আর শত পাপ পোরা আছে।' আবার, একটি উদাসীনা তপঃসিদ্ধা মুসলমান কন্যাকে দেখা গিয়াছে, তিনি অসাধুসঙ্কল্পে প্রদত্ত অর্থ বা ভোজ্যাদি দেখিবামাত্রই দাতার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিতেন এবং কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু সেই ব্যক্তিই আবার সাধুসঙ্কল্পে কিছু প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ সাহ্লাদে স্বীকার করিতেন। বাস্তবিকই সাধুভাগবত ব্যক্তিদিগের বিচিত্র চরিতরহস্য সাধারণের দুর্ব্বোধ্য। পাপীর সংস্পৃষ্ট দ্রব্যের মধ্য দিয়া পাপ কিরূপে বসন্তবিসূচিকাদি-বীজের ন্যায় অপরের অন্তরে সংক্রামিত হয়, তাহা প্রশংসিত পরমহংস দেব প্রভৃতি দেব-মানবগণই বুঝিতে পারেন; আর বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন আমাদের সেই সাধু রামকৃষ্ণ-জগদ্ধাত্রী-পুত্র সমাজবহিস্কৃত স্বজনতিরস্কৃত গরিব ব্রাহ্মণ রামতনু লাহিড়ী।

তৎকালীন ব্রাহ্মমতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ জাতিভেদ মানিতেন না বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কেহই নিজ নিজ জাত্যভিমানসূচক যজ্ঞসূত্রটি পরিত্যাগ করেন নাই। অকৈতব প্রেমের পূর্ণাধিকারী কপটাচারের চিরবিদ্বেষী ন্যায়ের অনুবীক্ষণ-ধারী নবানুরাগী রামতনুর বিবেক-চক্ষে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণ-সন্তানগণের উক্তরূপ আচরণ ঘোর প্রবঞ্চনা-মূলক বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। আর বিলম্ব সহিল না, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে হিন্দুসমাজে এরূপ স্বেচ্ছাচার অসহনীয়, এমন কি এরূপ স্পর্দ্ধান্বিত ব্যক্তির পক্ষে পরিবারবর্গ লইয়া হিন্দুমণ্ডলে নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা দূরের কথা নিজপ্রাণরক্ষা করাও সময়ে সময়ে সুকঠিন হইয়া উঠিত। রাজা রামমোহন রায় মহাশয়কেও কলিকাতার সদর রাস্তায় বাহির হইয়া সময়ে সময়ে গুপ্তহত্যার ভয়ে ভীত হইয়া চলিতে হইয়াছে। এই সময়ে অনেক সদাশয় ইউরোপীয় রাজপুরুষ ও কৃষ্ণনগরের মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর রামতনু বাবুর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফলতঃ ভগবৎকৃপায় রামতনু বাবুকে কোন দিনই তাদৃশ বিপদাপন্ন হইতে হয় নাই।

তিনি বহুকাল শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং অনেক বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র তাঁহার সদুপদেশ লাভ করিয়া পরে অপরের আদর্শস্বরূপ

হইয়াছিলেন। এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত উক্ত মহাত্মার জীবনীগ্রন্থ অথবা সর্ রোপার লেথ্‌ব্রিজ্ কৃত উক্ত জীবনীর ইংরাজি অনুবাদগ্রন্থ পাঠ করিলে সবিশেষ জানা যাইতে পারে।

রামতনু বাবুর মাসিক বেতন ১৫০৲ দেড়শত টাকার অধিক কোন দিনই হয় নাই। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ৭৫৲ টাকা মাত্র মাসিক বৃত্তি লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সমাজবিরুদ্ধাচারী হইয়া মফস্বলে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা সে সময়ে যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা তখনকার ব্রাহ্মগণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, বুঝিয়া অনেকেই রণে ভঙ্গ দিয়া কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। রামতনু বাবু কিন্তু ভয়ে ভঙ্গ দিবার লোক ছিলেন না। তিনি তাঁহার কৃষ্ণনগরের পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করেন নাই। যখন যেখানে চাকরি করিতেন, অবকাশ পাইলেই তথা হইতে বাড়ীতে গিয়া বাস করিতেন। পরে কৃষ্ণনগর কলেজেই কর্ম্ম পাইলেন, এবং পেন্‌সন্ লইয়াও কৃষ্ণনগরেই বাস করিতে লাগিলেন। তাহার সাধুতা ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া ক্রমে কৃষ্ণনগরের আপামর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিল। ক্রমে অনেকের তনুতে রামতনুর রং ধরিল।

কৃষ্ণনগর তখন একরূপ সহর বলিলেই হয়, তাহাতে আবার রামতনু বাবু হিন্দুসমাজবহির্ভূত, এরূপ অবস্থায় তথায় থাকিয়া মাত্র ১৫০৲ বা ৭৫৲ টাকার উপর নির্ভর করিয়া একটি বৃহৎ পরিবারের ভারবহন করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গাল রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে অসংখ্য কৃচ্ছ্র কণ্টকের মধ্যদিয়াও অক্ষত শরীরে অনায়াসে আপন পথে চালাইয়া লইলেন। ফলতঃ রামতনু বাবু দরিদ্র হইলেও চিরদিনই যথার্থ বড় লোক, দশের পূজ্য ছিলেন। শেষজীবনে তিনি অস্বাস্থ্য হেতু সপরিবারে কিছুকাল কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন এবং কলিকাতা হইতেই সেই স্বর্গের দেবতা স্বর্গে চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরমভাগবত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কত কত মহারথী ব্যক্তি তাঁহাকে ভক্তিপুষ্পে পূজা করিতেন, কত লোক তাঁহার শিক্ষা সদুপদেশ ও মহৎ আদর্শে প্রকৃতই বড় লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন, পূর্ব্বপ্রশংসিত শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ পাঠে তাহার বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে রামতনু বাবুর বৃদ্ধ পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয় দেহত্যাগ করেন। ইহারই প্রায় দুই বৎসর পরে শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম।

এই দুইটি বৎসর ভারতের পক্ষে দুইটি যুগ বলিলেই হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সহসা যে অনল জ্বলিয়া উঠিল তাহাতে সমগ্র ভারত-ভূমি যেন ভস্মীভূত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল। সৈনিক সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া কানপুর মীরাট প্রভৃতি স্থানে অনেক ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা হত্যা করিল। ক্রমে অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি এই বিদ্রোহিদলে যোগদান করিলেন। কলিকাতা রাজধানীতেও সিপাহীগণ আসিয়া লুণ্ঠন ও হত্যা-কাণ্ড করিবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কলিকাতার ইংরাজগণ অনেকে স্ত্রীপুত্র লইয়া ফোর্ট্ উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ বা দিনমানে সহরের মধ্যে কাজ কর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার ঘাটে জাহাজের উপরে গিয়া সেইখানেই রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহামতি লর্ড ক্যানিং ভারতের গবর্ণর জেনেরাল। এই মহাত্মার ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতা গুণে শীঘ্রই এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইল। বিদ্রোহিগণ পরাজিত ও দণ্ডিত হওয়ায় শীঘ্রই পুনর্ব্বার চারিদিকে শান্তি সংস্থাপিত হইল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতের শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে ভারতের সর্ব্বত্রই মহা আনন্দ উৎসব হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই ভারতেশ্বরীর নামে জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। তাঁহার অভয়সূচক আশ্বাসবাণীর ঘোষণা শুনিয়া ভারতবাসী প্রজাগণ আনন্দে 'ধন্য ধন্য' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

বঙ্গের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জীবনের এই হইতেই সুস্পষ্ট প্রারম্ভ। ইহার পূর্ব্বেও একবার যখন এদেশবাসী ইংরাজগণকে কেবল মাত্র সুপ্রিমকোর্টের অধীন না রাখিয়া দেশীয় সর্ব্বসাধারণ প্রজার ন্যায় স্থানীয় ধর্ম্মাধিকরণের অধীন করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র আইনের (Black Acts) পাণ্ডুলিপি গবর্ণর জেনেরেলের সভায় উপস্থাপিত হয় তখন সহরবাসী ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীদলের মধ্যে স্বল্প মাত্রায় রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এ দেশবাসী ইংরাজ-গণের বিরুদ্ধ-আন্দোলনের প্রতিঘাতে পরাভূত হইয়া তাহা শীঘ্রই নিরস্ত হইয়া গেল। এদিকে নীলকর সাহেবগণের অত্যাচার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রজাগণের মন অত্যাচারী ইংরাজগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বঙ্গবাসী প্রজাগণের মনে ইংরাজ হইতে আত্মরক্ষা বিষয়িণী বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির বোধ হয় এই ব্যাপারেই প্রথম সঞ্চার। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালী প্রজার মনে, ইংরাজমাত্রেই আমাদের

মা বাপ, ইহাই ধারণা ছিল, থাকিবারও উপযুক্ত কারণ ছিল। ইহার পূর্ব্বে যে সকল সদাশয় ইংরাজ মহাত্মা রাজকার্য্য বা ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মিষ্টালাপ, শিষ্টাচার, সদয়ব্যবহার, উদারতা ও সহৃদয়তার গুণে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতি প্রজাগণের আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস বড়ই দৃঢ়মূল হইয়াছিল। বলিতে কি, মহাবীর ক্লাইভের বঙ্গবিজয় অপেক্ষা ঘড়িওয়ালা হেয়ারের বঙ্গবিজয় অধিকতর বিচিত্র, অধিকতর শ্লাঘনীয় এবং অধিকতর দৃঢ়ভিত্তিসংস্থাপক। একদিনের জয় ইংরাজের কামান বন্দুক তরবারিতে করিয়াছিল, চিরদিনের জয় ইংরাজের (Christian Charity) খৃষ্টীয় সদাশয়তায় করিয়াছে।

ইংরাজগবর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্ব্বে যে আইন করিয়াছিলেন—এ দেশবাসী কোন ইংরাজ অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহার বিচার মাত্র সুপ্রিম কোর্টের অধীন, এ আইন আপাততঃ অনেকের চক্ষে পক্ষপাতিত্ব মূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে সত্য, কিন্তু সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে দেশকালপাত্রানুসারে ইহা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এ দেশে, সহরেই হউক আর মফস্বলেই হউক, ইংরাজসংখ্যা এখন অপেক্ষা তখন অতি অল্প। এদেশের লোকের ভাষা প্রকৃতি সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে তখনকার ইংরাজগণ এখনকার অপেক্ষা অনেক অনভিজ্ঞ। দেশীয় সাধারণ প্রজাগণও তখন ইংরাজি ভাষা ইংরাজের প্রকৃতিপদ্ধতি প্রভৃতি এখনকার মত বুঝিতে পারিতেন না। সুতরাং সাধারণতঃ উভয় পক্ষের সংমিলনের অন্তরায় তখন অনেক অধিক ছিল। বিশেষতঃ যে সকল বাঙ্গালী ব্যবসায় বা চাকরি সূত্রে ইংরাজসংস্রবে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত ও নীতিজ্ঞানরহিত। যে কোন প্রকারেই হউক অর্থোপার্জ্জনই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনভিজ্ঞ অসহায় সাহেব-বেচারা তখন বাবু আর্দালী বেয়ারা বাবুর্চ্চি সকলেরই পক্ষে অতি উপাদেয় শিকার। চুরি, চামারি, চাতুরী, মেথরি যাহা করিয়াই হউক সাহেবের টাকা লুটিয়া ঘর পুরিব, তাহাতে যত পাপ হয় দান ধ্যান দোল দোল দুর্গোৎসব ঠাকুরসেবা ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি দ্বারা খণ্ডাইব, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে নিজ সমাজে খুব একজন স্বনামধন্য পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব, এইরূপই তখনকার ইংরাজসংপৃক্ত বাঙ্গালী-গণের অধিকাংশের মনোভাব। বোধ করি মেকলে মহাশয় এই শ্রেণীর বাঙ্গালী-গণরে চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়াই সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে গালি দিয়া চিরকলঙ্ক

কিনিয়াছেন। সে যাহা হউক, সে আমলে ইংরাজগণ কলিকাতা সহরে কতক অংশে সাহায্য সহানুভূতি পাইলেও সুদূর মফস্বলে একেবারেই অসহায় অনাশ্রয় ভাবে মাত্র নিজ বুদ্ধিবল ও বাহুবলে নির্ভর করিয়া ও এক মাত্র গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়াই বাস করিতেন। তথায় তাঁহারা কোনরূপ বিপদে পতিত হইলে যথার্থ সাক্ষ্য বা সহানুভূতি প্রায়ই পাইতেন না। পরন্তু তখনকার মফস্বলবাসী দুর্দ্ধর্ষ দেশীয় জমিদারগণ ও তাঁহাদের কুচক্রী কর্ম্মচারিগণের চক্রান্তে তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে অনেক বিপদে পড়িতে হইত। আবার এই সকল সাহেবের দেশীয় কর্ম্মচারিগণও প্রায় সকলেই সেরূপ সুযোগে 'বরের মাসী কন্যার পিসী' সাজিয়া আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় ফিরিতেন। মাম্‌লা বাঁধিলেই আম্‌লার জয়, অতএব উভয় পক্ষের আম্‌লাগণই মাম্‌লা খুঁজিতেন। উপলক্ষ্যেরও অভাব হইত না। সাহেবের দেওয়ানের বাসায় জামাইবাবু আসিয়াছেন, দেওয়ান মহাশয় ইঙ্গিতে একটু ভাল আহারাদির আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অন্তর্যামী আমিন মহাশয় অমনি বুঝিলেন, পোলাও কালিয়া করিতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ জনৈক মুহুরিমহাশয়কে সঙ্কেত করিলেন। মুহুরি মহাশয় দেওয়ান বাবুর বাসার অনরারি সুপকার, সুতরাং হুকুম-হাকিমিতে তিনি দেওয়ানের দাদা, সঙ্কেত মাত্র হাঁক ছাড়িলেন,—'কই হ্যায় রে!' অবিলম্বেই চারিহাত লম্বা বম্বুধারী এক জল্লাদ আসিয়া উপস্থিত! মুহুরী মহাশয়কে আর বড় বেশী বাক্যব্যয় করিতে হইল না। খ শুনিয়াই সে বুঝিল—খাসী চাই। এই কারণেই সে আম্‌লাবাবুদিগের নিকট বড়ই খয়েরখাঁ। বরকন্দাজ অনেক খুঁজিয়াও কোথাও আর খাসী পাইয়া উঠে না, এমন সময়ে সন্ধান পাইল, নিকটেই এক মুসলমানের বাড়ীতে একটা ভাল খাসী আছে। অমনি সেই বাড়ীতে গিয়া খাসী পাকড়াইল। মুসলমান বেচারার অসম্মতি সত্ত্বেও সে বলপূর্ব্বক খাসী লইয়া চলিল। তখন সেই মুসলমান শীঘ্র গিয়া নিকটবর্ত্তী জমিদারের কাছারিতে খবর করিল। কাছারির নাএব মহাশয় অমনি তাহার সঙ্গে জনকয়েক লোক দিয়া হুকুম করিলেন,—খুন হয় জখম হয় আমি আছি, তোরা এখনই গিয়া খাসী ছিনাইয়া লইয়া আয়। এই সূত্রে সাহেবের পেয়াদাদিগের সহিত মুসলমানগণের দাঙ্গা হইল, দুই পক্ষেই লোক জখম হইল। হুলস্থূল ব্যাপার বাধিয়া উঠিল। সাহেবকে আম্‌লাবাবুরা বুঝাইলেন, হুজুরের কার্য্য উপলক্ষ্যেই এ মাম্‌লার সৃষ্টি; তথাপি সাহেব বুঝিলেন, বরকন্দাজের বদ্‌মাইসি আছে। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বরকন্দাজ-সাহেবকে ডাকিয়া নিজ হস্তে আচ্ছা মত চাবুকাইয়া দিলেন। চাবুকের

আঘাতে রায়জীর পিঠ কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। অমনি সুচতুর জমিদারের প্ররোচনায় ও উৎকোচলোভে বিশ্বাসঘাতক বরকন্দাজ পরদিনই পিঠে পট্টি জড়াইয়া কারি-জখম সাজিয়া শকটশায়ী অবস্থায় একেবারে মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত! কি সমাচার?—'সাহেব আমাকে জমিদারের কাছারিতে আগুন দিতে হুকুম দিয়াছিলেন, আমি হুকুম তামিল করিতে অস্বীকার করায় তিনি আমাকে মারিয়া জখম করিয়াছেন।'

এইবার সাহেব স্বয়ং আসামী! জমিদার তরফ হইতে কড়াকড় তদ্‌বির চলিতে লাগিল। ভদ্রাভদ্র ভাল ভাল সাক্ষী যুটিতেও বাঁকি রহিল না। এ দিকে দুই একখানি সংবাদপত্রেও এই জখমি মাম্‌লার কাহিনী অম্লমধুর বর্ণনায় বাহির হইল। সাহেব একেবারে অপ্রতিভ? এ অবস্থায় কে তাঁহার মিত্র কেইবা শত্রু, তাহাও বুঝিতে পারা দায়!

এইরূপ সমস্যায় সেরূপ সময়ে স্থানীয় বিচারকের হস্তে সাহেবদিগের ভাগ্য-বিধানের ভারার্পণ না করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সহৃদয়তা ব্যতীত অবিচক্ষণতা বা পক্ষপাতিত্বের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত Black Acts বা কালা আইনের পাণ্ডুলিপি নামঞ্জুর হইলে দিন দিন দেখা যাইতে লাগিল, দুষ্টপ্রকৃতিক ইংরাজগণ গবর্ণমেণ্টের উক্তরূপ অনুগ্রহের অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মফস্বলবাসী কোন কোন নীলকর সাহেবের অত্যাচার প্রজাগণের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তখন তাহারা নীলকরগণের অত্যাচার নিবারণার্থে দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মঘট করিল। দেশীয় অনেক বড় বড় লোকও তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হইলেন।

বঙ্গে ভদ্রাভদ্র প্রজাগণ ঐক্যাবলম্বনে আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণে কার্য্য করার এই প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয়।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় নীলদর্পণ নাটক রচনা করিয়া নীলকরের অত্যাচারবৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। এই সময়ে আমাদের বঙ্গজননীর শ্রীঅঙ্গ বহুসংখ্যক অমূল্য উজ্জ্বলরত্নে সুশোভিত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামগোপাল ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধুশ্রেষ্ঠ রামতনু লাহিড়ী, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রতিভাশালী ও তেজঃসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তখন পর্য্যায়ক্রমে যেন স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে বঙ্গভূমিকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। এই

মাহেন্দ্রক্ষণে সদাশয় স্বর্গীয় শরৎকুমার ঋষিকল্প-রামতনুর পুণ্যকুটীরে প্রথমে পৃথিবীর মুখ দর্শন করিলেন।

শরৎকুমারের জন্মের কিয়ৎকাল পরে রামতনু বাবু কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট্ স্কুলে বদলি হইলেন। সুতরাং তিনি সপরিবারে কলিকাতা হইতে পুনর্ব্বার কৃষ্ণনগরের বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শরৎবাবুর শৈশবের অধিকাংশ কালই কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের আর দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যার জন্ম হয়। পুত্রগণের মধ্যে শরৎকুমার তৃতীয়; প্রথম পুত্র নিতান্ত শৈশবেই গতাসু হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় নবকুমার বড় সুবোধ শান্তশিষ্ট বালক।

শরৎকুমারের বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর, সেই সময়েই নবকুমার অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি সাতিশয় সুখ্যাতির সহিত কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইলেন। পিতা রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ও জননী গঙ্গামণি দেবী নবকুমারের এই সাংঘাতিক রোগাক্রমণের সংবাদ পাইয়া বজ্রাহতপ্রায় হইলেন। রামতনু বাবু পুত্রের চিকিৎসার নিমিত্ত যথাশক্তি শ্রমস্বীকার ও অর্থব্যয় করিতে ত্রুটী রাখিলেন না। কিন্তু নিয়তির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে? নবকুমার সেই রোগেই দেহত্যাগ করিলেন। নবকুমারের পীড়াকালে ভ্রাতৃভক্ত শরৎকুমার অনেক সময়ে তাঁহার অনেক শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগিনী ইন্দুমতী এই সময়ে অসাধারণ স্নেহশীলতা ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি দিবারাত্র রুগ্নভ্রাতার সন্তর্পণে নিযুক্ত থাকিতেন। রোগীর পথ্য প্রস্তুত করা, শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বাতাস করা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই ইন্দুমতী করিতেন। ভ্রাতার শুশ্রূষা হেতু তাঁহার নিয়মিত আহার নিদ্রাও ঘটিয়া উঠিত না। তাহাতে কিন্তু বালিকা কিছুমাত্র কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ করিতেন না। কি করিয়া ভ্রাতাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবেন, পাছে নিদারুণ ভ্রাতৃশোকশেল সহ্য করিতে হয়, এই চিন্তা যেন সতত তাঁহার মুখশ্রীতেও অঙ্কিত থাকিত। ভ্রাতৃবৎসলার সে ভাবনা ভগবান্ দূর করিলেন,—সহসা ইন্দুমতী স্বয়ং উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া ভ্রাতৃশোক সহ্য করিবার পূর্ব্বেই স্বর্গের দেবী স্বর্গে চলিয়া গেলেন! রামতনু বাবু উপর্য্যুপরি মহাব্যসনে পতিত হইয়াও নিতান্ত শান্ত সহিষ্ণু থাকিয়া যেরূপ অপূর্ব্ব ভগবন্নির্ভর ও পবিত্র আত্মপ্রসাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা যেমনই বিস্ময়কর তেমনই শিক্ষাপ্রদ।

শরৎকুমার ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমার উভয়ে শৈশবাবধি অধিকাংশ কালই পিতামাতার নিকটে বাস করিতেন। সাধু সদাশয় পিতৃদেবের ও সাধ্বী সদাশয়া মাতৃদেবীর সুমহৎ চরিত্রাভাসে ইঁহাদের অন্তঃকরণ শৈশবাবধিই প্রতিভাসিত হইতে লাগিল। রামতনু বাবুর পুণ্যপরিবারে মিথ্যাচরণ মিথ্যা-কথন দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি পাপ তিলেক তিষ্ঠিতে পারে নাই। বালকবালিকা কেহ ক্রীড়াচ্ছলেও কোন সময়ে কোন কথা বলিয়া যদি তদনুসারে কার্য্য করে নাই, অমনি পিতা তাহাকে অতি মধুর ভাষায় তাহার অসাধুত্বের বিষয় বুঝাইয়া দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে উপদেশ দিতেন। এমন পিতার সন্তান যে সাধুসদাশয় হইয়া সংসারের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

এই সময়ে বঙ্গদেশের পল্লীসমূহে ত্রিবিধ শিক্ষার প্রচলন। কোন পল্লীতে হয় ত একটি ব্রাহ্মণ অধ্যাপক একটি টোল খুলিয়া গুটি কয়েক ব্রাহ্মণ বালককে হস্তলিখিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টি, রঘু বা আহ্নিকতত্ত্ব ইত্যাদি পড়াইতেছেন, কোথাও বা জনৈক বর্দ্ধমানবাসী গুরুমহাশয় এমন কি শতাবধি ছাত্র লইয়া একটি পাঠশালা খুলিয়া হস্তলিপি কড়ানিয়া শতকিয়া শুভঙ্করি মনকসা, জমাবন্দি, কাঠাকালি, বিঘাকালি ইত্যাদি শিখাইতেছেন, কোন গণ্ডগ্রামে বা একটি মধ্যইংরাজি বিদ্যালয় খুলিয়াছে, তথায় উপযুক্ত মাষ্টার মহাশয় ও পণ্ডিত মহাশয়গণ বালকদিগকে মুদ্রিত ইংরাজি ও বাঙ্গালা পুস্তক পড়াইতেছেন।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের শ্রীকণ্ঠ চৌধুরী মহাশয় নিজের বাড়ীতে একটি বিদ্যালয় খুলিয়া ছোট ছোট ছেলেদিগকে ইংরাজি ও বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। এই বিদ্যালয়েই শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ। তখনকার ছেলেদের মত তিনি কোনদিনই পাততাড়ি বগলে লইয়া পাঠশালায় যান নাই বা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতেও কোনদিন তাঁহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয় নাই। তথাপি কিন্তু শরৎবাবু প্রয়োজনানুরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, সুনীতি শিষ্টাচারও তাঁহার যথেষ্ট জন্মিয়াছিল।

রামতনু বাবু চিরদিনই গরিব। যৌবনকালে যখন তিনি চাকরী করিতেন, তখন যদি কোন সময়ে তাঁহার অর্থের স্বচ্ছলতাও ঘটিত, তখনও তিনি অন্তঃপ্রকৃতিতে গরিব (poor in spirit)। সে সময়ের ব্রাহ্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে এই ভাবটি বড়ই সুন্দর ছিল। প্রথমতঃ এই ভাব তাঁহারা যত্ন করিয়া অভ্যাস করিতেন, পরে প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইত। তাঁহাদের

বেশভূষায় পরিচ্ছন্নতা থাকিলেও বিলাসিতা থাকিত না, স্বভাব নম্র, বাক্য মৃদু সবিনয় ও সংযত। এজন্য তাঁহাদের আচার ব্যবহার কিঞ্চিৎ সমাজবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহারা সহসা কাহারও অপ্রিয় হইতেন না; বরং সকলেরই মনে তাঁহাদের প্রতি এই বলিয়া সবিশেষ ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিত যে, তাঁহারা কখন মিথ্যা কথা কহেন না এবং যথাশক্তি লোকের উপকার ব্যতীত অপকার করেন না। তাঁহারা যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মের মৌলিকতা সপ্রমাণ করিবার সময়ে বেদ-উপনিষদ্ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মগ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ-লিখিত যীশুর উপদেশবাক্যগুলিই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য, এবং ঐ সমস্ত উপদেশবাক্যই তাঁহাদের চরিত্রসংস্কার বিষয়ে সবিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। ধার্ম্মিক উদারচেতাঃ সত্যনিষ্ঠ শান্ত শিষ্ট সাহেবগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় উপনিষদ্ আদি অধ্যয়ন, এই উভয়বিধ সাধনফলেই সেকালের শিক্ষিত সাধু মহাত্মগণের চিত্তে এই একেশ্বরীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উৎপত্তি। এই জন্য তখন কোন কোন মনস্বী ইংরাজ কহিতেন, (Brahmaism is but the midway between Hinduism and Christianity) ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী পথ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মে রামতনু বাবুর এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা ছিল এবং তিনি এই ধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে নিজ চরিত্র এরূপ ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন যে, তিনি মুহূর্ত্তকালের জন্যও যখন যাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন, অন্ততঃ তখন সেই মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাদের অন্তরে তাঁহার পুণ্যপ্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—প্রভো, প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া কাহাকে অবধারিত করিব? তখন মহাপ্রভু উত্তর করিয়াছিলেন,—যাঁহাকে দর্শন করিলে ভগবানের নাম উচ্চারণে স্বতঃই প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহাকেই প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। সেই লোক-শিক্ষক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এই বচনানুসারে বিচার করিলে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় যথার্থই পরম ভাগবত বৈষ্ণবচূড়ামণি। এই মহাত্মার আত্মজ হইয়া আশৈশব ইঁহারই আদেশ উপদেশ ও আদর্শানুসারে চলিলে চরিত্র যেরূপ সুপবিত্র সুকোমল হওয়া সম্ভবপর, শরৎকুমারের চরিত্র বাল্যকাল হইতেই সেইরূপ। কি বাল্যে কি যৌবনে কি প্রৌঢ়ে কোন দিনই কেহ তাঁহাকে, এই সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র বা এই সেই সুনামধন্য স্বাবলম্বী

সৌভাগ্যবান্ এস্ কে লাহিড়ী, ইহা বলিয়া চিনিতে পারে নাই। তিনি চিরদিনই গরিব পিতার গরিব পুত্র। আলাপ পরিচয়ে গরিবানা, আচার ব্যবহারে গরিবানা, বেশভূষায় গরিবানা, গৃহে গরিবানা বাহিরেও গরিবানা, এই পৈতৃক গরিবানা শরৎকুমারের অতুল পৈতৃকসম্পত্তি, এবং সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার ভাবিজীবনে অগাধ ধনসম্পত্তি অর্জ্জনের প্রধান মূলধন।

বাল্যে শরৎবাবু বাবুগিরি শিখিবার মত শিক্ষা বা সুযোগ একদিনও পান নাই। পিতা দরিদ্র, পেন্‌সনের সামান্য পঁচাত্তরটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণনির্ব্বাহ, তদুপরি সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়-সঙ্কুলান, সুতরাং সহচর সহাধ্যায়িগণের মধ্যে বিলাসিতা দেখিলেও বিলাসিতা অভ্যাসের সুযোগ সুবিধা ঘটা সে সময়ে শরৎকুমারের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। বিশেষতঃ যখনই দেখিতেন, ধনীর বিলাসিতা অপেক্ষা পিতার দীনদরিদ্রতাই আপামর সাধারণের নিকট সমধিক পূজা প্রাপ্ত হইতেছে, তখনই বালক শরৎ-কুমারের সুকোমল চিত্তে স্বভাবতঃই বিলাসিতায় বৈরাগ্য ও দীনতায় অনুরাগ জন্মিত। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ বসন্তকুমারের চরিত্রও এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পিতার ও ভ্রাতার চরিত্রের অনুরূপ।

শরৎকুমারের সর্ব্বপ্রধান বাল্যসহচর ছিলেন কৃষ্ণনগরনিবাসী স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার ও ঔপন্যাসিক মিঃ ডি, এল্, রায়। শরৎবাবু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; কৃষ্ণনগরের রায় ও লাহিড়ী গোষ্ঠীর পরস্পর ঘনিষ্ঠতা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কার্ত্তিকেয় রায় মহাশয়কে শরৎকুমার লালখুড়া বলিয়া ডাকিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ও শরৎকুমারের পিতৃভবনও পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী। একারণ শরৎকুমার রায়-মহাশয়ের বাটীতে বা দ্বিজেন্দ্রলাল লাহিড়ী-মহাশয়ের বাটীতে প্রায়ই অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। শরৎ বাবুর এই বাল্যসহচর—বঙ্গের বিখ্যাত সুসন্তান স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ের যৌবন ও প্রৌঢ় জীবন যেমন শ্লাঘনীয়, বাল্যচরিতও তেমনি সুমধুর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (মিঃ ডি, এল্, রায়)।

১২৭০ সালে কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম। কৃষ্ণনগর রাজ-এষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সাতটি পুত্রের মধ্যে ইনিই সর্ব্বকনিষ্ঠ, পিতামাতার বড়ই আদরের ধন। বাল্যে ইঁহাকে সকলেই দ্বিজু বলিয়া ডাকিত। দ্বিজুর আকৃতিপ্রকৃতি সকলই সুমধুর, কথাগুলিও যেন মধুমাখা, আবার গান গাইতে পারিতেন আরও সুমধুর। সঙ্গীত তাঁহার পৈতৃক বিদ্যা। স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় রায় মহাশয় একজন শিক্ষিত গায়ক, দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্য হইতেই স্বাভাবিক গায়ক। তিনি যখন কৃষ্ণনগরে ব্রজবাবুর স্কুলে (Krishnagar A. V. school) পড়িতেন, সেই সময়ে এক এক রবিবারে সন্ধ্যাকালে তাঁহার তৃতীয়াগ্রজ বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের ব্রহ্মমন্দিরে বেড়াইতে আসিতেন, এবং শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য বাবু অম্বিকাচরণ সেন (Mr. A. C. Sen I. C. S.) মহাশয়ের উপাসনার বিরামসময়ে দ্বিজু তাঁহার স্বাভাবিক কোকিলকণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতালাপ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মন মোহিত করিতেন। সেই সময়ে দ্বিজুর মুখে "সত্যং শিবসুন্দরং রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে" এই গানটি শুনিয়া যেমন তৃপ্ত ও বিমোহিত হইয়াছিলাম, তিনি বড় হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে সকল মজার গান বা স্বদেশপ্রেমের গান গাইতেন, যাহা শুনিয়া শত শত গুণিজ্ঞানী মহাজন তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া প্রশংসা করিতেন, আমি কিন্তু তাহাতে তত তৃপ্ত বা তেমন বিমোহিত কোন দিনই হই নাই। স্বর্গীয় শরৎকুমার বাবুও দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্বন্ধে এইরূপই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার সঙ্গীতরচনা-শক্তি যে বড়ই প্রশংসনীয় এবং কণ্ঠস্বরও যে চিরদিনই মনোহর এ কথা শতবার স্বীকার্য্য। বাল্যে শরৎবাবু ও আমি উভয়েই দ্বিজুর সহাধ্যায়ী ছিলাম আমরা তিনজনেই প্রায় সমবয়স্ক। এখনকার কৃষ্ণনগরে আর তখনকার কৃষ্ণনগরে অনেক প্রভেদ। তখন কৃষ্ণনগরে রেলওয়ে খুলে নাই, এখনকার মত এত দালানকোঠাও তখন হয় নাই। ফলতঃ যাঁহারা তখন কৃষ্ণনগর দেখিয়াছেন, এখন দেখিলে তাঁহারা আর সে কৃষ্ণনগর বলিয়া চিনিতে পারেন না। এ

স্থানের স্বাস্থ্য তখন বড়ই উৎকৃষ্ট। জলাঙ্গী তখন এখনকার অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত ও প্রবাহশালিনী, প্রসিদ্ধ কদমতলার ঘাট তখন চৈত্র বৈশাখে আরও সুখকর, আরও মনোহর।

বাল্যকালে কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল ও শরৎকুমার উভয়েরই বেশভূষা প্রায় একই রকম দেখিতাম। আমি সে সময়ে ইঁহাদের কাহারও পরিধানে ধোপ্‌ভাঙ্গা ধপ্‌ধপে জামাকাপড় বা পায়ে চক্‌চকে বুট্‌ কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দুজনের প্রকৃতি পরস্পর অনেক পৃথক্‌ হইলেও দুজনেই বড় অমায়িক, দুজনেব বাল্যচরিত্রই বড় প্রীতিপ্রদ। শরৎকুমার বুদ্ধিমান্‌ নিরীহ, দ্বিজেন্দ্রলাল সুচতুর চঞ্চল। শরৎকুমারের বুদ্ধি যেন খদ্যোতজ্যোতি, দ্বিজেন্দ্রলালের বুদ্ধি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; এইটি যেন ক্রমশঃ সমধিক জ্বলিয়া উঠিতেও পারে আবার হয় ত নিবিয়া গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু ঐটি চিরদিনই সমানে রহিয়া রহিয়া দীপ্তি পাইবে, কোনদিনই দাউ দাউ জ্বলিবে না, আবার টপ্‌ করিয়া একবারেই নিবিয়াও যাইবে না। শরৎকুমার স্কুলে আসিয়াছেন কি না, সন্ধান করিয়া জানিতে হইত, দ্বিজু স্কুলে আসিয়াছেন কি না তাহা স্কুলের কম্পাউণ্ডে পা দিলেই জানা যাইত।

দ্বিজুকে বা শরৎকুমারকে আমি কখন প্রসন্ন ভিন্ন বিষণ্ণ দেখি নাই। তবে শরতের প্রসাদ যেন শরতের কৌমুদী, দ্বিজুর আনন্দ যেন দিবার আলোক। স্কুলে শরৎকুমারকে আমি কোনদিন এক মুহূর্ত্তের তরেও অস্থির বা অশিষ্ট দেখি নাই, দ্বিজেন্দ্রলাল অশিষ্ট না হইলেও, তিলার্দ্ধের তরেও তাঁহাকে কোনদিন সুস্থির থাকিতে দেখি নাই। প্রতিভা পদার্থটির এই অপূর্ব্ব গুণ অনেক মনস্বী ব্যক্তির বাল্যচরিত্রেই প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি মাইকেল মধুসূদনের চরিত্র ত চিরদিনই এইরূপ অস্থিরতাময়, চিরদিনই তিনি যেন অস্থির অশান্ত বালক, চিরদিনই বোধ হয় বেত্রধারী গুরুমহাশয়ের শাসনাধীন থাকিলেই হইত ভাল।

শরৎকুমার যখন স্কুলে আসিতেন, দেখিতাম তাঁহার পরিচ্ছদ পরিপাটী না হইলেও পরিচ্ছন্ন বটে; দ্বিজেন্দ্রলাল দেখি স্কুলে আসিয়াছেন,—জামাটি যদিও মন্দ নয়, কিন্তু তাহার বোতামগুলি কোথায় কোন্‌টা পড়িয়া গিয়াছে তাহার খোঁজ নাই, দক্ষিণ হস্তের আস্তিনে সুস্থিরতার চিহ্নস্বরূপ এক দোয়াত কালি ঢালিয়া পড়িয়াছিল তাহার দাগটি প্রায় পাঁচ ইঞ্চি ব্যাপিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। কোঁচার কাপড়ের মুড়া ছিঁড়িয়া ঝুলিতেছে, কাপড়খানি কিন্তু নেহাত কমদামের

নহে। দক্ষিণ কর্ণটি দেখি দ্বিজুর ফুলিয়া লাল হইয়া রহিয়াছে! জিজ্ঞাসা করায় সরলপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন, "নিচুগাছে উঠিয়া এই ভাল কাপড়খানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি বলিয়া দাদা খুব কাণ মলিয়া দিয়াছেন," বলিয়াই দ্বিজু হাসিয়া বিকল! আমি বলিলাম, "কাণমলাটা তাহলে বোধ করি খুব মিষ্টি লেগেছিল?" হাসিমাখা মুখে দ্বিজু কহিলেন, "ওঃ, বড্ড মিষ্টি, এই দেখ কেমন!" বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল খপ্ করিয়া আমার কাণ কড়্‌কড়্ করিয়া মলিয়া দিলেন। আর আর ছেলেরা হাসিয়া উঠিল, আমি অবাক্ হইয়া দ্বিজুর হাস্যময় মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলাম, ক্রমে চক্ষে জল আসিল! কেন?—অপ্রতিভ হওয়ায়, না বেদনায়? না; দ্বিজুর কাছে আমার বা আমার কাছে দ্বিজুর অপ্রতিভতার কোনই কারণ ছিল না; বেদনাও তখন কিছুই অনুভব হয় নাই। তবে অশ্রুভার কি জন্য? দ্বিজেন্দ্রলালের অমায়িক প্রেমিকতায় ও অপূর্ব্ব রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া,—আনন্দাশ্রু! বুদ্ধিমত্তায় না হউক, দুষ্টামিতে দ্বিজু আমাকে বড় একটা ছাপাইয়া যাইতে পারিতেন না; কিন্তু দ্বিজুর অমায়িকতায় আমি চিরদিনই পরাজিত।

ক্লাসে দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎকুমার ও আমি প্রায় প্রত্যহই পরস্পরের সন্নিকটেই বসিতাম। আমাদের ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন পূজনীয় রামগোপাল সান্যাল ও বঙ্কুবিহারী খাঁ, সংস্কৃত পড়াইতেন পণ্ডিত সৌরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, আর ইতিহাস ও গণিত শিখাইতেন চন্দ্রবাবু। ইঁহারা তিন জনই ব্রাহ্মণ, এবং তিন জনই আমাদিগকে যথার্থই পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি ও দ্বিজু ইঁহাদিগকে অনেক সময়ে অনেক জ্বালাতন করিয়াছি। আহা, পিতা মাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছাড়িয়া, এমন সর্ব্বংসহ হিতৈষী বন্ধু এজগতে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না!

আমরা যখন এ, ভি, স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন পূর্ব্বপ্রশংসিত রামগোপাল বাবু সেক্‌স্‌পিয়রের হ্যামলেট্ পড়িয়া আমাদিগকে উহার রসাস্বাদন করিতে শিখাইতেন। আমার নিকট—এবং আমি ঠিক অনুভব করিতে পারিতাম—দ্বিজেন্দ্রলালের নিকটও উহা এতই অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইত এবং উহাতে এতই অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে আমরা দুজনে অনেক সময়ে স্কুল-লাইব্রেরীতে বসিয়া সংগোপনে সমাহিত চিত্তে হ্যামলেট্ নাটকের ভূতাগমনের গর্ভাঙ্কটি ও রাজপুত্রের স্বগত চিন্তাটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতাম, এবং পড়িয়া দুজনেই যেন আত্মহারা হইতাম। তখন আমরা উভয়েই বয়সে কিশোর মাত্র, বিদ্যাও সবে তৃতীয় শ্রেণীর; তবে যে কি বুঝিয়া কি ভাবিয়া তখন হ্যাম্‌লেট্ পাঠে

মোহিত হইতাম, তাহা আর এখন বুঝিতে পারি না। তবে, এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, তখন না বুঝিয়াও যেরূপ মধুরতার উপলব্ধি করিতাম, এখন বুঝিয়াও আর সেরূপ মাধুর্য্য পাই না। শুধু সেক্‌স্‌পিয়রের নহে, জগতের যাবতীয় জড়চেতনের মধ্য হইতেই সে মধুরতা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। যখনই ঐ সকল কিশোর কমনীয়তার কথা মনে হয়, তখনই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীমুখনিঃসৃত সেই শ্লোকটি মনে পড়ে :—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্ আদ্য এব পরো রসঃ॥"

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগর কলেজসংলগ্ন স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। পরে এফ্, এ, পরীক্ষাতেও বৃত্তি প্রাপ্ত হন, বি, এ, পরীক্ষায় দ্বাদশ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ, এম্ এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তখন তিনি চাকরী লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় সাংসারিক অস্বচ্ছলতা হেতু পাঠ পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল চাকরী করার পর কলিকাতায় কলেজষ্ট্রীটে পুস্তকের দোকান খুলিয়াছেন, এবং ঐ ব্যবসায়াবলম্বনে আর্থিক অবস্থার একটু উন্নতি সাধনও করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন চাকরী করেন, তখন শরৎবাবু কলিকাতায় থাকিয়া সংবাদ পাইলেন যে, ঐ বৎসর গবর্ণমেণ্ট যে ছাত্রটিকে বিলাতে গিয়া কৃষিশিক্ষার নিমিত্ত বৃত্তি প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সে ছাত্রের পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা হেতু বিলাত যাওয়া হইল না। শরৎবাবু সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালকে টেলিগ্রাম করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালও অবিলম্বে কলিকাতায় আসিয়া শরৎবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত বৃত্তির নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন; গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া বৃত্তিপ্রদানে অঙ্গীকার করায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে বিলাত যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় ৮ বৎসর বাস করিয়া বহুবিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু হায় হায়! আসিয়া দেখিলেন, যে পিতামাতার তিনি বড়ই আদরের ধন ছিলেন সে পিতা মাতা আর মর্ত্ত্যধামে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট কৃষ্ণনগর বাস যেন তখন একেবারেই অতৃপ্তিকর অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহার পর তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে ডেপুটি কলেক্টরি পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং কলিকাতায় আসিয়া স্বনামধন্য হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা স্বর্গগতা সুরবালা

দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি অনেকগুলি হাস্যরসাত্মক ও কয়েকটি স্বদেশবাৎসল্যসূচক সঙ্গীত রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পঠদ্দশা হইতেই পুরাবৃত্তানুরাগী ছিলেন; টড্‌প্রণীত রাজস্থানের সমগ্র ইতিবৃত্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলেই হয়। এই পুরাবৃত্তানুরাগের ফলেই তাঁহার 'রাণাপ্রতাপ' 'সাজাহান' 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি উপন্যাসগ্রন্থ প্রণয়ন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেশীয় নাট্য-শালায় ঐ সকল পুস্তকেরই অভিনয় হইতে লাগিল, তাঁহার স্বদেশানুরাগরচিত সঙ্গীত সকল সাদরে শতকণ্ঠে গীত হইতে লাগিল, সহস্র কর্ণে সাগ্রহে শ্রুত হইতে লাগিল, দ্বিজেন্দ্রলালের নামে শত সহস্র মুখে 'ধন্য ধন্য'রব উচ্চারিত হইতে লাগিল! পর পারে' নামক পুস্তকখানিই তাঁহার জীবদ্দশার শেষগ্রন্থ। এই পুস্তক রচনান্তে তিনি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছিলেন, "সম্ভবতঃ ইহাই আমার জীবনের শেষগ্রন্থ"।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাধ্বী পত্নী সুরবালা দেবী এক পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া সধবাবস্থাতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিপত্নীক পতি পুত্র-কন্যা লইয়া জীবনের অন্তিমাংশ কলিকাতা মদনমিত্রের লেনে 'সুরধাম' নামক নবনির্ম্মিত নিজভবনেই বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি আলিপুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ এবং কখন বা অফিঃ জয়েণ্ট্ মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেন। প্রত্যহ 'সুরধাম' হইতে আলিপুরে নিজ অশ্বযানে যাতায়াত করিতেন।

এই সময়ে আমিও কলিকাতাবাসী। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সেই বাল্য বয়সে বন্ধুত্ব ও একত্র অধ্যয়ন, তাহার পর আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। কিন্তু আমার অন্তরে দ্বিজেন্দ্রলালের মূর্ত্তি এরূপ খোদিত হইয়াছিল যে তাহা বোধ করি জন্মান্তরেও অন্তর্হিত হইবার নহে। আমি সেই বাল্যকাল হইতেই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে, দ্বিজেন্দ্রলাল একজন যথার্থ বড় লোক হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সে উচ্চাশা সম্যক্ ফলবতী হয় নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম তিনি এক জন প্রতিভান্বিত সাধুমহাপুরুষ হইবেন। তাঁহার অন্তরে—আমি জানিতাম,—তদ্রূপ বীজই উপ্ত ছিল, কিন্তু আমার শেষ অনুমান এই যে, বিলাতে গিয়া বিলাসিতার স্রোতে পড়িয়াই তাহা ভাসিয়া গিয়াছিল। দেশে থাকিলে তাঁহার অন্তর্নিহিত মহাশক্তি তাঁহাকে নিশ্চিতই স্বতন্ত্র পথে পরি-চালিত করিত, এবং সে অবস্থায় বোধকরি বঙ্গভূমি বা ভারতবর্ষ তাঁহা হইতে অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হইত, এবং তাঁহার নামও প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বিধাতৃবিধানই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক কল্যাণকর, মানুষের কল্পনা অশেষ ভ্রান্তিমূলক।

যাহা হউক, যখন দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় গৃহশূন্য হইয়া নূতন গৃহে বাস করিতেছেন, সেই সময়ে আমি একদিন প্রাতঃকালে শরৎবাবুর হারিসন্ রোড্ স্থিত ভবনে বসিয়া আছি, এমন সময়ে শরৎবাবুর গাড়ী ঘোড়া প্রস্তুত হইয়া দরজায় উপস্থিত ; শরৎবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। তিনি আমাকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি যাইতে অস্বীকার করিলাম। শরৎবাবু আমার অস্বীকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কহিলাম,—"আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তিনি এখন পদস্থ বরণীয় ব্যক্তি, আপনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে যদি তিনি তাদৃশ সমাদর প্রদর্শন না করেন, তাহাতে আমার অন্তরে যেরূপ বোধই হউক না কেন, আপনি বড়ই অপ্রতিভ হইবেন, অতএব আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না।"

শরৎবাবু আমার কথা শুনিয়া কহিলেন,—"আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আমি এক সময়ে ঠিক এইরূপ এক ঘটনায় বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছিলাম।"

শরৎবাবু যাত্রা করিলেন, আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম। ইহার পর একদিন আমি আমার রচিত একটি মুদ্রিত ইংরাজি কবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলাম, ঐ কবিতার নিম্নে নিজ নাম দস্তখৎ না করিয়া বাঙ্গলায় লিখিলাম,—"বল দেখি আমি কে ?"

এই কবিতা প্রেরণের অন্যূন একবর্ষকাল পরে আমি একদিন রবিবারের প্রাতঃকালে বেলা অনুমান আটটার সময় মদনমিত্রের লেনের নিকট দিয়া যাইতেছি, আকাশে অল্প অল্প মেঘ, মাটিতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, আমি ছত্রহীন, পরিধানে একখানি অর্দ্ধমলিন বস্ত্র, স্কন্ধে তথৈব একখানি উত্তরীয়, পায়ে নামে মাত্র পাদুকা, কামে কিন্তু কর্দ্দমাবরণ। সহসা মনে হইল, আমারও বয়স হইয়াছে, দ্বিজুরও বয়স হইয়াছে, যাই, একবার আজ দ্বিজুকে শেষ দেখা দেখিয়া আসি। অমনি আব একটা মনে বলিয়া উঠিল, দ্বিজু এখন বিলাতফেরত হাকিম, যদি সে আমাকে এ বেশে দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া কথা না কহে !

কিন্তু অপমানের আশঙ্কা অপেক্ষা স্নেহের আকর্ষণ অধিক হইল। মানসদ্বয়ের মীমাংসা স্থির হইতে হইতে পদদ্বয় দেখি একরূপ অজ্ঞাতসারেই অগ্রসর হইয়া একেবারে সুরধামের সম্মুখে সমুপস্থিত ! বারান্দায় উঠিলাম, দেখিয়া অনুমান করিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি পশ্চাদ্ভাগ হইতে সহসা গিয়া বলিলাম,—'নমস্কার !'

দ্বিজেন্দ্রলাল চকিতের ন্যায় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আমার গলদেশে

যজ্ঞসূত্র দেখিয়া প্রতিনমস্কার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কাহাকে চান্?' আমি উত্তর করিলাম,—'আপনাকে চাই।'

প্রশ্ন।—কেন? কি প্রয়োজন?

উত্তর।—দেখা করিতে; দর্শন মাত্র প্রয়োজন।

প্রশ্ন।—(সবিস্ময়ে) আপনি কে?

উত্তর।—চিনিতে হইবে।

প্রশ্ন।—আমি ত চিনিতে পারিতেছি না। আপনি কে?

উত্তর।—চেষ্টা করিয়া দেখুন।

প্রশ্ন।—আমি খুব চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, চিনিতে পারিলাম না। আপনার নাম কি, বলুন দেখি।

উত্তর।—আমার নাম,—সরোজনাথ মুখুজ্জে।

প্রশ্ন।—কোন্ সরোজনাথ?

আমি।—কোন্ সরোজনাথকে আপনি চিনেন্?

দ্বিজেন্দ্র।—আমি ত এক সরোজনাথের সহিত একত্র পড়িয়াছিলাম!

আমি।—দেখুন্ দেখি, সেই কি না।

দ্বিজেন্দ্রলাল আমার দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,—"এ কি! এত পরিবর্ত্তন!"

বারান্দায় একখানি ভাঙ্গা চৌকি পড়িয়াছিল, সাগ্রহে আমার হাত ধরিয়া সেই চৌকিখানির উপরে আমাকে বসাইয়া নিজেও আমার পার্শ্বে বসিলেন। মুহূর্ত্তের তরে বোধ হইল যেন সেই বালক-দ্বিজু আর বালক-আমি উভয়ে সেই কৃষ্ণনগরের এ, ভি, স্কুলের বেঞ্চে পাশাপাশি বসিয়া আছি। পরস্পর কত কথাই হইল! মানাপমানবোধ সে স্থানে কাহারও চিত্তে প্রবেশাধিকার পাইল না। দ্বিজু জিজ্ঞাসিলেন,—

"শরতের মুখে শুনিয়াছি, তোমারও স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে।"

আমি।—হাঁ, তোমারও ত হইয়াছে।

দ্বি।—হাঁ।

আ।—আবার বিবাহ কর নাই কেন?

দ্বি।—আবার কেন?

আ।—কোন অভাব বোধ হয় না কি?

দ্বি।—কিসের অভাব?

আ।—সাংসারিক কাজকর্ম্মের।

দ্বি।—কেন? চাকর বাকর রহিয়াছে।

আ।—ছেলেমেয়ের খাওয়াপরা ইত্যাদি বিষয়ে কি নিজের কিছুই তত্ত্বাবধান রাখিতে হয় না?

দ্বি।—ওঃ, সে সব অভাব বিলক্ষণ বোধ হয়। তাহা বলিয়া করিব কি? নিজেই যতটা পারি করি।

আ।—অবশ্য, টাকা থাকিলে, চাকরবাকর রাখিয়াও অনেকটা সুবিধা করা যায় বটে। কিন্তু, আমার এখন সে ক্ষমতাও নাই।

দ্বি।—তুমি কি বিবাহ করিয়াছ?

আ।—না, তবে আমার সন্তানগুলির একজন পরিপক্ক প্রতিপালিকা আছেন।

দ্বি।—ভাল, কিছুদিন হইল, তুমি আমাকে একটি নিজের রচিত ইংরাজি পোইট্রি পাঠাইয়াছিলে? (এই পুস্তকের শেষে দেখ)।

আমি অবাক্! দ্বিজেন্দ্রলালের কি অভ্রান্ত অনুমান! অন্যূন পঁয়ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বের পরিচয়ে কি করিয়া আমার রচনা চিনিতে পারিলেন? কবিতায় ত আমার পরিচয়সূচক কোন কথাই লেখা ছিল না! দ্বিজেন্দ্রলাল যথার্থ ই যেন মানুষের অন্তরের খবর জানিতে পারিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"কি করিয়া তুমি জানিলে যে সেটি আমার রচিত?"

দ্বিজু।—আমি পড়িয়াই বুঝিলাম,—এ তোমা ভিন্ন আর কাহারই হইতে পারে না। আমি উহা আমার কয়েকটি বন্ধুকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—বল দেখি, এটি কিরূপ লোকের রচিত? কেহই প্রকৃতরূপ অনুমান করিতে পারিলেন না।

অতঃপর অনেকক্ষণ বসিয়া দুজনে বিশ্রম্ভালাপের পর আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। শরৎবাবুর নিকট এই বিষয় বর্ণন করায় তিনি শতমুখে দ্বিজেন্দ্রলালের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিকই আমার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের সেই শেষ দেখা। তাহার কিছু দিন পরেই তিনি কঠিন পীড়াক্রান্ত হইলেন, এবং কিছুকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্নেহের ধন পুত্রকন্যাদ্বয়কে নিরাশ্রয় রাখিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধ মাতামহ অগত্যা অনাথ দৌহিত্রদৌহিত্রীদ্বয়কে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। সুরধাম আঁধার হইয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাল্য বিবরণ।

অর্থাভাব বশতঃ শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে বাল্যকালে অনেক সময়ে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান হাইকোর্ট-জজ্ মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বাল্যকালে কৃষ্ণনগরে স্বীয় পিতৃভবনে থাকিয়া তত্রত্য কলেজিয়েট্ স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। লাহিড়ী-পরিবারের সহিত চৌধুরী-পরিবারের সবিশেষ বাধ্যবাধকতা ছিল। প্রশংসিত চৌধুরী মহাশয়ের স্বর্গীয়া মাতৃদেবী ও পিতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় উভয়েই অতি উদার ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। কৃষ্ণনগরে ইঁহাদিগের সম্মান-প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট ছিল।

কোন এক সময়ে বালক শরৎকুমার জ্বরাক্রান্ত হইয়া চৌধুরী মহাশয়দিগের বাটীতে উপস্থিত হইলে বর্ত্তমান জষ্টিস্ মহাশয়ের স্বর্গীয়া জননীদেবী শরৎকুমারকে সযত্নে স্বীয় ভবনে রাখিয়া দিলেন। ক্রমে জ্বর প্রবল হইয়া উঠিল, শরৎকুমার পীড়ার কষ্টে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। সাধ্বী দয়াময়ী চৌধুরাণী মহাশয়া মাতৃবৎ স্বয়ং শরৎকুমারের সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, চিকিৎসাও রীতিমত চলিতে লাগিল; কিয়দ্দিনের মধ্যেই রোগী রোগমুক্ত হইয়া স্বগৃহে প্রেরিত হইলেন। শরৎবাবু এই পুণ্যশীলা পরোপকারিণীর উপকার-কথা অনেক সময়ে অনেকের সমক্ষে শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে থাকিয়া অধ্যয়নের নানা অসুবিধা বোধ করিয়া বালক শরৎকুমার রাজসাহীতে গিয়া কোন আত্মীয়ের নিকট থাকিয়া লেখা পড়া শিখিবেন, ইহাই সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্পানুসারে তিনি পুস্তকবস্ত্রাদি লইয়া রাজসাহীতে গমন করিলেন। কিন্তু কোন বিশিষ্ট কারণবশতঃ তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। স্বজনসঙ্গ-রহিত বালক একাকী ফিরিয়া আসিবার সময়ে প্রসিদ্ধ পদ্মানদীতে আসিয়া গহনার নৌকায় আরোহণ করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে বড় বড় নদীতে বড় বড় নৌকা বহুসংখ্যক যাত্রী লইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিয়া থাকে, প্রত্যেক আরোহীকে নির্দ্দিষ্ট হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। এই সকল নৌকাকে লোকে চলিত কথায় গহনার নৌকা বলিয়া থাকে।

শরৎকুমার ও আরও অনেকগুলি যাত্রী একখানি গহনার নৌকায় চড়িয়া পদ্মা বাহিয়া আসিতে লাগিলেন। পদ্মা নদীতে নৌকাযোগে যাতায়াত সময়ে সময়ে যে প্রাণসংশয়কর ব্যাপার, তাহা সম্ভবতঃ অনেকেরই জানা বা শুনা আছে। আমাদের প্রবাসী পথিক-বালকের যাত্রাও আজ তদ্রূপই হইয়া উঠিল। বহুযাত্রিক-বাহী গহনার নৌকা মাঝ-পদ্মা বাহিয়া বেশ চলিতেছে, শরৎকুমার দশের সহিত নৌকায় বসিয়া নিজ পুস্তকবস্ত্রাদির পুঁটুলীটি কোলে করিয়া সেই অকূল জলধিকল্প প্রকাণ্ড পয়স্বিনীর প্রতি উদাসনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, আর জাগ্রতে যেন কতই অদ্‌ভুত স্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময়ে সহসা মাল্লাগণ উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"পাঁচপীর দরিয়া বদর বদর! জোর্ জোর্"; সঙ্গে সঙ্গেই মাঝি কহিল,—"কর্ত্তারা এট্টু স্ সার‍্যা সুর‍্যা বস, দেয়াডা যেন ক্যাম্বায় ক্যাম্বায় ঠেয়্‌তেছে"=কর্ত্তারা একটু সাবধান হইয়া বসুন, আকাশের ভাব যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে।

শরৎকুমার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কিছুই নাই, মাত্র বায়ুকোণে ক্ষুদ্র এক খণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছে। তিনি আবার পূর্ব্ববৎ অসীমপ্রসারী সলিলরাশির প্রতি স্থির নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন; উহাই তাঁহার বিষম ভীতিপ্রদ, উর্দ্ধে আকাশমণ্ডলে যে আশঙ্কার কোন কারণ উপস্থিত হইবে, ইহা তাঁহার কল্পনার অতীত। কিন্তু অতর্কিত দেশ হইতেই বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেখিতে দেখিতে আকাশকোণস্থ সেই ক্ষুদ্রকায় মেঘখানি মহীরাবণবধে মহাবীরের ন্যায় সহসা ভীষণ বৃহদাকার ধারণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে পবনদেব প্রবাহিত, অমনি উত্তাল তরঙ্গে পদ্মাবতী সহসা রণরঙ্গিণী-বেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, নৌকা যায় যায়! আরোহিগণ কোলাহলপূর্ব্বক ক্রন্দন আরম্ভ করিল, মাঝি মাল্লাগণ তাহাদিগকে কখন সান্ত্বনাবাক্যে কখন বা শাসনবাক্যে সুস্থির হইয়া বসিবার উপদেশ দিতে লাগিল, আর প্রাণপণে বাহিয়া নৌকাখানিকে তীরবর্ত্তিনী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বালক শরৎকুমার এই বিপদে একবারে হতবুদ্ধি ও হতাশ হইয়া মাত্র মনে মনে তাঁহার পৈতৃক উপাস্য দেবতা শ্রীভগবানের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বায়ুবিক্রমে প্রবল তরঙ্গায়িত পদ্মানদী পার হইয়া নৌকা নিরাপদে বালুকাময় তীরভূমি সংলগ্ন হইল। আরোহিগণ সকলেই সবলকায়, সত্বর তীরে অবতরণ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বালুস্তর অতিক্রমণ পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী উচ্চ ভূমিতে গিয়া আশ্রয়

গ্রহণ করিল; শরৎকুমার কৃশকায় বালক, বালুস্তর পার হইতে না পারিয়া ক্লান্ত কলেবরে হতাশভাবে বালুকা মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। ভীষণ ঝড়বেগে তাড়িত হইয়া পদ্মার জল স্তূপাকারে পর্য্যায়ক্রমে এক একবার আসিয়া সেই বালুকাস্তরের উপর পড়িতেছে, পুনর্ব্বার সবেগে সরিয়া যাইতেছে। নিরাশ্রয় বালক বালুকাশ্রয়ে যে স্থানে বসিয়া আছেন, নিমেষমাত্রে বায়ুতাড়িত বারিরাশি তথায় আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবে, এবং সম্ভবতঃ পরক্ষণেই তিনি ঐ জলরাশির সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া অদূরবর্ত্তী পদ্মাগর্ভে এ জন্মের মত অদৃশ্য হইবেন! সুচতুর আরোহিগণ সকলেই স্বস্ব দ্রব্যজাত লইয়া অগ্রেই অগ্রসর হইয়াছেন, হতভাগ্য বালক অবসন্নদেহে বিস্তীর্ণ সরিৎসৈকতে বসিয়া মাত্র মৃত্যুর মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঝিমাল্লাগণ বালককে বিপন্ন দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিল এবং তাঁহাকে সেইস্থানে ধরাশায়িত করিয়া সকলে সত্বর বালুকারাশি মধ্যে তাঁহার দেহ প্রোথিতপ্রায় করিয়া রাখিল। দেখিতে দেখিতে পদ্মার জল আসিয়া তীরভূমি প্লাবিত করিল, মাঝিমাল্লাগণ ভাসিয়া গেল, শরৎকুমার সেই স্থানেই নিমেষমাত্র কাল জলতলে প্রোথিত রহিলেন। নিমেষান্তরে জলরাশি অপসৃত হইল; মাঝিমাল্লাগণ সন্তরণে সবিশেষ পটু,—মুহূর্ত্ত মধ্যে মূর্চ্ছিতপ্রায় বালকের সমীপে আসিয়া তাঁহাকে বালুকাগর্ত্ত হইতে উত্তোলিত করিয়া দূরবর্ত্তী উচ্চভূমিতে লইয়া গেল; ক্রমে বায়ুবেগ নিরস্ত হইলে পুনর্ব্বার নৌকায় আনিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করিয়া দিল।

শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের বাল্যজীবনে বঙ্গদেশের অবস্থা বড়ই আশাজনক। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে কতকগুলি প্রতিভাশালী মহাপুরুষ স্ব স্ব লীলাসংবরণপূর্ব্বক স্বর্গধামে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিভায় তখনও বঙ্গদেশ প্রতিভাসিত, কতকগুলি নবোদ্যমে অভিনয়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ, ইঁহাদের প্রভাব ক্রমশঃ বঙ্গসমাজকে আয়ত্ত করিতে উদ্যত, আর কতকগুলি বা তখনও মাত্র বাল্যলীলা-পরায়ণ। এ যুগের প্রধান অবতার চারিজন; তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তদুত্তর মহাযশাঃ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন, তদনুজ প্রদীপ্তপ্রতিভাশালী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ তথা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। এই চারি মহাপুরুষই বঙ্গের বর্ত্তমান যুগের প্রধান প্রতিষ্ঠাকারক। প্রথমটির আবির্ভাব ১৮২০ ও তিরোভাব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে; দ্বিতীয়ের আবির্ভাব ১৮২৪, তিরোভাব ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে; তৃতীয়ের আবির্ভাব

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, তিরোভাব ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে; এবং চতুর্থের আবির্ভাব ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, তিরোভাব ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। এই অবতার-চতুষ্টয়ের সহিত বঙ্গীয় বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বলিতে গেলে ইঁহারাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাগুরু। স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্রও এই মহাপুরুষ-চতুষ্টয়ের প্রতিভাচ্ছায়ায় সংবর্দ্ধিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সন ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখে তৎকালীন হুগ্‌লী জেলার অন্তর্গত বীরশৃঙ্গ (বীরশিঙ্গা) গ্রামে ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔরসে স্বর্গীয়া ভগবতী দেবীর গর্ব্ভে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম। এখন এই গ্রামখানি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বালক ঈশ্বরচন্দ্র নয়বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজগ্রামস্থ পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তৎপরে পিতা ঠাকুরদাস তাঁহাকে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় নিজ কর্ম্মস্থানে লইয়া আসেন। কলিকাতায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চাকুরীর মাসিক আয় আটটি টাকা মাত্র ; তবে কথা, সে আমলে ৩৲ তিন টাকা খরচে একটী লোকের এক মাস 'দুধেভাতে' চলিত।

কলিকাতাযাত্রী নবমবর্ষীয় বালক 'বিদ্যাসাগর' বাবার সঙ্গে বীরশিঙ্গা হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া আসিতে আসিতে সর্ব্বপ্রথম নূতন দৃশ্য দেখিলেন,—বাঁট্‌না-বাঁটা শীলের ন্যায় বড় একখানি পাথর পথের ধারে খাড়া করিয়া পোঁতা রহিয়াছে! কৌতূহলাক্রান্ত পুত্র পিতাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, ওখানে ও শীলখানি পোঁতা কেন?" পিতা কহিলেন,—"আমরা এই এক মাইল রাস্তা আসিয়াছি, এক মাইলের চিহ্নস্বরূপ ঐ পাথরখানি পোঁতা রহিয়াছে ; ঐ দেখ উহাতে ইংরাজিতে একের অঙ্ক খোঁদা রহিয়াছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় এইমাত্র সঙ্কেত পাইয়াই রাস্তা চলিতে চলিতে পর পর প্রোথিত প্রস্তরফলকগুলিতে খোদিত অঙ্কগুলি দেখিয়া ইংরাজি সংখ্যাসূচক চিহ্নসকল স্থির করিয়া লইলেন, এবং কলিকাতার বাসায় পৌঁছিয়া তিনি একটি ইংরাজি অঙ্ক কসিয়া দিলেন। ইহাতে পিতা ও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ বালকের অসাধারণ প্রতিভার আভাস পাইয়া বড়ই বিস্মিত ও আশান্বিত হইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও অভিনিবেশের গুণে প্রতিবর্ষের পরীক্ষাফলেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ,

সাহিত্য, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পাঠ সাঙ্গ করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যকালে যখন কলিকাতায় পিতার নিকট থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার দুইটি অনুজও তাঁহাদের নিকট থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। রন্ধনাদি কার্য্য জ্যেষ্ঠ বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই স্বহস্তে করিতে হইত; অথচ নিয়মিত পাঠাভ্যাসেও তাঁহার বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইত না। "ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়" (Where there is will there is way) এই মহাবাক্যের সার্থকতা বিদ্যাসাগর-জীবনে পুনঃ পুনঃ সপ্রমাণ হইয়াছে।

যাহা হউক, অধ্যয়ন সমাপনান্তে অল্পকাল মধ্যেই তিনি ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পদের মাসিক বেতন তখন ৫০৲ টাকা। ঐ চাকরীই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাবি সৌভাগ্যের ভিত্তিস্বরূপ। তখন ইংলণ্ড হইতে যে সকল নূতন সিবিলিয়ন্ সাহেব এদেশে আসিতেন, তাঁহারা প্রথমতঃ কিছুকাল এই ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে এ দেশের ভাষা শিক্ষা করিতেন, সুতরাং নবাগত সিবিলিয়ন্‌গণের প্রত্যেককেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইত। এই হেতু ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তৎকালে এ দেশের শাসকসম্প্রদায়েও পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তঃশক্তি কিয়দংশে পরোক্ষ-ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই সকল সিবিলিয়ন্‌ই পরে ম্যাজিষ্ট্রেট্, কলেক্টর, কমিশনর, লেব্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণর ইত্যাদি রূপে এ দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়াছিলেন। এই সকল সাহেবের শিক্ষাবিধানকার্য্যে ইংরাজিভাষাজ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয়; এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সযত্নে ইংরাজিভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই উক্ত ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

অতঃপর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত হন; কিন্তু উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত মতদ্বৈধ ঘটায় অচিরেই পদত্যাগ করিলেন। পরে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজের ইংরাজ ছাত্রগণের অধ্যয়নের নিমিত্ত "বেতাল-পঞ্চবিংশতি"-নামক বাঙ্গালা সাহিত্য-পুস্তক প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করেন; ইহার দুই বৎসর পরেই পুনর্ব্বার মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎপরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। তখন উক্ত কলেজে প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্ট হয় নাই। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত

কলেজে প্রথমতঃ প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্ট হইল, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ই মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে প্রথম প্রিন্সিপাল হইলেন। এই পদে তাঁহার বেতন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ৩০০৲ টাকা হয়, তৎপরে উক্ত পদ সত্ত্বেও আবার গবর্ণমেণ্ট্ ইঁহাকে মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে বিদ্যালয় সমূহের বিশিষ্ট পরিদর্শকরূপে নিয়োগ প্রদান করিলেন। উভয় পদে কর্ম্ম করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাসিক আয় এক্ষণে ৫০০৲ টাকা দাঁড়াইল।

এই সময়েই মহানুভব ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ বিষয়ক তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হিন্দু বালবিধবাগণের বিবাহ যে সম্যক্ শাস্ত্র-সম্মত ইহা সপ্রমাণ করিয়া তিনি একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিলেন। এ বিষয়ে অন্যান্য মান্যগণ্য শাস্ত্রজ্ঞগণের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করিলেন; ফলতঃ দেশময় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, সামাজিকগণের অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের মত-বিরোধী, এমন কি ঘোর শত্রু হইয়া উঠিলেন। তেজীয়ান্ বিদ্যাসাগর কিন্তু টলিবার লোক নহেন। তিনি নির্ভয়ে অধ্যবসায় সহকারে নিজ মত প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্বতঃপরতঃ যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার সবিশেষ চেষ্টায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইল। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে অনেক স্থানে অনেক বিধবার বিবাহ হইতে লাগিল। এমন কি, তিনি এক বিধবার সহিত নিজ একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া এবিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন।

বাঙ্গালার তৎকালীন ছোটলাট মহামতি হ্যালিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল। উক্ত ছোটলাটের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষাবিধান কল্পে অনেকস্থানে অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সময়ে ইয়ং নামে একটি অল্পবয়স্ক ইংরেজ সিবিলিয়ন্ ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। এই যুবকের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতদ্বৈধ ক্রমশঃ মনোমালিন্যে পরিণত হয়। বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ক ব্যয়সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল বিল্ পাঠাইলেন, ইয়ং সে সকল বিল্ না-মঞ্জুর করিলেন। এইরূপ নানাকারণে বিরক্ত হইয়া তেজস্বী বিদ্যাসাগর উপরি উক্ত উভয়পদই পরিত্যাগ করিলেন। সে সময়ের ৫০০৲ টাকার মূল্য এ সময়ের প্রায় পাঁচ হাজারের তুল্য। কিন্তু সেই আত্মমর্য্যাদারক্ষক মহাপুরুষ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বাধীন গ্রন্থকারবৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় স্বাবলম্বী অধ্যবসায়শীল ও তেজীয়ান্ ব্যক্তি অতি

বিরল। তিনি যখন মাসিক ৫০০৲ পাঁচশত টাকা বেতনের চাকরী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার নিত্যব্যয় কম নহে, এমন কি অনেক দরিদ্র নরনারী তখন গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত সেই মহাপুরুষের মুখাপেক্ষী, তদুপরি আবার তাঁহার ঋণ-পরিমাণও প্রচুর। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা জানিয়া কোন হিতৈষী বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব প্রকাশিত করেন যে,—বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ দেশহিতৈষী দানশীল মহাপুরুষ, তাহাতে তিনি যেরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়াছেন এবং ইদানীং সরকারি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ বিপন্ন হইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় দেশের ধনবান্ মহাত্মগণের একান্ত কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋণমুক্তির সবিশেষ ব্যবস্থা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংবাদপত্রে এই প্রস্তাব পাঠ করিবামাত্র লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এরূপ প্রস্তাবপ্রকাশের জন্য যথোচিত তিরস্কার করিলেন; এবং পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন,—"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে আমি আমার স্বকৃত ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী"? সে ভদ্রলোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে অপ্রতিভ! অগত্যা তাঁহাকে অঙ্গীকার করিতে হইল যে তিনি অবিলম্বেই তাঁহাব প্রকাশিত প্রস্তাবের প্রত্যাহার করিবেন, এবং ফলতঃও তাহাই করিলেন।

অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রমে ক্রমে অন্যূন ২৫ খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ঋণপরিশোধ হইল এবং তিনি যথেষ্ট ধনশালী হইয়া উঠিলেন। যদি স্বোপার্জ্জিত ধন সন্নিমিত্তে ব্যয় না করিয়া উহার সঞ্চয় করিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বোধ করি কলিকাতার প্রধান ধনিগণের মধ্যে পরিগণ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বিপন্নের বিপদ দেখিয়া, ব্যথিতের বিলাপ শুনিয়া একেবারেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি অনেক সময়ে স্বীয় সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া ঋণগ্রহণে অর্থসংগ্রহ করিয়া বিপন্নের বিপন্মোচন করিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় যখন ব্যারিষ্টারি শিখিবার নিমিত্ত বিলাত যান, তখন তিনি কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ধনকুবেরের সহিত স্বীয় সম্পত্তির একটা বন্দোবস্ত করিয়া এইরূপ স্থির করিয়া যান যে, ইউরোপে যাইয়া যখনই তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইবে, তখনই সংবাদ পাইবামাত্র উক্ত বড়লোক মহাশয় তাঁহাকে টাকা পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু দত্ত মহাশয় বিলাত গিয়া অর্থাভাবে

যার-পর-নাই বিপন্ন হইয়া বার বার পত্র পাঠাইতে লাগিলেন, বড়লোক মহাশয় অর্থ পাঠান দূরের কথা, পত্রের একখানি উত্তরও দিলেন না! মধুসূদন নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সবিস্তার জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন। পত্র পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর সেই মহাপ্রভুর বাটীতে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ওহে! মধু তোমাকে টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত বার বার পত্র লিখিয়াছে, তাহাতে তুমি পত্রের উত্তরখানি পর্য্যন্ত দাও নাই কেন?"

বড়লোক।—আসুন আসুন! বসুন! প্রণাম! আপনার পদার্পণে আমার গৃহ আজ পবিত্র হইল।

বিদ্যাসাগর।—(দণ্ডায়মান থাকিয়া) বলি, মধুর পত্র তুমি পেয়েছ?

বড়-।—আজ্ঞে, পেইচি, সে কথা আর বল্‌বেন না, সে কষ্টের কথা সব পড়্‌লে চোকে জল আসে,—আমি সে সব আর পড়্‌তে পার্‌লুম্‌ না; ওই ফাইলে রেখে দিয়েছি।

বিদ্যা-।—টাকা পাঠালে না কেন?

বড়-।—আজ্ঞে, টাকাকড়ি এখন পাঠান, সে কেমন ক'রে বা হয়, অনেক ঝঞ্ঝট—

"ওরে বেটা চোর! আমি আর তোর মুখদর্শন কর্‌বো না।"

বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাবিরক্তভাবে বড়লোক মহাশয়ের পুণ্যধাম পরিত্যাগ করিয়া তদ্দিনেই তাঁহার 'সংস্কৃত ডিপজিটরি' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের স্বত্বাংশ আবদ্ধ রাখিয়া কয়েক হাজার টাকা ঋণ লইয়া মাইকেল মধুসূদনকে পাঠাইয়া দিলেন। এই টাকা না পাইলে মধুসূদনকে হয়ত অবমাননাভয়ে আত্মহত্যা, না হয় ঋণদায়ে কারাদণ্ডভোগ করিতে হইত। অতঃপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্যাসাগর মহাশয় আর কখনও সেই গুণধর বড়লোকটীর সহিত বাক্যালাপ বা সাক্ষাৎকার করেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানের কথা, সে সব উপকথাবিশেষ! উহার শ্রবণ-কীর্ত্তনে চিত্ত যেমনই পরিতৃপ্তি তেমনই উৎকর্ষ লাভ করে।

কলিকাতায় গোলদিঘীর দক্ষিণধারে কোন একটি দোতলা বাসার বারান্দায় বসিয়া একটি বাঙ্গালীবাবু দেখিতে পাইলেন, নিম্নে ফুটপাথের উপর বসিয়া একটি যুবতী কন্যা একখানি কাগজ হাতে করিয়া নীরবে কাঁদিতেছে। বাবু কন্যাটীকে ডাকাইলেন। কন্যা নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

কন্যা।—আমি ব্রাহ্মবালিকা। আমার মাতাপিতা বা ভ্রাতা কেহই নাই। একটি দয়ালু ব্রাহ্মভদ্রলোকের পরিবার মধ্যে আমি প্রতিপালিতা হইতেছিলাম। উক্ত ভদ্রলোকের দয়াতে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের কোনই কষ্ট ছিল না। অন্য এক দয়ালু ব্যক্তি আমার পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন; আমি বেথুন্ স্কুলে পড়ি। সংপ্রতি দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ দুই মহাত্মাই পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি আশ্রয়হীন নিরুপায়। তাই নিজের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া এই দরখাস্তখানি লিখিয়া সাহায্য প্রার্থনায় আজ তিনদিন ধরিয়া কত বড়লোকের বাড়ীতে গেলাম, কিন্তু কোথাও কোন ফল হইল না।

বাবু।—কে কি বলিলেন ?

কন্যা।—অনেকের সঙ্গে দেখাই করিতে পারিলাম না, দারোয়ানের মারফৎ দরখাস্ত পাঠাইলে দারোয়ান আসিয়া দরখাস্ত ফেরত দিয়া কহিল,—এখানে কিছু হইবে না, অন্যত্র যাও। যে দুই একজনের সহিত দেখা করিতে পারিলাম, তাঁহারা আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক দুই একটা হিতোপদেশ দিলেন মাত্র, অন্য কোন সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহা ছাড়া কেহ কেহ আমাকে দুই একটি কুবাক্য কহিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

শেষ কথাটুকু কহিয়াই কন্যাটী উচ্ছ্বাস ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। সহৃদয় বাবুটির চক্ষু হইতেও দুই চারিটি মুক্তাবিন্দু ঝরিল। বাবু ধীর ভাবে কহিলেন,—

"মা, কেঁদ না। মানুষের দোষ নহে, ও সব দারিদ্র্যদুর্গ্রহের চিরন্তন লক্ষণ। সুসময় আসিলে আবার সকলেই সমাদর করিবে। বোধ হইতেছে, সারাদিন তুমি কিছু খাও নাই। আমি কিছু খাবার আনাইয়া দেই, তুমি খাও। তাহার পরে, আমি যে স্থানের কথা বলি, তুমি একবার তথায় যাইয়া দেখ।

কন্যা।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি কিছু খাইব না। আপনি বলুন, কোথায় যাইব। তবে, আমি আর কোন বড়লোকের বাড়ীতে যাইব না।

বাবু।—সে কি! মা, তুমি ত কোন যথার্থ বড়লোকের বাড়ীতে যাও নাই। আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, ইনি যথার্থই বড়লোক; তুমি একবার যাও দেখি।

কন্যা।—তিনি কে, বলুন দেখি।

বাবু।—তুমি একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাও।

কন্যা।—তিনিও ত বড়লোক!

বাবু।—হাঁ, তিনিই বড়লোক। তুমি একবার বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা কর। যদি দেখা করিতে না পার, অন্ততঃ দরখাস্তখানি দারোয়ানকে দিয়া পাঠাইয়া দিও। তার পরে, যেরূপ ফল হয়, অবশ্য অবশ্য আমাকে বলিয়া যাইও। তুমি অনেক কষ্টভোগ করিয়াছ, আমার অনুরোধে এ কষ্টটুকুও স্বীকার কর, একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাও।

কন্যা।—আচ্ছা, আপনার অনুরোধরক্ষা আমি অবশ্যই করিব। কিন্তু কোন বড়লোকের বাড়ীতে যাইতে আর আমার প্রবৃত্তি হয় না; তবে আপনি যখন বলিতেছেন, আমি যাইতেছি। যেরূপ ফল হয়, ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে জানাইব।

এতাবৎ কহিয়া কন্যাটি দোতলা হইতে নামিয়া আসিল। বাবু তাহাকে কিছু খাওয়াইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইলেন, মর্ম্মাহতা হতভাগিনী কিছুই খাইল না।

বেলা তখন অপরাহ্ণ, অনুমান চারিটা। বাবু সেই দোতলা বাসার সেই বারান্দাতেই একখানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। ক্রমে দিবাবসান হইয়া আসিল; কলিকাতা সহরে দিবাবসানে আবার কতই কৃত্রিম শোভা আরম্ভ হইল! কলেজ ষ্ট্রীটে সারি সারি গ্যাস্‌কুসুম ফুটিতে লাগিল। কুল্‌পি বরফ্, অবাক্ জলপান্, ঘুগনিদানা প্রভৃতি পাপিয়া-পিক থাকিয়া থাকিয়া মধুর ঝঙ্কারে, শ্রবণে না হউক, অনেকের রসনায় রসসঞ্চার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের গ্যাসালোক প্রতিবিম্বিত হইয়া গোলদিঘীকে যেন বিকসিত কাঞ্চনপঙ্কজময় করিয়া তুলিল। এমন সময়ে বাবু দেখিলেন, বাসার দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। অবিলম্বেই সেই কন্যাটি পুনর্ব্বার আসিয়া বাবুকে প্রণাম করিল।

বাবু।—তুমি গিয়াছিলে?

কন্যা।—আজ্ঞে হাঁ। আপনি আমাকে বড়ই সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বড়লোক।

বাবু।—তিনি ত বড়লোক সত্যই, তোমার বিষয় কি হইল?

কন্যা।—আজ্ঞে, বড়লোকের সংসর্গে আমিও বড়লোক হইয়াছি।

বাবু।—তুমি বড়লোক হইলে,—কিরূপ?

কন্যা।—আজ্ঞে, আমি আজ হইতে বিদ্যাসাগরের মা হইয়াছি।

বালিকার মুখখানি এখন প্রভাতপদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল, অথচ 'আমি বিদ্যাসাগরের মা হইয়াছি' বলিতে গিয়াই তাহার উজ্জ্বল অক্ষিযুগলে শিশিরবিন্দুবৎ অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। এই হাসিকান্নার অপূর্ব্ব সংমিলনে সে যেন যথার্থই মেঘাম্বুতে রবিকরবিম্বপাতে ইন্দ্রধনুর ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। বাবু সাহ্লাদে কহিলেন,—"আপনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মা? তাহা হইলে·ত আপনি জগতের মা! মাতাপুত্রে কি কি কথাবার্ত্তা হইল?

কন্যা।—আমি পূর্ব্ব হইতেই বড়লোকের উপর বিরক্ত হইয়া গিয়াছিলাম; এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট স্বয়ং সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা না জানাইয়া মাত্র লোক দ্বারা দরখাস্ত খানি পাঠাইয়া দিলাম। একটু পরেই তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরে আমার মুখে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন,—"আজ হইতে তুমি আমার মা, আমি তোমার ছেলে। মা, তোমার গ্রাসাচ্ছাদন অধ্যয়ন ইত্যাদির ব্যয়ভার আমার উপরই রহিল।" তাহার পর তিনি আমাকে জিদ্ করিয়া অনেক ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াইলেন, আমাকে কয়েকখানা নূতন কাপড় নূতন বই ও কয়েকটি টাকা দিলেন। আর, আমি যে বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীতে দিবার নিমিত্ত এই পত্রখানি নিজ হাতে লিখিয়া দিলেন। ঐ বাড়ীতেই আমাকে থাকিতে বলিলেন, আমার মাসিক ব্যয় তিনি দিবেন, আর সেই অনাথপরিবারবর্গকেও মাসে মাসে সাহায্য করিবেন। শেষে আমাকে একখানি গাড়ী করিয়া লোক সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। মহাশয়, বড়লোক কাহাকে বলে আজ তাহা বেশ বুঝিলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময়ে স্বহস্তে পীড়াগ্রস্তের সেবাশুশ্রূষা করিতে বড়ই আনন্দানুভব করিতেন। কলিকাতা সহরে যখন রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে গ্যাসের আলো জ্বলিত না, ভূতলস্থ পয়ঃপ্রণালীতে যখন সহরের আবর্জ্জিত জল নিষ্কাশিত হইত না, নিশাকালে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথপ্রণালীগুলিতে যখন মূষিক সর্প তস্করাদির সতত গতিবিধি হইত, প্রশস্ত প্রশস্ত পথে পুলিশ্‌প্রহরিগণের হো হো রবের প্রত্যুত্তরে যখন ফেরুপাল হোয়া হোয়া রব করিয়া উঠিত, বিসূচিকা প্রভৃতি যমদূতীগণ যখন এ সহরে স্বেচ্ছাবিহারে প্রত্যহ শত শত নরনারীর প্রাণহরণ করিত, সে সময়ে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের দেবোপম চরিত্রের কথা কীর্ত্তনাতীত? এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার ও পাশ্চাত্য আদর্শে, যথার্থ সহৃদয়তাগুণেই হউক আর যশোলিপ্সা হেতুই হউক, পরোপকারপ্রবৃত্তি শিক্ষিত সমাজে যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে. সে সময়ে সেরূপ করে

নাই; দাতব্যচিকিৎসালয়ের ব্যবস্থাপনও তখন এখনকার মত হয় নাই; সে সময়ে অনেকসময় এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোন এক অপরিষ্কৃত স্থানে জীর্ণ কুটীর মধ্যে হয় ত একটি জীর্ণকায় সংজ্ঞাহীন মুমূর্ষু রোগী ভূমিতলে মরণশয্যায় পড়িয়া আছে, সুবিচক্ষণ আত্মীয় স্বজনগণ স্ব স্ব প্রাণরক্ষাকল্পে পলায়নপূর্ব্বক সময় থাকিতে সাবধান হইয়াছেন, হতভাগ্য মুমূর্ষু বিসূচিকার প্রবল পিপাসায় রহিয়া রহিয়া মাত্র বিকটাকার মুখব্যাদান করিতেছে; গৃহকোণস্থিত মুহ্যমান মৌনীপ্রদীপের ক্ষীণালোকে কেবল দেখা যাইতেছে, একটি উৎকলবাসিবৎ পরিদৃশ্যমান পুরুষ মুমূর্ষুর পার্শ্বে বসিয়া কৃপাহস্তে একটি কাচপাত্র ধরিয়া তাহার মুখে কখন বা একটু জল দিতেছেন, কখন বা একটু ঔষধসেবন করাইতেছেন, আর যেন কতই চিন্তাকুলচিত্তে নির্ণিমেষ নয়নে রোগীর মুখনয়নের ভাবভঙ্গি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন!—এ মহাপুরুষ কে?—রোগীর পিতা, পুত্র, না সহোদর?—কেহই নয়; ইনিই সেই বঙ্গাকাশের পূর্ণচন্দ্র মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!

এইরূপ পরহিতার্থেই বিদ্যাসাগর স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখিয়াছিলেন। তখন এদেশে হোমিওপ্যাথির মাত্র শৈশবাবস্থা, সেই অবস্থাতেও তিনি হোমিওপ্যাথি কেবল যে স্বল্পমাত্র শিখিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি আমেরিকার হোমিওপ্যাথিক সভা হইতে (Fathar of Homœopathy) 'ফাদার অব্ হোমিওপ্যাথি' এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনেকের মনে এখনও পর্য্যন্ত এইরূপ বিশ্বাস যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মাত্র সংস্কৃত শাস্ত্রেই পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, ইংরাজি ভাষায় তাঁহার তেমন পাণ্ডিত্য ছিল না। কিন্তু সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি সংবাদপত্রের তদানীন্তন সম্পাদক স্বনামধন্য স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় একদা সবিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কিয়ৎকালের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে যাইবার মানস করেন; কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতি-কালের নিমিত্ত কোন্ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উক্ত পত্রের সম্পাদনভার অর্পণ করিয়া যাইবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, এতদ্বিষয়ে সুপরামর্শ করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গমন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাল মহাশয়ের সমস্ত কথা শুনিয়া কিছুকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—তাইত, সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলির লিখনভার কাহার হস্তে দেওয়া যায়? রাজনৈতিক বিষয়ের সমালোচনা!—সে ত সহজ কথা নহে, আবার ভাষাটিও ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়

নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়া আবশ্যক, নতুবা কাগজের পসার নষ্ট হইবে। আমি ত এরূপ ভারার্পণের উপযুক্ত আর লোক দেখিতেছি না। আমার নিজের হাতেও ত এখন অনেক কাজ; কি করা যায়!

'আমার নিজের হাতেও ত এখন অনেক কাজ' এই কথাটুকু শুনিয়া পাল মহাশয় বড়ই বিস্মিত হইলেন। তবে বুঝি, অবসর থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ংই হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদনভার গ্রহণ করিতেন, এই ভাবিয়া তিনি কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে কহিলেন, যদি আপনি কোনরূপে এ ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত মনে স্থানান্তরে যাইতে পারি, নতুবা ত আর উপায় দেখি না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—আচ্ছা, তবে তাহাই হইবে।

ফলতঃ পাল মহাশয়ের অনুপস্থিতিকালে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল উহার যৌক্তিকতা ও ভাষাভঙ্গি দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে ঐ সকল প্রস্তাব মাননীয় পাল মহাশয়ের স্বলেখনীপ্রসূত নহে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে এফ্, এ, ও বি, এ, শ্রেণীর প্রাইভেট্ কলেজের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। কলিকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ মেট্রপলিটান্ কলেজ তাঁহার এক শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ। পূর্ব্বে দেশীয়গণের মনেও ধারণা ছিল এবং সাহেবেরাও সময়ে সময়ে বলিতেন যে, সাহেব ভিন্ন কেবল বাঙ্গালীর দ্বারা কলেজ পরিচালিত হইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে সে ধারণা খণ্ডন করিয়া দিলেন। তাঁহার ন্যায় গুণগ্রাহী ব্যক্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বাছিয়া বাছিয়া যে সকল লোকের হস্তে উক্ত কলেজের অধ্যাপনাভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক একটী লোক বঙ্গের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় মনীষী প্রসন্নকুমার লাহিড়ী (Mr. P. K. Lahiri), সুবিখ্যাত মিঃ এন্, এন্, ঘোষ, স্বর্গীয় পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অধ্যাপকমণ্ডলী অধ্যাপনাবিভাগের অলঙ্কার স্বরূপ, এবং ইঁহারা সকলেই স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোনীত ও মুখ্য প্রিয়পাত্র।

সেই দেবমানব মর্ত্ত্যাবাসকালে বহুপ্রকারে লোকহিত ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অবশেষে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অমরধামে গমন করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বড়ই সৌহার্দ্দ ছিল ; কেবল সৌহার্দ্দ নহে, রামতনু বাবু বাঙ্গালীর মধ্যে একজন যথার্থ ন্যায়বাদী ন্যায্যকর্ম্মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও নির্ম্মলচরিত্র ব্যক্তি বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার শুভাশুভের প্রতি সতত সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। যাহার বিচারে ও আচারে—কথায় ও কার্য্যে অনৈক্য সেরূপ ব্যক্তি কমলা বা বাগ্‌দেবীর বরপুত্র হইলেও, বিদ্যাসাগর মহাশয় সতর্ক ভাবে তাহার সংসর্গ পরিহার করিতেন, আর যাহার অন্তরে বাহিরে ঐক্য দেখিতেন, সে ব্যক্তি নিতান্ত নগণ্য হইলেও তিনি তাঁহাকে বহুমান্য জ্ঞান করিতেন। এই জন্যই রামতনু বাবু দরিদ্র হইলেও তিনি তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন, এবং এই জন্যই তদানীন্তন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়গণের মধ্যে অনেকের প্রতিই তাঁহার যথোচিত ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। অনেক মফস্বলবাসী ছাত্র কলিকাতায় আসিয়া মেট্রপলিটান্ কলেজে বিনাবেতনে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা জানাইলে তিনি অনেক সময়ে কহিতেন,— বাপু হে, তুমি যদি যথার্থই দরিদ্র হও, এবং বেতন দিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু আমি মাত্র তোমার কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিব যে তোমার বেতন দিবার ক্ষমতা নাই ? আচ্ছা ভাল, ব্রাহ্মসমাজের কাহারও সহিত তোমার আলাপ পরিচয় আছে কি ? তাঁহাদের কাহারও নিকট হইতে তুমি নিজ দরিদ্রতা বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ একখানি পত্র আনিতে পার কি ? তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাকে বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিব।

ইহা হইতে স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে তখনকার ছাত্রগণ অনেকে ছলনাপূর্ব্বক দরিদ্র সাজিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে যাইত, এবং ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, সে সময়ের ব্রাহ্মগণ অনেকেই সত্যলঙ্ঘনে একান্ত পরাঙ্‌মুখ ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন না, কিন্তু উক্ত কারণবশতঃ ব্রাহ্মমহাশয়গণের প্রতি তাঁহার সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

ইদানীং আমরা বাঙ্গালী-সাহেব অনেক দেখিতে পাই। ইহারা জাতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বহুবিষয়েই বাঙ্গালী, অথচ আহারে বিহারে ও বেশভূষণে মাত্র সম্পূর্ণ সাহেব। কিন্তু বাস্তবিক বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ছিলেন চূড়ান্ত বাঙ্গালী-সাহেব। তিনি জাতিতে বাঙ্গালী, আকৃতিপ্রকৃতিতে বাঙ্গালী, আহারে বিহারে

বাঙ্গালী, দয়ায় দীনতায় বাঙ্গালী, বেশভূষণে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী, কিন্তু তিনি সত্যপালনে সাহেব, আত্মমর্য্যাদায় সাহেব, পরোপচিকীর্ষায় সাহেব, কর্ত্তব্যসাধনে সাহেব, চিত্তদাঢ্যে সাহেব, নিয়মানুসারিতায় সাহেব, যথাকালপ্রবোধিতায় সাহেব এবং অধ্যবসায়ে অদ্বিতীয় সাহেব! তদানীন্তন সাধু সুপণ্ডিত সুদক্ষ সাহেবগণের চরিত্রে তিনি যে সকল সদ্‌গুণ দেখিয়াছিলেন, সুদীন বাঙ্গালীবেশেই তিনি সে সমুদয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তদানীন্তন অলীক আমোদপ্রিয়, অর্থলোভে তোষামোদপরায়ণ, আলস্যসার, পরস্বমোষক সমাজসর্ব্বস্ব অধিকাংশ বাঙ্গালী মহাশয়গণের মধ্যে যে সকল মহানিষ্টকর দোষ দেখিতে পাইয়াছিলেন, সম্পূর্ণ সাহেবোচিত সাহসের সহিত সে সকল স্বয়ং পরিহার করিয়াছিলেন এবং অপরাপর সকলেই যাহাতে পরিহার করে তদ্‌বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরগুণগ্রাহী ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সে সময়ে অতি অল্পই ছিল; এবং অন্যায়ের প্রতি খড়্গহস্ত হইতেও তাঁহার ন্যায় আর অতি অল্প লোককেই দেখা গিয়াছে। স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ও ঠিক এইরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন। সেই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ, এবং সেই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় রামতনুবাবুর প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। ইঁহারা উভয়েই বড় মাতৃভক্ত ছিলেন; পরের দুঃখ দেখিলে উভয়ের হৃদয়ই একেবারে অধীর হইয়া উঠিত; এবং মহাকবি গোল্‌ড্‌ স্মিথ্‌ বিরচিত সেই মনোহর কবিতাংশ,—"His pity gave ere charity began" এই উভয় মহাপুরুষের চরিত্রেই সম্যক্ প্রযোজ্য। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন ঐশ্বর্য্যবান্, রামতনু বাবু দরিদ্র; এক জন যেন আমীর, অপর জন যেন ফকীর; নচেৎ উভয়ের অন্তঃকরণই এ সম্বন্ধে সমোপাদানে গঠিত।

রামতনু বাবু যখন বৃদ্ধবয়সে সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন, তখন তাঁহার শরীরও সুস্থ নহে আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল নহে। তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ সিটি স্কুলের নীচের তলায় বাস করিতে লাগিলেন। সেরূপ বাসস্থান যদিও তাঁহার পক্ষে তখন বড়ই অসুবিধাজনক ও অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু উপায় কি? বেশি টাকা ভাড়া না দিলে ভাল বাসস্থান মিলে না; পরিবারবর্গের ভরণপোষণ চালাইয়া বাসা ভাড়া দিতে পারেন এরূপ অর্থসামর্থ্যও তখন তাঁহার নাই; সুতরাং কষ্ট স্বীকার করিয়া উপরিউক্ত স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। সহসা

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সমাচার অবগত হইয়া রামতনুবাবুকে দেখিতে আসিলেন, এবং তিনি তাঁহার বাসস্থানের দুরবস্থা দেখিয়া সমভিব্যাহারী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বলিয়া তাঁহার একটি খালি বাড়ীতে রামতনুবাবুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

যাহা হউক, পিতার এইরূপ সাংসারিক কষ্টের দায়ে সাধুপুত্র শরৎকুমার সত্বরই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু চাকরী ব্যতীত অভাগ্যবান্ বাঙ্গালীসন্তান আর কি উপায়ে অনশনমৃত্যুর দায়ে আশু অব্যাহতি পাইবেন? সুতরাং শরৎবাবুও চাকরীর উমেদার হইয়া দরখাস্ত হস্তে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই অনেক বিষয়ে লাহিড়ী-পরিবারের উপকার আনুকূল্য করিতেছিলেন; এজন্য শরৎবাবু প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলেন যে আর তাঁহাকে চাকরীর জন্য কোনরূপ অনুরোধ জানাইবেন না। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে, তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেব প্রাণান্তেও কখন কাহারও নিকট কোনরূপ উপরোধ অনুরোধ জানাইতে ইচ্ছুক নহেন। এজন্য তিনিও কাহারও সই সুপারিস না লইয়া মাত্র স্বচেষ্টায় সঙ্কল্পসাধন করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। কিন্তু উমেদার অবস্থায় যাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হন, তিনিই শরৎবাবুর পরিচয় পাইয়া কহেন,—তুমি রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র? তোমার চাকরীর ভাবনা কি? কত রাজা মহারাজা পণ্ডিত মহাজন তোমার পিতার ছাত্র; তাঁহাদিগের কাহাকেও তোমার পিতা ইঙ্গিতে একটি কথা বলিয়া দিলেই ত তোমার ভাল চাকরী যুটিয়া যাইবে! তুমি কেন এ সামান্য চাকরীর প্রার্থী হইয়াছ?

শরৎবাবু বাড়ীতে আসিয়া পিতার নিকট ঐ সকল কথা প্রকাশ করিলে শালগ্রাম-পিতা সমভাবে থাকিয়াই মাত্র শুনিয়া যান, অবশেষে অবসরমতে শরৎবাবুর জননীর নিকট বলেন,—শরৎকে বলিও আমি আর এ বয়সে কাহারও নিকট কোন উপরোধ অনুরোধ জানাইতে পারিব না। সে নিজেই যথাশক্তি চেষ্টা করুক্, ভগবান্ অবশ্যই কৃপা করিবেন।

মাতৃমুখে সাধুপিতার সদুপদেশ শুনিয়া শরৎকুমারের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার হইত, তিনি আর কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া শতগুণ উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইতেন। বাঙ্গালী মহলে কিছুদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া অবশেষে তিনি সাহেব মহলে উমেদারি আরম্ভ করিলেন। শরৎবাবুর এই

উমেদারি-কর্ম্মভোগসময়ে একদিন এক বিষম প্রহসন ঘটিয়াছিল। শরৎবাবু প্রৌঢ়বয়সেও এক এক সময়ে সকলের সমক্ষে সে উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া পরিহাস করিতেন।

তিনি একদিন উমেদার হইয়া দরখাস্ত হস্তে এক সাহেব-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। দারোয়ানকে দিয়া এত্লা করিলে সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাক্ষাৎকারে সেলাম দিয়া শরৎবাবু সাহেবের হাতে দরখাস্তখানি দিলেন। সাহেব সদয়ভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন এবং সানুগ্রহ দৃষ্টিতে শরৎবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দুই একটি আশাসূচক কথাও কহিতে লাগিলেন। শরৎবাবু মনে ভাবিলেন, এইবার বোধ করি কপাল ফিরিল, বোধ হয় সাহেবের চাকরী দিবার অভিপ্রায় হইয়াছে। দীনভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কেবল আশার অসংখ্য মায়ামন্ত্র শুনিতেছেন, এমন সময়ে সাহেব সহসা গাত্রোত্থান করিয়া একটি শীস্ দিলেন. সঙ্গে সঙ্গে একটি সারমেয় ছুটিয়া আসিল। সুরসিক সাহেবপ্রবর শরৎবাবুর দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া সঙ্কেত করিলেন। কুক্কুরটি অমনি দশনপংক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সশব্দে দংশনোদ্যত!

শরৎবাবু সাহেবের এই বিশিষ্ট শিষ্টাচারে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। অগত্যা ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন, কুক্কুরও ক্রমে অগ্রসর! সাহেবকে যে বিদায়সূচক সেলাম্ দিয়া আসিবেন সে অবসরও দিল না, দংশন করে আর কি! তখন সবেগে পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ছুটিতে ছুটিতে একেবারে সদর রাস্তায় আসিলে তখন কুকুরটি প্রভুর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইল। শরৎবাবু দম ছাড়িয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সাহেব বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন! তখন তিনি বেশ বুঝিলেন, এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে "নকরী নয় কুকুরি।"

এইরূপে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হতাশ্বাস হইয়া অবশেষে স্থির করিলেন, আমি যখন চাকরী স্বীকার করিতেই প্রস্তুত, তখন আমার আবার আত্মমর্য্যাদা বা অভিমান কিসের জন্য? যেরূপ নীচমনাঃ ব্যক্তিগণের নিকট চাকরী প্রার্থনা করিয়া বেড়াইতেছি, ইহা অপেক্ষা আমার পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হওয়া সহস্রগুণে শ্লাঘনীয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গিয়া সবিস্তারে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিলেন,—শরৎ, এক্ষণে তোমার অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তুমি চাকরী করিয়া কিরূপে তোমার মাতাপিতার সাংসারিক কষ্ট দূর

করিবে? চাকরীতে কতই অর্থ উপার্জ্জন হইবে? যাহা হউক, এক্ষণে ত আর কোন সুযোগ দেখিতেছি না, অগত্যা মেট্রপলিটন কলেজের লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য কর। ঐ পদের মাসিক বেতন ৩০৲ ত্রিশ টাকা। আপাততঃ উহাতেও সংসারের কতকটা সাহায্য হইবে।

এই সময় হইতে শরৎবাবু মেট্রপলিটান্ কলেজের লাইব্রেরিয়ান্ হইলেন। রামতনুবাবু চেষ্টা করিলে যে ইহার পূর্ব্বেই শরৎবাবুর অন্য কোন ভাল চাকরী মিলিতে পারিত, সে কথা অযৌক্তিক নহে। স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মাননীয় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি রামতনু বাবুকে দেববৎ ভক্তি করিতেন, ইহাদের অনেকে তাঁহার ছাত্র; এতদ্ভিন্ন অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজও রামতনুবাবুকে চিনিতেন এবং যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তিনি যদি ইঙ্গিতে কাহাকেও অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ শরৎবাবুর চাকরী বিষয়ে সবিশেষ সুবিধা হইত। কিন্তু অনুরোধ করা দূরে থাকুক, রামতনুবাবু এরূপ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।

স্বনামপ্রসিদ্ধ মহাবাগ্মী মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামতনু বাবুকে পিতৃবৎ পূজনীয় জ্ঞান করিতেন, এবং শরৎবাবুর প্রতিও তিনি চিরদিনই কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ ও সমাদর প্রদর্শন করিতেন। সুরেন্দ্র বাবুর পিতা স্বনামখ্যাত প্রতিভান্বিত চিকিৎসক স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রামতনু বাবুর সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দুর্গাচরণ বাবুর প্রদীপ্ত প্রতিভাগুণে রামতনু বাবু তাঁহাকে বাঙ্গালী সমাজের একটি বিশিষ্ট গৌরবস্থল বলিয়াই জ্ঞান করিতেন, এবং রামতনু বাবুর মিষ্টবাক্য, শিষ্টাচার, নির্ম্মল চরিত্র, প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য ও অমায়িকতা প্রভৃতিগুণে দুর্গাচরণ বাবুও তাঁহাকে বাঙ্গালীসমাজের শীর্ষস্থানীয় একটি মহামাণিক্য জ্ঞানে সমাদর করিতেন, এবং নিজ অন্তরঙ্গবোধে সাংসারিক অনেক বিষয়ে তাঁহার নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বাস্তবিকই সুরেন্দ্রনাথের পিতা স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদানীন্তন বাঙ্গালীগণের মধ্যে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। কিন্তু পিতার যশঃপ্রদীপ পুত্র সুরেন্দ্রনাথের দিঙ্‌মণ্ডলব্যাপিনী কীর্ত্তিকৌমুদী মধ্যে ইদানীং যেন নিস্তেজ স্তিমিতপ্রায়! সুরেন্দ্র বাবুর তেজস্বিতা ও প্রতিভার উপাদান তাঁহার পূজনীয় জনকের চরিত্রে সবিশেষ পরিলক্ষিত হইত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বারাক্‌পুরের নিকটবর্ত্তী মণিরামপুর গ্রামে দুর্গাচরণের জন্ম। দুর্গাচরণ দশবৎসর বয়সের সময় বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতার হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। বিদ্যাভ্যাসকালে ইতিহাস ও গণিতশাস্ত্রে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ব্যুৎপত্তিলাভ করেন।

বিবাহের পর ইঁহার পিতা ইঁহাকে কলেজ হইতে আনিয়া নিমক্‌মহলে একটি সামান্য চাকরীতে নিয়োজিত করিয়া দেন। কিন্তু অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া চাকরী গ্রহণ করিতে দুর্গাচরণের তখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ছিল। পিতৃঅনুরোধে কিছুদিন চাকরী করিয়াই তিনি উক্ত মহলের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অধ্যয়নেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় দুর্গাচরণের পিতাকে ডাকাইয়া দুর্গাচরণকে পুনর্ব্বার পাঠে নিয়োজিত করিতে অনুরোধ করিলেন। পিতাও তদনুসারে পুত্রকে পুনর্ব্বার হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে স্বল্পকাল মধ্যেই দুর্গাচরণকে আবার পাঠ বন্ধ কবিতে হইল। এই সময়ে তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশিষ্টরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং কিছুকাল পরেই মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ইংবাজি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একুশ বৎসর মাত্র।

একদিন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে সহসা সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার পত্নী সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছেন। দুর্গাচরণ বাবু তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিয়া পত্নীর তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া তদ্দণ্ডেই ডাক্তারের অন্বেষণে বাহির হইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তিনি ডাক্তার লইয়া গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চিকিৎসার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, রোগিণী অন্তিম শয্যায় শায়িত। বিয়োগবিধুর পতির চিত্তে দৃঢ় ধারণা জন্মিল, সময় থাকিতে চিকিৎসা আরম্ভ করিতে পারিলে সহধর্ম্মিণীর কখনই প্রাণবিয়োগ ঘটিত না।

এই হইতে তিনি স্বয়ং চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার নিমিত্ত

সঙ্কল্পারূঢ় হইলেন, এবং পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাক্তারি শিখিতে আরম্ভ করিলেন।

হেয়ার স্কুলে অধ্যাপনাকালে তিনি সাহেবের অনুমতিক্রমে প্রত্যহ মেডিকাল কলেজে গিয়া দুই ঘণ্টা কাল পাশ্চাত্য ভৈষজ্যবিদ্যা ও শারীরবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিতেন। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে জোন্‌স্ সাহেব যখন হেয়ার স্কুলের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন, তখন তিনি দুর্গাচরণ বাবুর উক্তরূপ দৈনিক দুই ঘণ্টা ছুটি বন্ধ করিয়া দিলেন। তেজস্বী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুর্গাচরণও তৎক্ষণাৎ শিক্ষকতা কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক রীতিমত ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা করিতে নিরত হইলেন।

তিনি পাঁচবৎসর কাল মেডিকাল কলেজে মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর একদিন নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কলিকাতা-বহুবাজার-নিবাসী একটি ভদ্রলোক কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হন। তদানীন্তন অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার আসিয়া রোগীর চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কাহারও চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। রোগীর আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহার প্রাণরক্ষা-বিষয়ে একরূপ হতাশ হইয়াই অবশেষে দুর্গাচরণ বাবুকে ডাকাইলেন। প্রদীপ্ত প্রতিভাশালী দুর্গাচরণ আসিয়া রোগীর লক্ষণালক্ষণ সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

সে সময়ে বিলাত হইতে জ্যাক্‌সন্ নামক একজন বিখ্যাত চিকিৎসক অল্পদিন হইল এ দেশে আসিয়াছেন। দুর্গাচরণের ব্যবস্থাপত্র জ্যাক্‌সন্‌কে দেখান হইলে জ্যাক্‌সন্ অনুমোদন করিলেন। উক্ত ব্যবস্থানুসারে ঔষধ সেবন করাইলে অল্পকাল মধ্যেই রোগ প্রশমিত হইল দেখিয়া সেই সুবিখ্যাত সাহেব-ডাক্তার দুর্গাচরণ বাবুকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার করমর্দ্দনপূর্ব্বক সাহ্লাদে কহিলেন,—"বাবু, আপনি নেটিভ্ জ্যাক্‌সন্"।

এই হইতেই কলিকাতা সহরে চিকিৎসাদক্ষতায় দুর্গাচরণ বাবুর বড়ই প্রতিপত্তি লাভ হইল। অতঃপর তিনি স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট মান্যগণ্য বন্ধুগণের অনুরোধে মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের খাজাঞ্চীর পদে নিয়োগ স্বীকার করিলেন; তবে, সকালে বিকালে এবং অবসর দিনে চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইল। তৎপরে যখন, তাঁহার বয়স ৩৪ বৎসর, সেই সময়ে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে চিকিৎসাব্যবসায়েই মনোনিবেশ করিলেন।

চিকিৎসাকার্য্যে দুর্গাচরণ বাবুর এতই প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছিল যে, লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি মনে করিত। কি ধনী, কি দরিদ্র, যে কোন ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া যখনই তাঁহার শরণাপন্ন হইত, তিনি বিনা আপত্তিতে তখনই তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া যথাশক্তি তাহার বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করিতেন। ডাক্তারি চিকিৎসায় তিনি যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এ দেশে অদ্যাবধি আর কেহ সেরূপ দিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

কথিত আছে, একদা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটি বিশিষ্ট ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত মুশলমান ভদ্রলোক পীড়াগ্রস্ত হইয়া অনেক ডাক্তার কবিরাজ ডাকাইয়া ঔষধ সেবন করিলেন। কিছুতেই কোন ফললাভ হইল না। রোগের প্রধান লক্ষণ এই যে, রোগী অবিরাম হাঁচিতেছেন ও কাসিতেছেন, এমন কি এইরূপ হাঁচি ও কাসির জন্ম তাঁহাব আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে, এবং উদরে ও মস্তকে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের চেষ্টা বিফল হইলে অবশেষে দুর্গাচরণ বাবুকে ডাকান হইল। দুর্গাচরণ বাবু স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে নিমেষ মধ্যেই রোগের নিদান নির্দ্ধারণ করিলেন, এবং রোগীকে ঔষধ দ্বারা নিমেষ মাত্র কাল সংজ্ঞাশূন্য করিয়া একটি সরু সোন্নার দ্বারা তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে এক গাছি সুদীর্ঘ রোম উৎপাটন করিয়া আনিলেন। সংজ্ঞালাভমাত্র রোগীর আর হাঁচি বা কাসি কিছুই নাই! রোগী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয় আমি ত এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি! আমার কি রোগ হইয়াছিল, কি ঔষধ দিয়াই বা আপনি এত শীঘ্র আরাম করিলেন?

সুরসিক চিকিৎসক তখন রোগীকে সেই রোমটি দেখাইয়া কহিলেন,—"মহাশয় আপনার এই রোগ হইয়াছিল"; এবং সোন্নাটি দেখাইয়া কহিলেন,—"এই ঔষধ দিয়া আরাম করিলাম।" পরে বুঝাইয়া বলিলেন,—"মহাশয় আপনার কোন রোগই হয় নাই; মাত্র নাকের ভিতরে এই রোমগাছটী উর্দ্ধদিকে উল্টাইয়া গিয়া ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে লম্বা হইয়া গলার ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, উহাতেই আপনার এত কাসি ও এত হাঁচি! হাঁচিতে হাঁচিতে ও কাসিতে কাসিতে ক্রমে উদরে ও মস্তকে বেদনা হইয়াছে। আমি আপনাকে অজ্ঞান করিয়া এই সোন্না নাকের ভিতর চালাইয়া দিয়া এই দেখুন আপনার সকল রোগের মূল উৎপাটন করিয়া আনিয়াছি।

মহানুভব মুশলমান মহোদয় বাঙ্গালী ডাক্তারের এই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় ও স্বয়ং অসহ্য যন্ত্রণাদায়ে অব্যাহতি পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং

—কথিত আছে,—দুর্গাচরণ বাবুর অসামান্য সূক্ষ্মদর্শিতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন।

এইরূপে ডাক্তার দুর্গাচরণ মাত্র ১০ দশবৎসর কালব্যাপী চিকিৎসাব্যবসায়ের ফলে প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ দুর্গাচরণের অসাধারণ প্রতিভা বঙ্গদেশে ডাক্তারি চিকিৎসার এতাদৃশ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভের অন্যতম হেতু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইনি শেষবয়সে স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু চিকিৎসাব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পিতৃনামরক্ষক স্বনামধন্য বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহারই মধ্যম পুত্র। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বারিষ্টারিকার্য্যে নিযুক্ত। জিতেন্দ্র নাথ বিশিষ্ট বলশালী বলিয়া সুবিখ্যাত; এবং বিলাতে অধ্যয়নকালে ইনি—(The Iron Boy of India) ভারতের লৌহকায় বালক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মহাত্মা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করেন। সে সময়ে সুরেন্দ্র নাথ বিলাতে সিবিল সর্ব্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহার বয়োধিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া নির্ব্বাচনে অসম্মত। বড় হর্ষে বড় বিষাদ!—শীঘ্রই সংবাদ আসিল, পুত্রের নির্ব্বাচন মঞ্জুর! কিন্তু পিতা তাহার একঘণ্টা পূর্ব্বেই পরলোক প্রাপ্ত!

সুরেন্দ্রনাথ যখন নিতান্ত বালক, তখন দুর্গাচরণ বাবু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কখন কখন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট আসিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বিলাতে পাঠাইবার বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। সেই হইতেই বন্দোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহিত লাহিড়ী মহাশয়গণের সদ্‌ভাব ও স্নেহানুবৃত্তি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; এতদ্‌ভিন্ন অনেক সময়ে তাঁহার প্রতি অনেক আনুকূল্যপ্রদর্শনও করিয়াছেন।

শরৎকুমার যখন মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের লাইব্রেরিয়ানের পদে কার্য্য করিতেন, সে সময়ে তিনি অনেক পুস্তক পাঠ করিবার অবসর পাইতেন। তিনি বিশিষ্ট বিদ্যাবান্ বলিয়া পরিগণিত না হইলেও যথেষ্ট বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণনগরে এ, ভি, স্কুলে অধ্যয়ন কালেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বিশুদ্ধ কাব্যরস তাঁহার বড়ই আদরের সামগ্রী ছিল।

সে সময়ে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং হেমচন্দ্রের 'বৃত্রাসুরবধ' নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে বটে, কিন্তু মাইকেল মধুসূদন বিরচিত 'মধুচক্রের' 'সুধা'-ধারা-পানে 'গৌড়জন' যেন তখনও বিভোর হইয়া রহিয়াছেন! 'সুধাতে পালিত' 'স্বভাবের শিশু', বঙ্গের 'কবিত্বখনির' প্রধান 'মণি' স্বরূপ সেই মাইকেল-সূর্য্য তখন কিন্তু কাল-জলধিতলে চিরঅস্তমিত! তৎপরিবর্ত্তে বঙ্কিম-চন্দ্র বঙ্গদর্শন, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রভৃতি সুধাস্রাবি কিরণজালে বঙ্গদেশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। আবার, বঙ্গমাতার এক অপূর্ব্ব প্রতিভান্বিত সুসন্তান সেই সময়ে সুমধুর পাশ্চাত্য ভাষায় 'বঙ্গীয় কৃষক-জীবন' (The Peasant life of Bengal) নামক এক মনোহর নবন্যাস প্রণয়ন পূর্ব্বক ভারতবাসী এবং এমন কি সুদূর য়ুরোপবাসী অসংখ্য শিক্ষিত ব্যক্তির চিত্ত চমৎকৃত করিয়াছেন!

তখনকার কথা এখন স্মরণ করিলে বোধ হয়, সেই সময়ের বঙ্গদেশে যেন এই সময়ের এই নবযুগ গঠনের একটি বিচিত্র কারখানা খোলা হইয়াছিল, এবং উপরিউক্ত মনীষিগণই যেন ঐ কারখানার সুদক্ষ শিল্পিদল। ইঁহারা নিজ নিজ হৃদয়-ছাঁচে ঢালিয়া যেন তৎকালের লোকচিত্ত গঠিত ও অপূর্ব্ব প্রতিভাভাসে সমুদ্‌ভাসিত করিতেছিলেন! এই অদৃশ্য কারখানর অদৃশ্য ক্রিয়ার গতি বোধ করাই তৎকালে দুঃসাধ্য, রোধ করা ত একেবারেই অসাধ্য! এখানে তখন বর্ত্তমান বঙ্গের প্রাণ গঠিত হইতেছিল, অস্থি মজ্জা মেদ গঠিত হইতেছিল, ধ্যান ধারণা ধাতু সকলই গঠিত হইতেছিল! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এ কারখানা মানুষের নহে, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাই ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিপোষ্টা।

স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় ঐ সকল প্রতিভান্বিত ব্যক্তিগণের প্রণীত গ্রন্থগুলি অতীব মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতেন, এবং তখন দেখিয়াছি, ঐ সকল গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলনের শক্তি তাঁহার বিশিষ্টরূপই জন্মিয়াছিল। আমরা সে সময়ে তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া দেখিয়াছি,—অজ্ঞাতসারে লোক-সমাজের চিত্তাকর্ষণ, চিত্তশোধন, চিত্তের স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য ও ওজস্বিতা-সাধন এবং চিন্তা ও চরিত্র পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি বিষয়ে শরৎবাবু উক্ত মনীষিসম্প্রদায়ের মধ্যে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনকেই শ্রেষ্ঠত্বপ্রদান করিতেন। স্বর্গীয় ডি, এল, রায় মহাশয়ও শরৎকুমারের মত সমর্থন করিয়া কহিতেন,—'ভূতলে অতুলনিধি শ্রীমধুসূদন'।

মানবমণ্ডলীর অতিশ্রদ্ধেয় ও অতিহেয় ('The noblest and meanest of mankind') অদ্‌ভুত ঐশীশক্তিসম্পন্ন এই মহাপুরুষ মাইকেল মধুসূদনের পৌরুষ-পরিচয় অতঃপর যথাসম্ভব প্রদত্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যশোর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষী নদীর তীরবর্ত্তী সাগরদণ্ডী (সাগর দাঁড়ী) গ্রামে মধুসূদনের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম ৺রাজনারায়ণ দত্ত, মাতার নাম ৺জাহ্নবী দাসী, জন্মের দিন ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের শুভ ২৫শে জানুয়ারী। মধুসূদনের জন্মদিন যে বঙ্গমাতার অদৃষ্টলিপিমধ্যে এক অপূর্ব্ব শুভদিন তাহা সহস্রবার স্বীকার্য্য।

শিশু মধুসূদন স্বগ্রামেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শুভক্ষণে বিদ্যারম্ভ করেন। বঙ্গমাতার ও বঙ্গবাসীর সৌভাগ্যফলে তাঁহার এই শুভারম্ভ ক্রমশঃ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, পারস্য, গ্রীক্‌লাটিন প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্যবিদ্যার আধিপত্যে পরিণত হইয়াছিল। আমাদের মধুসূদনের পাণ্ডিত্য প্রকৃতই অগাধ! তাঁহার অসাধারণ কবিত্বখ্যাতির অন্তরালে পড়িয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রসিদ্ধি যেন অদৃশ্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে তাঁহার ভাষারচনার চাতুর্য্যই বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রের নিকট তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের সুস্পষ্ট পরিচায়ক। ভাষাবিদ্যাবিচারে আমরা স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Rev. K. M. Banerji) মহাশয়ের অথবা স্বর্গীয় ডাক্তার (রাজা) রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ের পার্শ্বে মধুসূদনের আসন প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার ওজস্বিনী প্রতিভাপ্রভাবে সে আসন আরও উচ্চে উঠিয়াছে। ভাষার সহিত উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিত্রজ মহাশয়দ্বয়ের মাত্র আধিপত্য সম্বন্ধ, কিন্তু মধুসূদনের আবার তদুপরি জনকত্ব সম্বন্ধও যথেষ্ট। প্রাগুক্ত মহাশয়দ্বয় অভিজ্ঞ ও আবিষ্কারক, শেষোক্ত শক্তিমান্‌পুরুষ যেমনই অভিজ্ঞ তেমনই অদ্‌ভুত উদ্‌ভাবক। উঁহারা মাত্র শাস্ত্রবিৎ, ইনি স্বয়ং শাস্ত্রকৃৎ!

মধুসূদনের দুইটি বিমাতা ছিলেন। রত্নগর্ভা জাহ্নবীর গর্ভে মধুসূদনের আর দুইটি সহোদরের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহারা অকালে কালগ্রস্ত হওয়ায় মধুসূদনই মায়ের অঞ্চলের নিধি—অন্ধের নয়ন! জাহ্নবী দাসী কাটিপাড়ার জমিদার গৌরিচরণ ঘোষের কন্যা।

মাইকেলের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয় কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রধান উকিল, উপার্জ্জন যথেষ্টই ছিল; তদুপরি স্বীয়

নিবাসস্থান সাগরদাঁড়ী অঞ্চলে ইঁহার ভূসম্পত্তি সম্মানপ্রতিপত্তিও স্বল্প নহে। সুতরাং বলিতে গেলে মাইকেল বাল্যকালে বড়লোকের আদরের ছেলে ছিলেন। এ জন্য অনেকে মাতাপিতার প্রশ্রয়ই তাঁহার স্বভাবের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান হেতু বলিয়া সহসা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তর্গত অলৌকিক প্রতিভার প্রবল বৈদ্যুতশক্তিই তাঁহার তথাকথিত উচ্ছৃঙ্খলতার আদি নিদান কি না, এ বিষয় সম্যগ্‌বিচার্য্য।

সে যাহা হউক, মধুসূদনের বয়ঃক্রম যখন বার তের বৎসর, সেই সময়ে পিতা রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্মস্থান কলিকাতায়—খিদিরপুরের বাটীতে লইয়া আসিলেন, এবং অধ্যয়নের নিমিত্ত হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। মধুসূদন মাত্র পাঁচবৎসব হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন পূর্ব্বক অসীম ধীশক্তিপ্রভাবে ঐ স্বল্পকালমধ্যেই তৎকালীন সিনিয়র শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

তিনি কলেজের প্রত্যেক শ্রেণীতেই বিশিষ্ট মেধাবী ও সুদক্ষ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সর্ব্ববিষয়ে বিশিষ্টতাই মধুসূদনের জীবনব্যাপী বিশিষ্ট লক্ষণ। ছাত্রজীবনে তিনি সাহিত্যাদি শাস্ত্রে বিশিষ্ট নিবিষ্ট, পুনশ্চ গণিতাদিতে বিশিষ্ট অনাবিষ্ট! বিলাসিতায় তিনি বিশিষ্ট আসক্ত, অথচ বিলাসোপকরণ-দ্রব্যাদি বা অর্থাদিতে তিনি বিশিষ্ট অনাসক্ত! অপ্রিয়াচরণ তাঁহাব বিশিষ্ট প্রিয়ব্রত, অথচ কি শিক্ষক কি সতীর্থ, তিনি সকলেরই বিশিষ্ট প্রিয়পাত্র! সর্ব্ববিষয়ে স্বতন্ত্রতা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতা। অথচ তিনি সকলেরই নিকট বিশিষ্ট বিনীত ও সকলেরই বিশিষ্ট অনুগত!

ইহাই তাঁহার প্রকৃতি; আকৃতিও তদনুরূপ! মধুসূদন বিশিষ্ট কৃষ্ণকায় কিম্ভূত-শ্রী, অথচ সে শ্রীতে বিশিষ্ট মনোহারিত্ব নিত্যবর্ত্তমান! তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত পদ্মপলাস-লোচনদ্বয় যেন জাজ্বল্যমান প্রতিভার প্রতিমূর্ত্তি, এবং তরঙ্গায়িত কৃষ্ণোজ্জ্বল কেশকলাপে যেন প্রখর মস্তিষ্কপ্রভা সতত প্রস্ফুরিত! ফলতঃ, শিক্ষক ও সতীর্থমণ্ডলে সকলেই বেশ বুঝিয়াছিলেন,—এই বালক-মধুসূদন আমাদিগের মধ্যে একটি বিশিষ্ট জীব!

মধুসূদনের বাল্যপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহার অন্তরাত্মা যেন তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিল,—'তুমি চেষ্টা করিলে সকলই করিতে পার।' সেই দৈবান্তর্বাণীই তাহাব সর্ব্বসাধনের মূলমন্ত্র। তিনি সে মন্ত্রে দীক্ষিত, দৃঢ়বিশ্বাসাপন্ন; তন্মদে সতত উন্মত্ত

উদ্‌ভ্রান্ত!—কি ধরিবেন কি করিবেন, কিছুই যেন স্থির করিতে পারিতেন না।

তিনি অঙ্কশাস্ত্রাভ্যাসে অতীব অবহেলা প্রদর্শন করিতেন, এ কথা শিক্ষক ও সতীর্থগণ সকলেই জানিতেন। সকলেরই বিশ্বাস, মধুসূদন গণিতক্রিয়ায় আদৌ অপারক। কিন্তু পারকতাভিমানী মধুসূদনের এ কলঙ্কে দৃক্‌পাত ছিল না। ইতিহাস ও সাহিত্যই তাঁহার সাধের সামগ্রী—হৃদয়-কৌস্তুভ, তিনি তাহাতেই নিয়ত নিমগ্ন।

একদা স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সতীর্থগণের সহিত মধুসূদনের বাদানুবাদ উপস্থিত! তর্কের বিষয় এই যে, সেক্স্‌পিয়র শ্রেষ্ঠ, না নিউটন্ শ্রেষ্ঠ। সকলেই সুযুক্তিপ্রদর্শনে সর্ আইজ্যাক্ নিউটনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন, মাত্র মধুসূদন বলিতেছেন,—সেক্‌স্‌পিয়রই শ্রেষ্ঠ। হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, নিউটনের অপেক্ষা সেক্‌স্‌পিয়রের প্রতিভাই প্রশস্ততর, কারণ, সেক্‌স্‌পিয়র চেষ্টা করিলে দ্বিতীয় নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটন্ চেষ্টা করিলে কখনই দ্বিতীয় সেক্‌স্‌পিয়র হইতে পারিতেন না।

হেতুবাদ শুনিয়া প্রতিপক্ষীয়গণ প্রতিবাদ করিলেন,—হাঁ, স্বীকার করিলাম বটে, নিউটন্ শতচেষ্টাতেও সেক্‌স্‌পিয়র হইতে পারিতেন না, কিন্তু মধু, তুমি কি করিয়া জানিলে যে, সেক্‌স্‌পিয়র চেষ্টা করিলে নিউটনের ন্যায় হইতে পারিতেন?

মধুসূদন দম্ভের সহিত উত্তর করিলেন,—হাঁ, তাহা নিঃসন্দেহই পারিতেন; আমি বলিতেছি, বিশ্বাস কর, তিনি তাহা অবশ্যই পারিতেন।

সতীর্থগণ হাসিয়া কহিলেন,—তুমি বলিতেছ, অতএব অবশ্যই পারিতেন, ইহাই কি তোমার অকাট্য হেতুবাদ, না ইহা ভিন্ন আর কিছু আছে?

মধুসূদন বলিলেন,—জানিয়া রাখ, তিনি তাহা নিশ্চিতই পারিতেন। ইহার অকাট্য প্রমাণ পরে দেখাইব।

ক্রমে যতই দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, ততই এই বাদানুবাদের বিষয় সকলেরই স্মৃতিবহির্ভূত হইতে লাগিল। এমন সময়ে একদিন কলেজের গণিতাধ্যাপক মহাশয় ছাত্রগণকে গৃহ হইতে কসিয়া আনিবার নিমিত্ত কতকগুলি দুরূহ অঙ্কের প্রশ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

পরদিন তিনি ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান কে কিরূপ করিয়াছেন, তাহা দেখিতে চাহিলে, অনেকেই কহিলেন,—মহাশয়, অঙ্কগুলি বিষম কঠিন, বহুচেষ্টাতেও উহার একটিও কসিতে পারিলাম না।

শিক্ষক মহাশয় দেখিলেন,—কেবল ভূদেব প্রভৃতি দুইতিনটি বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ বালক উহার দুইএকটি মাত্র কসিয়া আনিয়াছেন। তিনি তখন অঙ্কগুলি স্বয়ং কসিয়া দিতে দণ্ডায়মান হইয়া, একেবারে অপ্রতিভ!—উহার অধিকাংশ এতই কঠিন যে তিনিও সহসা কসিতে অসমর্থ!

গণিতশিক্ষার সময়ে মধুসূদন প্রায়ই সকলের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী আসনে বসিয়া মনোমত সাহিত্য বা ইতিবৃত্ত পাঠ করিতেন; তখন যেন তিনি শ্রেণীমধ্যে নিতান্তই নগণ্য। উপেক্ষা হেতু কেহই তাঁহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন না, তিনিও কাহাকেই কোন কথা কহিতেন না।

শিক্ষক মহাশয় সহসা মধুসূদনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন,—মধু বোধ করি সবগুলি অঙ্কই ঠিক কসিয়া আনিয়াছে!

এই কথা শুনিবা মাত্র মধুসূদন সেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একখানি খাতা শিক্ষক মহাশয়ের সম্মুখবর্ত্তী টেবিলের উপরে ছুড়িয়া দিলেন। খাতা খুলিয়া অধ্যাপক মহাশয় অবাক্! উহাতে সমস্ত অঙ্কগুলিই ক্রমান্বয়ে যথারীতি কসা রহিয়াছে!

তিনি প্রথমতঃ ভাবিলেন, মধুসূদন এ অঙ্কগুলি অন্য কাহারও দ্বারা কসাইয়া আনিয়াছেন, আবার পরক্ষণেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ সকল দুরূহ অঙ্ক এরূপ সুনিয়মে কসিতে পারেন, এমন লোকই বা মধু সহসা কোথায় পাইলেন?

শিক্ষক মহাশয় একটু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মধু, তুমি এ অঙ্কগুলি কাহার দ্বারা কসাইয়া আনিলে, বল দেখি।

মধুসূদন বিনম্রভাবে উত্তর করিলেন,—আমি নিজেই কসিয়া আনিয়াছি।

শিক্ষক মহাশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মধুসূদনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি সবিশেষ জানিতেন, তেজস্বী মধুসূদন মিথ্যা কথার ধার ধারেন না; তথাপি সন্দেহভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, এই অঙ্কগুলি তুমি এই খাতা না দেখিয়া ঐ বোর্ডে কসিয়া দিতে পার?

মধু।—হাঁ, কেন পারিব না? বলুন কোন্‌টি কসিব?

শিক্ষক মহাশয় বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অঙ্কটি কসিতে কহিলেন। মধুসূদন অম্লানবদনে সম্মুখস্থিত বোর্ডের নিকট গিয়া অঙ্কটি কসিয়া সতীর্থগণকে বুঝাইয়া দিলেন। সকলেই স্তম্ভিত!

শিক্ষক মহাশয় সর্ব্বসমক্ষেই কহিলেন,—মধু, এ অঙ্ক বোধকরি আমিও

কসিতে পারিতাম না, কিন্তু তুমি ত অনায়াসেই কসিয়া দিলে! গণিতশাস্ত্রে এরূপ প্রতিভাসত্বেও তোমার উহাতে এত ঔদাস্য কেন?

মধু।—আজ্ঞে, আমার ও সব বৃথা পরিশ্রম ভাল লাগে না। তবে এইমাত্র বুঝিয়া রাখিয়াছি যে, অঙ্ক কসিতে কোন মন্ত্র তন্ত্র লাগে না, চেষ্টা করিলেই অনায়াসে পারা যায়; সুতরাং প্রয়োজন সময়ে আটকাইবে না।

শিক্ষক।—এ পরিশ্রম যদি বৃথাই হয়, আর ইহা যদি তোমার একান্তই ভাল না লাগে, তবে আজ কেন এতগুলি অঙ্ক কসিয়া আনিলে?

মধু।—আজ্ঞে, তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ আছে।

শিক্ষক।—বলিতে যদি কোন বাধা না থাকে, তবে তাহা শুনিতে পারি কি?

মধু।—আজ্ঞে, ভূদেব প্রভৃতি সতীর্থগণের সহিত বাদানুবাদক্রমে আমি একদিন কহিয়াছিলাম যে, সেক্‌স্‌পিয়র মনে করিলে নিউটন্ হইতে পারিতেন। উঁহারা আমার এই কথা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন; আমি ইহার প্রমাণ দেখাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম; এবং সেই প্রমাণ প্রদর্শনচ্ছলেই আমি আজ এ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি। নচেৎ, এই অঙ্কগুলি কসিতে আমার যে সময় লাগিয়াছে, সে সময়টুকু সাহিত্য বা ইতিহাস পাঠে নিয়োজিত করিলে আমার অনেক উপকার ও আনন্দলাভ হইত।

উত্তর শুনিয়া সকলেই নিরুত্তর। ক্ষণেকের তরে সকলেরই বদন যেন নিঃশব্দে নিবেদন করিল, 'মধুসূদন কি মানুষ, না প্রত্যক্ষ দৈবশক্তি!'

এই সময়ে এ দেশে কতকগুলি প্রতিভাশালী সদাশয় ভদ্র ইংরাজ বাঙ্গালী-ছাত্রগণের শিক্ষাবিধান কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বঙ্গবাসি-গণের পরমহিতৈষী। কিন্তু ভারতের তথা ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদের অনেকে এক বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, এবং সেই প্রাচীন ভ্রমফলে আজ নবীন ভারতের অনেক দুর্দ্দশাভোগ হইতেছে, এবং রাজাপ্রজাসম্বন্ধ হেতু ইংলণ্ডও যে সে কুফলের অংশভাগী হইতেছেন না, তাহা নহে।

এ যুগে যেমন অনেক ইংরাজ মহাত্মা এ দেশের জলবায়ুর প্রকৃতি, আচার-বিচারপদ্ধতি, পুরাণদর্শন শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি বিষয়ে কিয়দংশে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভারতের প্রাচীন রীতিনীতি ও বিদ্যার সারবত্তা বুঝিয়া তদ্বিষয়ে স্ব স্ব কুসংস্কার পরিহার করিয়াছেন, এবং মুক্তকণ্ঠে ভারতের বিদ্যা, ভারতের তপস্যা, ভারতের রাজধর্ম্ম, ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্য, ভারতের গৃহধর্ম্ম, ভারতের আর্য্যাচার, ভারতের রাজভক্তি, গুরুভক্তি, প্রভুভক্তি প্রভৃতি বিষয়ের

প্রশংসা করিয়া থাকেন; যে যুগের কথা কহিতেছি, সে যুগের সাহেবগণের মধ্যে অনেকের সে সকল বিষয়ে সেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না, সুতরাং তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ের সাধুত্বও স্বীকার করিতেন না। বুদ্ধি-বিক্রমবলে ইংলণ্ড বিজয়ী, বর্ব্বরতা-ভীরুতা ফলে ভারত পরাজিত, অতএব ইংলণ্ডের যাহা কিছু তাহাই ভাল, ভারতের যাহা কিছু সকলই মন্দ, ভাল কেবল ভারতের ধনরত্ন ও রাজত্ব,—এই কুসংস্কারই যেন অনেকের তদানীন্তন সুসংস্কার,—এবং এই তথাকল্পিত সুসংস্কার লইয়াই তাঁহারা সংস্কারব্রতে ব্রতী হইয়া আমাদের ভাগ্যে ভারতে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা যে সদাশয় ভারত-হিতৈষী করুণহৃদয় মহাপুরুষ, একথা শতবার স্বীকার্য্য।

ইংলণ্ডরাজ আল্‌ফ্রেড্‌ বনবাসকালে বনবাসিনী বর্ব্বরপত্নীর আদেশে পিষ্টকপাকে নিয়োজিত এবং আদেশপ্রতিপালনে অবহেলাহেতু তৎকর্ত্তৃক বিষম তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, তথাপি মহানুভব মহারাজ তাঁহার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন; কেন?—বনবাসিনীর অমায়িক আতিথেয়তা ও অকৃত্রিম আত্মীয়তাগুণে।

উপরিউক্ত ইংরাজ মহাত্মগণ ভারতের প্রাচীন রীতিনীতিনিচয় নিতান্ত বার্ব্বরিক বোধ করিয়াই ঐ সকলের সংস্কার কার্য্যে প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিদ্যাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য বেশবিন্যাস ও পানভোজনপদ্ধতি, এমন কি পাশ্চাত্য ধর্ম্মের প্রসার স্থাপনে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সনাতন আর্য্যাচারনিচয়ের মূলচ্ছেদ করিয়া ভারতের তথা ভূমণ্ডলের চিরন্তন কীর্ত্তিমন্দিরের ভিত্তিভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহাদের যত চিত্তচাপল্য, বুদ্ধিবৈকল্য বা অবিবেকত্ব প্রকাশ পাউক না কেন, ভারতের ইংলণ্ডের বা সমগ্র ভূমণ্ডলের ইহাতে ক্ষতি বা বৃদ্ধি যাহাই হউক না কেন, এই সকল মহাপুরুষের নিকট যে ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, এ কথা শতবার স্বীকার্য্য; কেন, কি গুণে?—ইঁহাদের অমায়িক আত্মীয়তাগুণে, অকৃত্রিম পরোপচিকীর্ষাগুণে, আত্মৌপম্যে প্রাণপণে পরশুভানুধ্যানগুণে। বিশেষতঃ, ইঁহাদের সংস্কারচেষ্টায় যে শুভফলও অনেক ফলিয়াছে, এ কথাও কদাপি অস্বীকার্য্য নহে।

কেহ কেহ হয় ত ভাবিতে পারেন যে, এই আত্মীয়তাপ্রদর্শন, এই পরোপকারপ্রবৃত্তি মাত্র তাঁহাদের স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় স্বার্থসাধনার্থ কল্পিত কৌশলমাত্র। কিন্তু যাঁহারা ঐ সকল মহাত্মার মনোহর চরিত্র সবিশেষ

পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, উক্তরূপ দোষারোপ করিলে, না জানিয়া না শুনিয়া নিরপরাধে নির্দ্দয়ভাবে ঐ সকল নিরীহ নির্ব্বিকার চরিত্রের মাত্র হত্যা করাই হয়। তাঁহারা নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে নিজের নিজের পক্ষে যাহা পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, যাহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সরলপ্রাণে সরলবিশ্বাসে তাহাদিগকেও তদনুসারী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতএব ইঁহারা অবশ্যই পরম সাধুপুরুষ, ইঁহাদের উদ্দেশ্য ও চেষ্টাও সাধু; তৎফলে যদি কিছু কুফল ফলিয়া থাকে, সে কেবল অভাগা ভারতবাসীর ভাগ্যফল ব্যতীত আর কি বলিব? "বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্‌ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।"—(রঘুবংশম্)

শ্রীমান্ মধুসূদন—সুধু মধুসূদন কেন, তদানীন্তন অনেক শ্রীমানই,—বাল্যবয়সেই সুরাপান অভ্যাস করিয়াছিলেন। সুরাপান সুসংস্কারসম্মত এবং সৎসাহসের কর্ম্ম ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এবং ঐ বিশ্বাস তাঁহাদের তৎকালীন পাশ্চাত্যগুরুদীক্ষার পরোক্ষ ফল। পিতৃপিতামহগণ-পূজিত সনাতন শ্রুতিস্মৃতিনির্দ্দিষ্ট আর্য্যজুষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ নবজাত জ্ঞানানুযায়ী পথে পদার্পণ করিয়া কাপুরুষতাবর্জ্জন ও প্রকৃত পৌরুষপ্রদর্শন করিতে তাঁহাদের যেন বড়ই আনন্দবোধ হইত। তথাবিধ পৌরুষ প্রদর্শন করিতে গিয়া পিতামাতার, অন্যান্য গুরুজনের বা স্বজনসমাজের মর্য্যাদালঙ্ঘন করাকেও তাঁহারা কর্ত্তব্যনিষ্ঠতারই অঙ্গীভূত বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন; এবং এইরূপে নিজ নিজ মনে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ সাজিয়া হিরণ্যকশিপু জ্ঞানে অভিভাবকগণের আদেশোপদেশ অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিলেন! তাঁহাদের শিক্ষাগুরুগণও যেন এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষে কথঞ্চিৎ প্রশ্রয়প্রদানই করিতেন। অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সেই সকল শিক্ষাগুরুগণের সেইরূপ আচরণ কখনই অসৎসঙ্কল্পমূলক কৃত্রিমাচার নহে। কারণ তাঁহাদের স্ব স্ব শিক্ষা ও সংস্কারও তদ্রূপ।

এইরূপ শিক্ষার ফল সেই যুগেই এরূপ মাত্রায় ফলিয়াছিল যে, কোন কোন বিশিষ্ট গুণবান্ ছাত্রও রাজপথে চলিবার সময়ে প্রকাশ্যভাবে নিষিদ্ধখাদ্যাদি ভোজন করিতে করিতে অন্যান্য পথিকগণকে সম্বোধন করিয়া স্ব স্ব এবংবিধ পৌরুষাচারের পরিচয় প্রদান করিতেন, কেহ বা কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া উহার আবর্জ্জিত অংশ পথিকগণের গাত্রোপরি নিক্ষেপ করিতেন, কোন শ্রীমান্ অট্টালিকার শীর্ষচত্বরে উঠিয়া মুসলমান কর্ত্তৃক তণ্ডুল-মণ্ড যোগে নির্ম্মিত (তামাক

খাইবার) টিকা মুখে করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক নিম্নস্থ পথিকগণকে কহিতেন,—এই দেখ, আমি মুসলমানের ভাত খাইতেছি!

তৎকালে হিন্দুকলেজের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী গোলদীঘির দক্ষিণ ধারে একটি মদের দোকান ছিল ; ছাত্রগণ কলেজে পড়িতে পড়িতে অবসর মতে সেইখানে আসিয়া সুরাপান করিয়া যাইতেন। শিক্ষক মহাশয়গণ এ সকল বিষয় যেন দেখিয়াও দেখিতেন না, শুনিয়াও শুনিতেন না। এখন এ সকল কথা শুনিলে বোধ হয় যেন ঐ সকল ছাত্র কতই অপকৃষ্ট অপদার্থ ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গরত্নখনির সমুজ্জ্বল মরকত-কহিনুর ! কালধর্ম্মেই তাঁহাদের ঐরূপ মতিগতি দাঁড়াইয়াছিল ; এবং স্বীকার করিতে বোধ হয় আপত্তি হইবে না যে, সেকালের সেই সকল শিক্ষাফল-পরিপাকে তদ্‌বীজ হইতে এ কালের অনেক বিষামৃতবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্‌গম হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তৎকালীন শিক্ষকগণের শিক্ষাফলে এ দেশের অনেক সুমঙ্গল সাধিত হইয়াছে; আবার সেইরূপ তদানীং প্রবর্ত্তিত গুরুদ্রোহিতা, শাস্ত্রদ্রোহিতা ও সমাজদ্রোহিতা প্রভৃতির প্রবৃত্তিই ইদানীং রাজদ্রোহিতা ও রাজবিধি-দ্রোহিতার প্রবৃত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে কি না, এ কথাও সবিশেষ বিবেচ্য। যদি তাদৃশ আরম্ভই ঈদৃশ পরিণামের সূত্রপাত বলিয়া বিচারসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে তদ্রূপ শিক্ষা ভারতের, ইংলণ্ডের তথা সমগ্র ভূমণ্ডলের পক্ষে নিতান্তই অপকারক ও অপযশস্কর।

এইরূপ শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে মধুসূদন অনেক বিষয়েই অগ্রগণ্য। তিনি হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন্‌ সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই রিচার্ড্‌সন্‌ সাহেব বড়ই কাব্যরসপ্রিয় এবং স্বয়ং কবি। ইঁহাকেই মহাত্মা মেকলে সাহেব কহিয়াছিলেন,—আমি ভারতে আসিয়া যাহা দেখিলাম যাহা শুনিলাম সকলই ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনার মুখে সেক্‌স্‌পিয়রপ্রণীত গ্রন্থের সুমধুর আবৃত্তি,—ইহা আমি এ জীবনে কখনই ভুলিতে পারিব না।

মধুসূদন সেই বাল্যবয়স হইতেই তাঁহার সুদক্ষ শিক্ষক মহাশয়ের ন্যায় কাব্যপ্রিয় হইয়াছিলেন এবং স্বয়ংও নানাবিধ ইংরাজি কবিতা রচনা করিয়া কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের অভ্যন্তরীণ অসাধারণ প্রতিভা কি কল্পনায়, কি কথায়, কি কবিতারচনায়, কি আমোদপ্রমোদে, কি আচার ব্যবহারে, কি বেশবিন্যাসে, নিত্যই নব নব ভাবের উদ্‌ভাবনা করিত ; চর্ব্বিতচর্ব্বণ তাঁহার কোষ্ঠীপত্রে

কুত্রাপি লিখিত ছিল না। কিন্তু, যাহা ভাবিতেন, যাহা বলিতেন, যাহা লিখিতেন, যাহা করিতেন, যখন যেরূপ সাজ সাজিতেন, 'মধু'র মধুরত্ব প্রত্যেক বিষয়েই যথেষ্ট থাকিত।

ভূদেব বাবু বলিয়াছেন, অকস্মাৎ একদিন দেখি, মধুসূদন ডাঁহা সাহেব সাজিয়া কলেজে আসিয়াছেন! তাহার সেই কুঞ্চিত কেশকলাপ পাশ্চাত্য প্রথানুসারে কর্ত্তিত করিয়া মস্তকের মধ্যস্থান সীমন্তরেখায় সজ্জিত করিয়াছেন, কোট্ পেণ্ট্‌লেন আঁটিয়া গলায় কলার পরিয়া নেক্‌টাই বাঁধিয়াছেন, প্রশস্ত ললাটনিম্নে প্রস্ফুটিত দ্বিদল কমলে কতই শোভা ধারণ করিয়াছে! মধু হাসিতে হাসিতে আসিয়া কহিলেন,—এই দেখ ভূদেব, আমি সাহেববাড়ী হইতে ৮৲ আট টাকা দিয়া চুল কাটাইয়াছি!

ইহারই অল্পদিন পরে শুনা গেল, মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ মানসে মিশনারিগণের নিকট গিয়াছেন। রাজনারায়ণ বাবু পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অশেষ চেষ্টা করিলেন, মধুসূদন কোন মতেই নিবৃত্ত হইলেন না। অবশেষে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম্মানুসারে সংস্কার গ্রহণ করিলেন। এই হইতে তাঁহার নাম হইল মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তখন তিনি রীতিমত খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার অভিপ্রায়ে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিশপস্ কলেজে প্রবেশ করিলেন।

মাতাপিতা মর্ম্মাহত হইলেও স্নেহপরায়ণতা হেতু ধর্ম্মচ্যুত পুত্রকে অর্থাদি-দানে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। মধুসূদন সময়ে সময়ে খিদিরপুরের বাটীতে গিয়া জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু সমাজভয়ে মাতা পুত্রকে প্রকাশ্যভাবে গৃহে রাখিতে সাহসী হইতেন না।

বিশপস্ কলেজে তিনি গ্রীক্ লাটিন্ হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশান্তরযাত্রার বাসনা তাঁহার মনে বাল্যকাল হইতেই প্রবল হইয়াছিল; এ পর্য্যন্ত সে বাসনা পূর্ণ করিবার অবসর আসে নাই। এক্ষণে তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন সহাধ্যায়ী বন্ধুর সহিত মান্দ্রাজযাত্রা করিলেন।

তথায় তিনি কয়েকখানি ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং খ্যাতিপ্রতিপত্তিও যথেষ্ট লাভ করিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ জয়চন্দ্রের দুহিতা—আজমীঢ়াধিপতি পৃথ্বীরাজের মহিষী স্বনামধন্যা সতীসাধ্বী সংযুক্তা দেবীর উপাখ্যান অবলম্বনে

ক্যাপ্‌টিভ্ লেডি (The Captive Lady) নামক একখানি ইংরাজি কবিতা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই সময়ে মধুসূদন মাদ্রাজ কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে ঐ বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়া হেনরিয়েটা নাম্নী অপর এক রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন, এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সস্ত্রীক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া পুলিশ-আদালতে ইন্টারপ্রিটরের কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়েই তিনি রত্নাবলী নাটকের ইংরাজি অনুবাদ প্রচারিত করেন। পরে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি উপর্য্যুপরি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অসীম যশোলাভ করিলেন। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্টত্ব ও অভিনবত্বের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিলেন। বঙ্গবাসী শিক্ষিত সমাজ তাঁহার কাব্যের গুরুগম্ভীর ভাষা ভাব, অদ্ভুত ওজস্বিতা, ও নূতন ছন্দোমাধুর্য্যে একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। কেহ কেহ তাঁহার কবিত্বের সম্যক্ অবধারণা করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ তাঁহার অভিনব ভাষাভঙ্গি ও অভিনব ছন্দের অনেক উপহাস করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বল্পকালমধ্যেই প্রবলতরঙ্গে তৃণবৎ সে সকল ব্যঙ্গরঙ্গ কোথায় ভাসিয়া গেল!

এই হইতে, বাঙ্গলা কাব্যে গুরুগম্ভীর ভাষায় গুরুগম্ভীর ভাবের প্রবর্ত্তনা যে সম্ভবপর, এ কথা বঙ্গবাসীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। ফলতঃ এই হইতেই বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদনের নামে বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল!

মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার জনক জননী আর এ জগতে নাই! পুরাতন বন্ধুগণও কেহ বা পরলোকে কেহ বা ইতস্ততঃ প্রস্থিত! আপন বলিতে এখন তাঁহার একমাত্র প্রণয়িনী সেই মাদ্রাজাগতা ইংরাজদুহিতা! অতএব মাইকেল এখন পুরা সাহেব!

দেশীয় সমাজের সহিত তাঁহার এখন কোন সম্পর্কই থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের মনোহারিত্বহেতু তিনি এখন বাঙ্গালী সমাজের গৌরবের ধন—মাথার মণি! তবে সকলেই পরিতাপ প্রকাশ করিয়া কহিতেন,—আহা, আমাদের এমন মধুসূদন খৃষ্টিয়ান হইলেন কেন? কিন্তু যখনই তাঁহারা 'মেঘনাদবধ' পাঠ করিতেন, তখনই ভাবিতেন,—কে বলে মধু খৃষ্টিয়ান? বাস্তবিকই মধুসূদনে একাধারে যুগপৎ নানাশক্তিসমন্বয় দেখিতে পাওয়া যাইত।

ফলতঃ বঙ্গসমাজ চিন্তনে, কথোপকথনে, লিখনে পঠনে অনেকাংশে মধুসূদনের শাসনাধীন হইয়া পড়িল, এবং মধুসূদনই সে যুগের অদ্বিতীয় যুগাবতার হইয়া উঠিলেন।

মাইকেল একে বাঙ্গালী বড়লোকের ছেলে, স্বভাবতঃই মোটা নজর, তাহাতে আবার সাহেবি বিলাসিতা, গৃহে বিবি-বধূ; পদে পদে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই হেতুই বোধ হয় বারিষ্টার হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে শিশু পুত্রকন্যা ও প্রিয় পত্নীকে এদেশে রাখিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। পরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীও এখানে অর্থাভাবে আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া পুত্রকন্যা লইয়া পতির নিকট চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে এই ক্ষুদ্র দত্ত-পরিবারটি অর্থাভাবে অন্নবস্ত্রাভাবে বিদেশে বিষম ঋণদায়ে পড়িয়া কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, অবশেষে মধুসূদন কিরূপে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত অর্থে কোনরূপে অব্যাহিত পাইয়া বারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সপরিবারে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষিত বঙ্গসমাজে সাধারণতঃ সুবিদিত। ফ্রান্স-বাস কালে মধুসূদন তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার মনোগত ভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশে আসিয়া মাইকেল প্রচুর ধনোপার্জ্জন মানসে অনেক স্থানে ঘুরিলেন। কিন্তু বাসনানুরূপ ফললাভ কোথাও হইল না। অবশেষে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবারে বঙ্গের সেই সুকাল-সমুদ্ভূত অমূল্য রত্ন পুনর্ব্বার কালসাগরে চিরদিনের মত ডুবিয়া গেল!

বঙ্গীয় বাগ্‌দেবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান কি অবস্থায় কোথায় লীলাসংবরণ করিলেন, সে কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন, আর তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া স্বজাতির মুখে পুনঃ পুনঃ চুণকালি লেপন করিতে ইচ্ছা করি না।

মধুসূদন মহাকবি, মহাপুরুষ, বীণাপাণির বীরপুত্র। শরতের সুধাকাশে কল্পনার ঘুড়ী উড়াইয়া অনেকে কবি হইতে পারেন, কিন্তু মুষলবর্ষী বর্ষাগগনের ঘনঘটামধ্যে এমন রঙ্গে বিরঙ্গে সে ঘুড়ী উড়াইতে এদেশে মাইকেল ভিন্ন আর কে পারিয়াছেন? আর আর কবির গ্রন্থই মাত্র কাব্য, মহাকবি মাইকেলের জীবনই এক মনোহর মহাকাব্য!

তাঁহার প্রতিভা-প্রণোদিত বুদ্ধি সংসারের শত সংঘর্ষণেও স্বপথচ্যুত হয়

নাই; তিনি চিরদিনই তাঁহার 'শ্বেতভুজা ভারতী'-মাতার ভক্তিমান্ পুত্র, বিমাতা কমলাদেবীর বিকট ভ্রুকুটীতে তিনি তিলেকের তরেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তিনি ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে সকলই তাঁহার কৃত্রিম চেষ্টা, আন্তরিক নহে। সেরূপ অন্তরে অর্থোপাসনা স্থান পাইতে পারে না। অর্থাভাব-জনিত ক্লেশ তাঁহার অন্তরের অমৃতপ্রস্রবণ শোষণ করিতে পারিত না। সাংসারিকতা যেন তাঁহার অসহ্য অগ্রাহ্য, অন্তর্জ্জগতের আবর্জ্জনা স্বরূপ, উহা তিনি অন্তর হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিলেই স্বস্তিবোধ করিতেন। তিনি সংসারের অজেয়। সংসার তাঁহাকে সাধ্যমত পীড়ন করিতে ত্রুটী করে নাই, কিন্তু কোন মতেই বশীভূত করিতে পারিল না, জীবনে একদিনও তিনি সংসারের দাসত্ব স্বীকার করিলেন না; তাই অবশেষে পামর পাষণ্ড সংসার প্রতিহিংসাবশেই যেন স্বপ্রদত্ত সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া ভিখারীর বেশে তাঁহাকে বিদায় দিল! অপরাজেয় মহাসহিষ্ণু মহাপুরুষ তথাস্তু বলিয়া নিমেষে সংসারের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন! অর্ব্বাচীন বঙ্গ-সংসার সে ধূলি মোচন করিয়া যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল,—দেখিল চারিদিক অন্ধকার! তাহার দিগ্‌দীপক শিরোরত্ন হায় হায় কোথায় হারাইয়া গিয়াছে!

সাধারণেই সুপ্রকাশ,—মাইকেলের চরিত্রে গুণও যথেষ্ট, দোষও বিশিষ্ট। প্রতিভা, তেজস্বিতা, স্বাবলম্বিতা, স্বতন্ত্রতা, সরলতা, সত্যবাদিতা, উদারতা প্রভৃতি ব্যতীত তাঁহার আর একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল—বদান্যতা; মাইকেল অদ্‌ভূত দাতা! তিনি, যে কোন যাচককেই হউক, দান করিতে হইলে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার কম দিতে পারিতেন না। যাহার দুঃখে প্রাণ কাঁদিত, দাতা মাইকেল ঋণ করিয়াও তাহার সাহায্য করিতেন; আর সেরূপ স্থলে যদি ঋণও না পাইতেন, তখন নিতান্ত বালকবুদ্ধি মধুসূদন পলায়নে পরিত্রাণ লাভ করিতেন!

সাধারণ চক্ষে মাইকেলের বিশিষ্ট দোষ ছিল সুরাপান ও ইন্দ্রিয়াসক্তি। মধুসূদন বালকপ্রকৃতি—যেন সকলেরই শাসনার্হ, বিশেষতঃ তিনি লক্ষ্মীদেবীর প্রকৃতই পরিত্যক্ত সপত্নীপুত্র, সম্পন্ন-প্রতিপন্নগণের যথা উপেক্ষিত তথা উপেক্ষক; এই সকল কারণেই বোধ হয় আমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে মুক্ত কণ্ঠে সেই মহাপুরুষের উক্ত মহাদোষ-দ্বয় কীর্ত্তন করিয়া আমাদের মল-লোলুপ চিত্তের কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি সাধন করিতে সাহস পাইতেছি। কিন্তু তিনি যদি একজন প্রতিপত্তি-শালী প্রচুরধনোপার্জ্জক সংসারোপাসক বড়লোক হইতেন, যদি তিনি অন্তিম-

কালে হাঁসপাতালের আতুরতল্পে একাকী না মরিয়া প্রাসাদোপরি স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন-পূর্ব্বক রাজা মহারাজা প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তথাকল্পিত মহাজনোচিত মহাসমারোহের মরণ মরিতে পারিতেন, তবে আজ বোধ করি আমাদের অণুবীক্ষণযুক্ত নেত্রে অবলোকিত তাঁহার সেই ভীষণাকার দোষ-দুইটি যথার্থই অণুপ্রমাণ প্রতীয়মান হইত; এবং উহার কথা আমাদের রসনাগ্রে দূরে থাকুক মানসাগ্রেও উদিত হইত কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ, যে বাঙ্গালী আমরা জীবিত মধুসূদনকে লোকালয়ান্তরালে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ফেলিয়া মারিতে পারিয়াছি, সে বাঙ্গালী আমরা এখন মৃত মধুসূদনের অঙ্গে যে অবাধে শতবার অসিপ্রহার করিতে অগ্রসর হইব, বিস্ময়কর কিসে? সুতরাং দশের সুরে সুর মিশাইয়া গাইব,—মাইকেল ব্যাভিচার-পরায়ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত সুরাপায়ী!

শিখাব এ কথা মোবা পল্লীবালদলে;
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া,—
পরম অধর্ম্মাচারী 'শ্রীমধুসূদন!'

ধিক্! আমাদিগকে শতধিক্! আজিও আমরা মধুসূদনের প্রতিভার ইয়ত্তা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, আজিও আমরা তাঁহার সুরধুনীসম পাবনী পবিত্রঋষিকুলোচিত রচনার উপকারিতা সম্যক্ অবধারণা করিতে পারিলাম না, কিন্তু সর্ব্বাগ্রেই পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাঁহার চরিত্রের—আমাদের সেই মনঃপূত মলভাগ—সুরাপান ইন্দ্রিয়াসক্তি! ধন্য আমাদের সমালোচন-সাধুত্ব!

কিন্তু আমরা ত অবাধে ইহাও বলিতে পারি, ঐ রূপ দোষ তৎকালে অনেকেরই ছিল; মধুসূদনে অপেক্ষা অনেকে উহার মাত্রাধিক্যও লক্ষিত হইত। তাঁহারাও অনেকে বঙ্গমাতার কৃতিমান্ সন্তান। তাঁহাদেরও অনেকের জীবনচরিত অনেকেই লিখিয়াছেন। কই!—সে সকলে ত সে সকল কথার কোনই উল্লেখ দেখিতে পাই না! তবে, তাঁহাদের সহিত মাইকেলের প্রভেদ এই যে, তাঁহারা যতই গুরুতর ব্যভিচার করুন্ না কেন, সে সকলই করিতেন তস্করের ন্যায় সংগোপনে, মধুসূদনের সদাচার কদাচার সকলই সর্ব্বসমক্ষে; সংগোপন—তস্কর-বৃত্তি—তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

সে যাহা হউক, মাইকেল যদি যথার্থই ব্যভিচারী, সে ব্যভিচারের ফলে অপকার হইয়াছে অধিকাংশে তাঁহার নিজেরই, কিন্তু উপকার করিয়াছেন তিনি সমাজের, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির! তিনি তাঁহার 'মেঘনাদবধে' যে রাম, যে

লক্ষ্মণ, যে সীতা, যে সরমা, যে রাবণ, যে বিভীষণ, যে মেঘনাদ, যে প্রমীলা প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্র নব নব রাগে রঞ্জিত করিয়া আদর্শস্বরূপে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, অজ্ঞাতসারে আমাদের অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় তাহার প্রতিবিম্বপাত হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিব, মধুসূদন আমাদের বহিশ্চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়া অন্তর্নিহিত ভাবে এখনও অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

মাইকেলের সবিশেষ গুণপনা তাঁহার শব্দ নির্ব্বাচনে (Choice of words)! অনর্থক বা পুনরুক্ত-ভাবযুক্ত শব্দের পরিহার এবং মাত্র সার্থক শব্দের প্রয়োগ, ইত্যাদিরূপ ভাষারচনার নৈপুণ্য যেরূপ সতর্কতা-সূচক সেরূপ প্রতিভাসূচক নহে; কিন্তু ভাবোদ্দীপক শব্দের প্রয়োগ শুদ্ধ প্রদীপ্ত প্রতিভারই পরিচায়ক। শব্দকে রসাত্মক ও ভাবোদ্দীপক করিবার নিমিত্ত অনেক কৃত্রিম কবি উহার নাসাকর্ণচ্ছেদ, কেহ বা কিম্ভূত কিমাকার শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাতে চিত্তের ভাবাবেশের পরিবর্ত্তে ভাবভঙ্গই ঘটিয়া থাকে। জাগতিক মনস্তন্ত্রীর স্নিগ্ধগম্ভীর সুরে সুর মিলাইয়া, প্রকৃতিদেবীর নিঃশব্দ-বাদিত বীণার অনাহত ঝঙ্কারের একতানে তান মিশাইয়া গম্ভীরে গান গাইতে পারা সাধকের কর্ম্ম নহে, স্বতঃসিদ্ধেরই কর্ম্ম।

তুলসীদাস কহেন, "বোল্‌কা মোল নহি, যো কহনে জানে বোল্। হৃদয়তরাজু তৌল্‌কে কহ্‌না চাহিয়ে বোল্॥" বাস্তবিকই মাইকেল লোকমণ্ডলীর হৃদয়তরাজু তৌল করিয়াই তাঁহার অমূল্য বোল্ বলিয়াছেন। দম্ভাহঙ্কার পরিহার করিয়া ধীরভাবে বাল্মীকির রামায়ণের কিয়দংশ পাঠ করিতে করিতে মন যেমন ক্রমশঃ শান্ত সুপবিত্র ও তন্ময় হইয়া আসে, মেঘনাদবধের কিয়দংশও ঐরূপ ভাবে পাঠ করিতে করিতে যেন ক্রমশঃ মনের তদবস্থাই ঘটিয়া থাকে। তাই, মধুসূদন আমাদের মাত্র চিত্তবিনোদক নহেন, বস্তুতঃ চিত্তের সমাধি-সাধক, পরম হিতকারী, প্রাণের পরিতর্পক, আত্মার আত্মীয়। তদ্ব্যতীত, বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন এবং এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের মহোৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় মাইকেলের প্রতিভার এতই পক্ষপাতী ছিলেন যে, লোকান্তর গমনের স্বল্পদিন পূর্ব্বেও তিনি একদা ঐ সম্বন্ধে অশেষ প্রশংসাসূচক কথা কহিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শরৎকুমার বাবুর মাতৃভাষার প্রতি ও স্বদেশীয় সাহিত্যিকগণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার ও কবি স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন মহাশয় অন্তিমকালে যখন কলিকাতা কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসাধীন ছিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয় তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় করেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কোন কোন বিষয়ে তাঁহার প্রতি যথোচিত আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আনুকূল্যকথা সাধারণে অপ্রকাশ। পরোক্ষে সাহায্যবিধান ও গুপ্তদান শরৎবাবুর প্রকৃতিসিদ্ধ এক অপ্রাকৃত মহাগুণ ছিল। তিনি নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু দান বিষয়ে তাঁহার সংস্কার প্রাচীন হিন্দুর ন্যায় ছিল। আর্ত্তের আর্ত্তি তাঁহার যেন একান্তই অসহ্য বোধ হইত, যাচকের সানুনয় প্রার্থনা শুনিলেই যেন বিহ্বল চিত্তে বিচার-বিমূঢ় হইয়াই তিনি যথাসম্ভব সে প্রার্থনা পরিপূরণে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের বার্ষিককৃত্য দিনে দেখা গিয়াছে, তিনি অনেক অভ্যাগত সাধুসন্ন্যাসিগণকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়াছেন। একটি সম্ভ্রান্ত কুলের উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র যুবক আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায়, সময়ে সময়ে সহসা আসিয়া শরৎবাবুর দ্বারস্থ হইতেন। যুবক যেন নিঃসন্দেহে জানিয়াছিলেন, সে স্থানে গেলেই তাঁহার আহার্য্য মিলিবে। বস্তুতঃও তাহা মিলিত। তদুপরি আবার কখন কখন যুবক সনির্ব্বন্ধে দু'চারি আনা পয়সার প্রার্থনাও জানাইতেন। সে প্রার্থনাও অপূর্ণ থাকিত না।

এইরূপ অমায়িক সহানুভূতি ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ সৎপ্রবৃত্তিতে শরৎবাবুর চরিত্র বড়ই মনোহর ও সুপবিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। এই সকলের অধিকাংশই তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। বিশেষতঃ স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের যখন পূর্ণমাত্রায় অভ্যুদয় সে সময়ে বঙ্গসমাজের শিক্ষিত তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশই বড় অমায়িক, করুণহৃদয় ও শান্তপ্রকৃতিক হইয়াছিলেন। শরৎবাবুও সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তৎকালের আত্মোৎকর্ষ-সাধক নবযুবকদল প্রায়শঃ কেশবচন্দ্রকে দেদীপ্যমান আদর্শ স্বরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং কেশবের আদেশোপদেশ ও চরিত্র বঙ্গসমাজের নবযুগগঠনের একটি প্রধান উপকরণ, সন্দেহ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে কলিকাতা নগরীতে কলুটোলার বৈশ্যবংশীয় সেন মহাশয়দিগের বাটীতে স্বর্গীয় প্যারীমোহন সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার পিতামহ রামকমল সেন মহাশয় কলিকাতা টাকশালের দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহাদের আদিম-নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত গৌরীভা (গরিফা) গ্রামে। পিতা প্যারীমোহন মহাভাগবত, পরমবৈষ্ণব; সুতরাং বলিতে হইবে, অহৈতুকী ভগবদ্‌ভক্তি কেশবচন্দ্রের পৈতৃক ধন। কেশবের ছয়বৎসর বয়সে পিতামহবিয়োগ এবং একাদশবর্ষে পিতৃবিয়োগ ঘটে। অগত্যা জননীদেবীর ও জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই তাঁহার বাল্যজীবন যাপিত হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ একটি পাঠশালায় পরে কলিকাতার হিন্দু কলেজে কেশবচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ। কিন্তু কয়েক বর্ষ অধ্যয়নের পর একদা বার্ষিক পরীক্ষাস্থলে কোনরূপ অন্যায়াচরণের অপরাধে কেশবচন্দ্র কলেজের কর্তৃপক্ষীয়গণ কর্তৃক তিরস্কৃত ও সতীর্থগণের সমক্ষে সবিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। শিষ্ট শান্ত কেশব এই আকস্মিক নির্য্যাতিনিগ্রহে যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। এই অবধিই তাঁহার বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত! ফলতঃ, ঐ অপরাধে তিনি প্রকৃত অপরাধী হউন আর নাই হউন, তজ্জনিত এইরূপ লাঞ্ছনা ও অবমাননা তাঁহার অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যজ্জীবনের প্রবর্ত্তক হইয়া উঠিল। তিনি কলেজ ছাড়িলেন, বয়স্যগণের সঙ্গ ছাড়িলেন, আমোদ আহ্লাদ ছাড়িলেন, কি ইহকালে কি পরকালে জগদীশ্বরই যে জীবের একমাত্র আশ্রয় ও সুখশান্তিবিধাতা এ কথা সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এবং আর্ত্তভাবে অনুদিন মাত্র ভগবানের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই কৃপাভিক্ষা সম্বন্ধেই তিনি শেষজীবনে কহিয়াছেন,—" The first lesson from the Scriptures of my life is Prayer."

এই সময়ে বালীগ্রামের চন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের কন্যার সহিত কেশবচন্দ্রের শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং এই সময়েই তিনি আমেরিকার একেশ্বরবাদী ধর্ম্মযাজক মহাত্মা ড্যাল্ সাহেব ও স্বনামপ্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম্মযাজক

মহানুভব লং সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। কেশবচন্দ্র যদিও কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলেন না, এবং অভিনিবেশ সহকারে নানাবিধ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে স্বল্পকাল মধ্যেই সুবিদ্বান্ হইয়া উঠিলেন।

ড্যাল সাহেবের সহিত বন্ধুত্বই বোধ করি তাঁহার একেশ্বরবাদিত্বের আংশিক প্রবর্ত্তক, এবং এইরূপ প্রধান প্রধান বিদেশীয় ধর্ম্মযাজকগণের সঙ্গ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের আলোচনা—ইহাই বোধ করি অজ্ঞাতসারে তাঁহার অন্তরে খৃষ্টধর্ম্মোপাসনা-পদ্ধতির অনুকরণপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়। রামমোহন রায় মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক হইলেও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ভাবভঙ্গি হিন্দুধর্ম্মের ভাবভঙ্গি হইতে ততটা পৃথক্ বা খৃষ্টধর্ম্মের ভাবভঙ্গির সহিত ততটা সম্পৃক্ত ছিল না। বস্তুতঃ কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মধর্ম্মকে রীতিপদ্ধতিবিষয়ে খৃষ্টধর্ম্মের সন্নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরম ভাগবত প্যারীমোহনের পুত্র কেশবচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই ভক্তিমান্। যখন তাঁহার বয়স নয় দশ বৎসর, তখন তিনি কপালে তিলক কাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে হরিণামের ছাপ পরিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাঁহার ভক্তি ক্রমশঃই গাঢ় হইতে লাগিল। রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল। পরে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সবিশেষ আনুগত্য জন্মে। ইতঃপূর্ব্বে কেশবচন্দ্র নিজ বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া "Good will Fraternity" নামক এক সমিতি সংস্থাপন করেন। এই সমিতিতে তিনি স্বরচিত প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা করিতেন। এইখানেই তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির প্রথম পরিচয়! আত্মীয় স্বজনগণের অনুরোধে তিনি কিছুদিন মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে একটি চাকুরি স্বীকার করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যে বেতনবৃদ্ধিও হইয়াছিল, কিন্তু স্বাধীনচেতাঃ কেশবচন্দ্র অধিকদিন এই শ্ববৃত্তি সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি অচিরেই চাকুরি ছাড়িয়া মনোমত আত্মোন্নতি ও পরহিত-সাধনরূপ মহাব্রতে ব্রতী হইলেন। এই সময়ে তিনি স্বকীয় ও পরকীয় পরমার্থ সাধনোদ্দেশ্যে নানারূপ সদনুষ্ঠানে ও সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

কেশবচন্দ্রের প্রতিভা বড়ই বিস্ময়কর। কথিত আছে, যৌবনবয়সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি একখানি পারস্যভাষায়-লিখিত গ্রন্থ দেখিয়া

জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন, উহা একখানি দুষ্প্রাপ্য উপাদেয় পুস্তক। তিনি উহা মহর্ষির নিকট হইতে কয়েকদিনের নিমিত্ত চাহিয়া লইলেন। সেই কয়দিন পরে গ্রন্থ পুনঃপ্রদান করিলে মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেশব, তুমি ত পারসী জান না, তবে এ পুস্তক লইয়া তুমি এ কয়েক দিন কি করিলে?

কেশবচন্দ্র সরলভাবে উত্তর করিলেন,—আজ্ঞে, আমি পারসী শিখিব বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছি। এ গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট এবং দুর্লভ, অতএব যখন পারসী শিখিব তখন এ গ্রন্থ হয় ত আর পাইব না; এই জন্য গ্রন্থখানি এই সময়ে আগাগোড়া নকল করিয়া রাখিলাম।

মহর্ষি।—কাহাকে দিয়া নকল করাইলে?

কেশব।—আজ্ঞে, নিজে নিজেই নকল করিলাম।

মহর্ষি।—সে কি! তুমি যাহা পড়িতে পার না, তাহা নকল করিলে কিরূপ করিয়া?

কেশব।—আজ্ঞে, যেমন যেমন দেখিলাম, তেমন তেমনই আঁকিয়া রাখিলাম।

মহর্ষি।—আন দেখি তোমার সেই নকল বহিখানা।

কেশবচন্দ্র নকল বহিখানা আনিয়া দিলে দেবেন্দ্রনাথ দেখিয়া অবাক্ হইলেন,—উহাতে বিন্দুবিসর্গেরও ব্যতিক্রম ঘটে নাই! কেশবচন্দ্রের কি অসাধারণ প্রতিভা ও অভিনিবেশ!

বাল্যকালে যখন কেশবচন্দ্র খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকগণের সহিত বড়ই মিশামিশি করিতেন, তখন একদিন কোন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ধর্ম্মযাজককে একটি লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কেশবচন্দ্র খৃষ্টিয়ান নহেন, অথচ এই বালককে আপনি এত ভালবাসেন কেন?

ধর্ম্মযাজক উত্তর করিলেন,—বালক খৃষ্টিয়ান্ নহেন সত্য, কিন্তু এই বালককে যদি আমি কোনদিন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি, সেই দিন জানিও, আমি সমগ্র ভারত খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলাম!

ধর্ম্মযাজক মহাশয় কেশবচন্দ্রকে সেই বাল্যকালেই দেখিয়া তাঁহার অসাধারণ লোক-নেতৃত্ব শক্তির সম্যক্ অবধারণা করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র ভবিষ্যতে যে কেবল সুবিদ্বান্, সদ্বক্তা এবং ধর্ম্মসংস্কারক হইয়াছিলেন তাহা নহে, চিত্তসংযম ও ভগবদুপাসনা বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। কখন কখন কেহ কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি

একাকী আপনগৃহে রাত্রি আটটার সময়ে যে আসনে বসিয়া উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন, পরদিন প্রভাতে আটটা পর্য্যন্তও সেই আসনে সেই ভাবে বসিয়া উপাসনায় নিরত আছেন! অনভিজ্ঞে যাহাই মনে করুন, কর্ম্মাভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন, এ যুগে ইহা এক প্রকার অসাধ্য সাধন। ইহাতেই বোধ হয়, কেশবচন্দ্র ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম কিয়দংশে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতি এতই স্নেহপরায়ণ ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া-ছিলেন যে, অল্পকাল মধ্যে কেশবচন্দ্রই ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মসমাজের একরূপ সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে সমাজের ব্রাহ্মগণ ছিলেন বৈদিক আদর্শের ব্রাহ্ম, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার পার্শ্বদ-দল হইয়া উঠিলেন খৃষ্টীয় আদর্শের ব্রাহ্ম; এ অবস্থায় বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। ফলতঃ তাহাই ঘটিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কেশবপ্রমুখ নবানুরাগী ব্রাহ্মদল 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির' নামে এক নূতন উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণার্থ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় মহাসমারোহে ভিত্তি স্থাপন করিলেন। মন্দির নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইলে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে অদ্যাবধি ঐ মন্দিরেই কেশবীয় ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নিয়মিত উপাসনাদি কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্র কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ও ভারতের অপরাপর অনেক স্থানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ অনেক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ ও হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক মত খণ্ডন করিয়া তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহামন্ত্রধ্বনিতে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত জাগাইয়া তুলিলেন। হিন্দুগণের নিকট এ মন্ত্র নূতন নহে, পরন্তু তাঁহারা কেশবের অলৌকিক বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া, বড় একটা দ্বিরুক্তি করিলেন না, মাত্র জাতিবিচার ও খাদ্যাখাদ্যবিচার বিষয়ে ভিন্ন মত দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু খৃষ্টিয়ানগণ কেহ কেহ একেবারে জ্বলদগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন!

করিবারই কথা। কেশব যে তাঁহাদিগকে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত করিতে উদ্যত!

ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের সূচনার পূর্ব্ব হইতেই ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের রাজত্ব-স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছিল। মিশনারি সম্প্রদায় বহুদিন ধরিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া বীজরোপণ জলসেচন ইত্যাদি বহুচেষ্টায় যে তরুর প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র সহসা তাহার মূলে

কুঠারাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন! এ আঘাতে কেন না তাঁহারা মর্ম্মাহত হইবেন?

বাস্তবিকই সে সময়ে ভারতে পাশ্চাত্যবিদ্যার যেরূপ আলোচনা, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা পাশ্চাত্য আচারব্যবহার বেশবিন্যাস ইত্যাদির যেরূপ অনুকরণ, তদুপরি সুপণ্ডিত সাধু খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-প্রচারকগণের যেরূপ প্রবোধ-প্ররোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তৎফলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহামনীষিগণ যেমন সাগ্রহে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মাশ্রয় করিলেন, তাহাতে লোকচিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কোন বিধাতৃবিহিত যথাকালে-আবির্ভূত অলৌকিক শক্তি-পরিচালিত আকস্মিক প্রতিক্রিয়া না হইলে আজ ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের—সমাজশ্রী বোধ হয় স্বতন্ত্ররূপ পরিলক্ষিত হইত; এবং আমরা অসঙ্কোচে স্বীকার করিব যে, কেশবচন্দ্রই সেই যথাকালে-আবির্ভূত অলৌকিক আকস্মিক দৈবশক্তি! এই অর্থে কেশবচন্দ্রকে শাস্ত্রসম্মত অসংখ্য অবতারের অন্যতম বলিয়া ব্যাখ্যাত করিতেও আপত্তি নাই। শুভক্ষণে তাঁহার জন্ম, শুভক্ষণে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার!

সে যাহা হউক, খৃষ্টীয় যাজকগণ কেশব, কেশবের ধর্ম্মমত ও তন্মতাবলম্বিগণের উপর এতই চটিয়া গেলেন যে, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড্ লালবিহারী দে মহাশয়ের সম্পাদিত এক পত্রিকাতে ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে নানারূপ উপহাসাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। অমনি কেশবসিংহ স্ববিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন! তিনি ঐ পত্রিকার উত্তরে ওজস্বিনী ভাষায় (Brahma Samaj Vindicated) "ব্রাহ্মসমাজের পক্ষসমর্থন" নামক এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিমোহিত চমৎকৃত! বাস্তবিকই তৎকালে অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল,—কেশব কি মানুষ, না যথার্থই কোন দেবাবতার? স্বনামপ্রসিদ্ধ পাদরী ডফ্ সাহেব স্বয়ং এই বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ যে শক্তি প্রভাবে অভ্যুদিত হইতেছে তাহা সামান্য শক্তি নহে!

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নবনির্ম্মিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিয়া কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপ্রচারার্থ ইংলণ্ডে গমন করিলেন, এবং প্রায় বর্ষার্দ্ধকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অন্যূন ৭০টি বক্তৃতা প্রদান করিয়া ইংলণ্ডবাসিগণকে বিমোহিত করেন। স্বয়ং ভারতেশ্বরী মহারাণী

ভিক্টোরিয়া ইঁহাকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক নিজপ্রাসাদে লইয়া গিয়া স্বাক্ষরিত ফটো ও পুস্তকাদি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াও কেশবচন্দ্র অনেক সদনুষ্ঠান ও অনেক বক্তৃতাপ্রদান করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার প্রাধান্যে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েক ব্যক্তি প্রকারান্তরে তাঁহার মতবিরোধী হইতে লাগিলেন। ইহার পরেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের কন্যার সহিত কোচ-বিহারের মহারাজের শুভবিবাহ সংঘটিত হইল। এই বিবাহে ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতির নিয়ম-লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীপ্রমুখ বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ও কেশবের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ" নামে এক নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র নিজ ধর্ম্মমতের নাম "নববিধান" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বাইবেলের (New Testament) নিউ টেষ্টামেণ্ট শব্দটীর অনুবাদেই সম্ভবতঃ নববিধান শব্দটীর উৎপত্তি। কেশবচন্দ্রের নবপ্রচারিত এই নববিধান-ধর্ম্ম একরূপ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বলিলেও বলা যায়। ইহাতে প্রকারান্তরে পৌত্তলিকতারও সমর্থন করা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার এই অন্তিম ধর্ম্মমতটি বড়ই উদারপ্রকৃতিক এবং বড়ই ভক্তিবৈরাগ্য-উদ্দীপক। এই হইতেই কেশবচন্দ্র তাঁহার চিরদিনের ব্রহ্মকে "মা আনন্দময়ী" বলিয়া সম্বোধন করিতে শিখেন ও শিখান। ইহা সাধন-পরিপাকেরই লক্ষণ, সন্দেহ নাই।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচবৎসর কাল কেশবচন্দ্র নববিধান-মত প্রতিষ্ঠাকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে বিশবৎসরেও সেরূপ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র দারুণ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে মর্ত্ত্যাবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার মা-আনন্দময়ীর আনন্দ-ধামে চলিয়া গেলেন।

তিনি প্রকৃতই বড় মাতৃভক্ত ছিলেন। বাল্যবয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটায়, মাকেই তিনি সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা জানিতেন। বিধবা জননী নিরামিষ হবিষ্যাশী ছিলেন, কেশবচন্দ্রও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনই নিরামিষাশী; যখন ইংলণ্ডে তখনও তিনি নিরামিষাশী! শেষ জীবনে তিনি স্বপাকে ভোজন করিতেন।

শিক্ষিত বঙ্গসমাজের উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব বড়ই বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং বঙ্গের এই নবযুগ গঠনে তিনি একজন অসামান্য শিল্পী। তৎকালের নবযুবকদল

কেশবচন্দ্রের উপদেশে মাদকসেবন, পরদারাসক্তি, মিথ্যাকথন, উৎকোচ-গ্রহণ, বাচালতা প্রভৃতি দোষসমূহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে কেশবকেই উজ্জ্বল আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অনেকেই কেশবচন্দ্রের অনুকরণে আমিষভোজন পরিত্যাগ ও শুদ্ধশ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতেন। কেশবচন্দ্র তরুণ বয়স হইতেই চশ্‌মা ব্যবহার করিতেন; তাঁহার অনুকরণে অনেক অজাতশ্মশ্রু বালকেও চশ্‌মা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল! একবার যাহা লোকে সাধ করিয়া করিতে আরম্ভ করে, কালে তাহা প্রয়োজন-বশতঃই করিতে বাধ্য হয়, ইহা প্রকৃতির একটি বিস্ময়কর নিয়ম। তখন দেখিতাম যুবকেরা কেহ কেহ সাধ করিয়া চশ্‌মা পরিতেন, এখন দেখিতেছি প্রয়োজনবশতঃই বালকগণকেও চশ্‌মা পরিতে হইতেছে। কেশবীয় যুগের পূর্ব্বে সমগ্র কলিকাতা নগরীতে, চল্লিশবৎসর বয়সের পূর্ব্বে চশ্‌মা ব্যবহার করিতেছেন, এরূপ লোক দেখা যাইত না, বলিলেই হয়।

কেশবচন্দ্র যে কেবল ধর্ম্মতত্ত্বেই অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। সময়ে সময়ে ভারতের কোন কোন স্বাধীন নৃপতিও তাঁহার নিকটে রাজনীতিবিষয়ক সুপরামর্শ লইতেন। অনেক দিন ধরিয়া তিনি ইণ্ডিয়ান্ মিরর্ নামক সংবাদপত্র স্বয়ং পরিচালিত করেন, পরে উহার পরিচালন ভার ও স্বত্বাধিকার স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে সমর্পণ করেন। বাঙ্গলায় স্বল্পমূল্যে সংবাদপত্র প্রথমতঃ কেশবচন্দ্রই প্রচারিত করেন। এই পত্রের নাম "সুলভ সমাচার"। সেকালের "সুলভ সমাচার" বড়ই সাধুভাষী ও সরস ছিল। উহা হইতে বঙ্গসমাজের অনেক শ্রেয়োলাভ হইয়াছে।

খোল করতাল লইয়া সংকীর্ত্তন বঙ্গের শিক্ষিতসমাজে একরূপ অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়াই পরিগণ্য হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রই ঠাকুরবাড়ীর আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজ সম্প্রদায়ে উহা প্রচলিত করেন। তখন হইতে আবার শিক্ষিত বঙ্গসমাজে ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ত্তনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রবর্ত্তিত বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম্মমত ও ঐ মহাপুরুষের অত্যুজ্জ্বল জীবনাদর্শ ক্রমে মলিন হইয়া আসিতেছিল, শিক্ষিত বঙ্গযুবকগণ অনভিজ্ঞতা বশতঃ উহার প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু কেশব-চন্দ্রই উহা সুমার্জ্জিত করিয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করেন। শিক্ষিতসমাজ তাঁহারই প্রসাদাৎ উহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিল। প্রেম, ভাব, মহাভাব এ সকল কথা উপহাসকর বলিয়াই পরিকল্পিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রই

এই সকলের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য চিরঞ্জীবশর্ম্মা মহাশয় "ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা" নামে যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত করিলেন, তাহা পাঠ করিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালীযুবকগণের চৈতন্যোদয় হইল। ক্রমশঃ তাঁহারা "চৈতন্য চরিতামৃত" "চৈতন্য ভাগবত" ইত্যাদি পাঠের প্রবৃত্তি পাইলেন।

কেশবচন্দ্রের বাঙ্গালা উপাসনা ও বক্তৃতার ভাষাভঙ্গি সম্পূর্ণ অভিনব ও মনোহর। ধর্ম্ম বস্তুটি যেন এখন আমাদের সমাজের বহিরঙ্গ বলিয়া পরিগণিত; এই হেতু বৈষ্ণবভাবা যেন আমাদের নিকট অপরিচিত ও অনালোচ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং সম্প্রতি কেশবচন্দ্রের এই ব্রাহ্মভাবাও আমাদের নিকট তদ্রূপই অনাদৃত হইয়াছে। তথাপি বৈষ্ণবভাষা স্বভাবতঃই যেমন সে কালের সামাজিক বঙ্গভাষার উপর অজ্ঞাতসারে স্বপ্রভাব প্রসারিত করিয়াছিল, কেশবচন্দ্রের এই ভাষাও তেমনই অজ্ঞাতসারে আধুনিক সামাজিক ভাষার উপর স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং সে প্রভাবে আধুনিক বঙ্গভাষা যে সবিশেষ উপকৃত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সুদক্ষ সহকারী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই দুই মহাপুরুষের মুখে যেরূপ সরল সুললিত বাঙ্গালা ভাষার অনর্গল বক্তৃতা ও প্রার্থনা শুনা গিয়াছে, সেরূপ ভাষার বক্তৃতাদি শুনিবার সৌভাগ্য বঙ্গবাসীর ভাগ্যে আবার কতদিনে ঘটিবে, কে বলিতে পারে? আদৌ আর ঘটিবে কিনা, তাহাও সন্দেহস্থল। কেশবচন্দ্রের অন্তিম কালে কৃত "জীবনবেদ" ও "হিমাচল প্রার্থনা" নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে ভাবগ্রাহী পাঠক মাত্রেই গ্রন্থকারের সুগভীর অন্তর্ভাবের অনেকাংশে পরিচয় পাইতে পারিবেন।

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত কেশবচন্দ্রের সবিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন, পরমহংসদেবও কেশবচন্দ্রকে এবং তাঁহার ব্রাহ্মসমাজকে বড়ই ভাল বাসিতেন। অনেকের বিশ্বাস, পরমহংসদেবের সংসর্গপ্রভাবেই কেশব অবশেষে তাঁহার 'আনন্দময়ী মাকে' চিনিয়াছিলেন এবং সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়রূপ 'নববিধান' ধর্ম্মমত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে কেশবচন্দ্রের মতাবলম্বিগণ প্রার্থনা বা বক্তৃতাদিকালে তাঁহার নামোল্লেখ করিতে হইলে "ব্রহ্মানন্দ" এই নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্রকে যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে মনোনীত

করেন, সেই সময়ে উক্ত মহর্ষি কর্ত্তৃকই কেশবের এই নূতন নামকরণ হইয়াছিল।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে যে বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেন, নববিধানবাদী ভক্তিমান্ ব্রাহ্মগণ সেই স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ মহাপুরুষ কেশবচন্দ্রের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত অদ্যাবধি কেহই আর সে বেদীতে উপবেশন করেন না, তাঁহারা তন্নিম্নে এক স্বতন্ত্র আসনে বসিয়াই নিয়মিত আচার্য্যকার্য্য সম্পন্ন করেন। সাম্প্রদায়িক বাদপ্রতিবাদ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে, এ কথা সকলেরই স্বীকার্য্য, ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি অদ্যাবধি কেহ আবির্ভূত হন নাই, ভবিষ্যতে কেহ হইবেন কি না অনিশ্চিত।

স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় বড়ই সাম্যভাবাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মানুরাগী হইলেও কদাপি পরধর্ম্মদ্বেষী হইতেন না। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি দেখিলেই, জাতি বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তিনি নিজের অন্তরঙ্গ জ্ঞানে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও সমাদর প্রদর্শন করিতেন। নববিধান সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই উভয় সমাজের প্রতিই শরৎবাবুর সমান শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, উভয় সমাজের ব্যক্তিগণকেই তিনি নিজ সামাজিক বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহার অমায়িক সমদর্শনগুণে নববিধানবাদী বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্তগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, আবার সাধারণ সামাজিক মহাশয়গণও তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন; তাঁহাদের প্রধান আচার্য্য পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে প্রকৃতই কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

শরৎকুমারের স্বনামধন্য পিতৃদেব রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথম বার্ষিক কৃত্যোপলক্ষ্যে শরৎবাবু হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া হারিসন্ রোড্ স্থিত ভবনে সকলকেই সম্মাননা শিষ্টাচার ও সুমিষ্ট ভোজ্যাদি দ্বারা পরমাপ্যায়িত করেন।

আমাদের স্মরণ হয়, অনেক দিন পূর্ব্বে লর্ড লিটনের সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন একদা ফাদার লাফোঁ প্রমুখ কয়েকজন ইউরোপীয় মহাজনকে নিমন্ত্রিত করিয়া তাঁহার লিলি কটেজ্ বা কমলকুটীর নামক বাটীতে লইয়া কদলীপত্রে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। ধন্য কেশবের অদ্ভুত উদ্ভাবনা!

বঙ্গসমাজে সর্ব্বজাতি, সর্ব্বাচার ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সূচক অনুষ্ঠান সর্ব্বাদৌ কেশবচন্দ্রই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এই সর্ব্বসমন্বয়রূপ সর্ব্বাশ্রয়ভূত

মহাশ্বত্থের বীজ সর্ব্বপ্রথমে নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের বিল্বমূলেই রোপিত হইয়াছিল! কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি মুসলমান, কি খৃষ্টিয়ান, সকলের ধর্ম্মই সত্যমূলক, সকল ধর্ম্মমতই পরমার্থপ্রদ, ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তি মাত্রেই,—যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন,—সকলেরই পূজার্হ, সকল ধর্ম্মের উপাসনাপদ্ধতিই ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তির উপায়ভূত, এ যুগে এ মহামন্ত্রের আদি গুরু দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অপরার্দ্ধভাগে বঙ্গদেশে যখন বিবিধ বৈদেশিক ও স্বদেশীয় শক্তি সম্মিলিত ভাবে ক্রীড়া করিতেছিল, সেই সময়ে লোকলোচনের অন্তরালে কলিকাতার প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে পবিত্রতীর্থ দক্ষিণেশ্বরের ৺ভবতারিণীর ভবনে আর এক অলৌকিক মহাশক্তির সঞ্চার হইতেছিল। এই সংগোপনে সঞ্চিত মহাশক্তির প্রভাব যে কালক্রমে সমগ্র ভারতে ও সুদূর ইউরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে, এ কথা তখন জনসমাজে স্বপ্নের অগোচর।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে একটি সুন্দর মানবশিশুর জন্ম হয়। গৃহস্বামী স্বর্গীয় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই শিশুর পিতা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সদ্বংশসম্ভূত সদাচারপরায়ণ সাধুপুরুষ, তাঁহার গৃহে বিগ্রহসেবা নিত্যই ছিল। কথিত আছে তাঁহার সেবাভক্তিগুণে সদয় হইয়া তাহার ইষ্টদেবতা অনেক সময়ে তাঁহার নিকট অনেক অলৌকিক বিষয়ের আভাস প্রকাশ করিতেন। ক্ষুদিরামের এই নবজাত কনিষ্ঠ পুত্রটির সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচারিত আছে। বাল্যে ইঁহাকে সকলে গদাধর বলিয়া ডাকিত, প্রকৃত নাম শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে সবিশেষ কোন ইতিহাস নাই। তিনি বড় প্রিয়দর্শন ও সঙ্গীতপ্রিয় বালক ছিলেন। বড় হইয়া গদাধর কলিকাতায় আসিয়া ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে ৺ভবতারিণী দেবীর পূজকরূপে নিযুক্ত হইলেন। এই ঠাকুরবাড়ীতে পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরে নানারূপ দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তখনও ছিল। রামকৃষ্ণ এই স্থানে থাকিয়া নিত্য নিয়মিতরূপে ভবতারিণী দেবীর পূজা করিতে করিতে ক্রমশঃ সংসারাসক্তিশূন্য হইয়া যুগপৎ ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং কঠোর সাধনায় নিরত হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথি সেবার বন্দোবস্ত থাকায় অনেক

সময়ে অনেক সাধুসন্ন্যাসী তথায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ইঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন, এবং কাহারও নিকট হইতে যা নিজ প্রয়োজনানুযায়ী তত্ত্বোপদেশাদি গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, তিনি প্রথমতঃ এক যোগিনীর উপদেশানুরূপ সাধনকার্য্যে নিযুক্ত হন, তৎপরে পাগাড়ী বাবার শিষ্য প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ তোতাপুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইত্যবসরে সামাজিক বিধি অনুসারে তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণীর নাম শ্রীমতী সারদা দেবী।

মোহদম্ভদ্বেষবৈগুণ্য মানাপমান ঘৃণালজ্জা এই অষ্ট পাশ লইয়া ব্যাধরূপী দুষ্ট সংসার মহামতি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসরণ করিল, কিন্তু অচিরেই পরিচয় পাইল,— এ দুর্ব্বল মৃগ নহে, মহাবল মৃগেন্দ্র! সভয়ে ভঙ্গ দিয়া ভীরু সংসার অমনি পশ্চাৎপদ হইল। বীরসাধক অবাধে আপন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ কঠোর সাধন করিয়াছিলেন এ যুগে এরূপ সাধনের কথা আর শুনা যায় না। তিনি ভবতারিণীর পূজায় বসিয়া এতই সমাহিত হইতেন যে, একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সেই পাষাণময়ী মূর্ত্তিতেই জগদীশ্বরীর স্বারূপ্য অনুভব করিতেন এবং পূজার্থ আয়োজিত ভোজ্যাদি লইয়া কখন তাঁহার মুখে ধরিয়া বলিতেন,—"খাও মা খাও", আবার কখন বা—"কি? আমি না খাইলে খাইবে না? আচ্ছা, এই আমিও খাই, তুমিও খাও" বলিয়া একএকবার উহা নিজমুখেও দিতেছেন, কখন বা বালকের ন্যায় "মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন! ভাব দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিল, কিন্তু ভক্তিমতী রাণী রাসমণি ও তাঁহার ভক্তিমান্ জামাতা মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আচার বিচার ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া একান্তই বিশ্বাস করিলেন,— এই মহাত্মা যথার্থই জগদীশ্বরীর সালোক্যলাভ করিয়াছেন, ক্রমশঃ সাযুজ্যে অগ্রসর! তাঁহারা সভয়ে সাগ্রহে সেই মহাপুরুষকে ঠাকুরবাড়ীতে রাখিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার পরিচর্য্যার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন কঠোর হইতে কঠোরতর ক্রম অবলম্বন করিল।

দিবসে ধৈর্য্য নাই, নিশিতে নিদ্রা নাই, কখন যেন কতই সাধের ধন পাইয়াছেন, কখন যেন কি প্রাণের ধন কোথায় হারাইয়াছেন, কখন হর্ষ কখন বিষাদ, কখন হাস্য কখন রোদন, —না পাগল না প্রকৃতিস্থ, না বালক না বৃদ্ধ, না পিশাচ না মানুষ না দেবতা,—যেন এক দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, অন্য দেশের সীমা দেখা যাইতেছে—অথচ এখনও ঠিক ধরিতে

পারেন নাই, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল ছুটিতেছেন! মাত্র মানববুদ্ধিতে সাধকের সে চরিত্র সুবোধ্য নহে।

এই সময়ে তিনি অশেষবিধ সাধনে সদাই নিরত থাকিতেন। কখন এক হস্তে রজতখণ্ড অপর হস্তে মৃত্তিকাখণ্ড গ্রহণ করিয়া পাগলের মত কেবল বলিতেছেন,—"এ কি? এ মাটি; এই দেহ এই কোঠামঠ এই গাছপাতা সবই শেষে এই মাটি হয়। এই মাটি লইয়া কত মাম্‌লামোকদ্দমা বিবাদবিসংবাদ দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনজখম হয়!—আবার এটি কি? এটি টাকা; ইহাতে কি হয়? ইহাতে বাবুগিরি হয় দম্ভঅহঙ্কার হয় বিবাদ হয় মারামারি হয় খুনজখম হয়, আরও মাথামুণ্ডু কত কি হয়! দূর যা!"— বলিয়া একেবারে উভয় খণ্ডই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতেন। কখন বা রাত্রিতে হনুমান সাজিয়া যুক্ত করযুগলে রাম-বিগ্রহের সম্মুখে একবার দণ্ডবৎ ভূতলে পড়িতেছেন আবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন; হয় ত সারারাত্রি এই ভাবেই কাটিয়া গেল! কখন বা স্ত্রীবেশ ধরিয়া গোপীভাবে কৃষ্ণসেবা করিতেছেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রসাশ্রিত হইয়া শ্রীভগবানের ভজনা করিতেন। সাধনপরিপাকে যখন ক্রমেই অন্তরের উদারতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তিনি কখন মুশলমানের ন্যায় নেমাজ করিতেন, কখন খৃষ্টিয়ানগণের গির্জ্জায় গিয়া খৃষ্টিয়ানগণের সহিত, কখন বা ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া ব্রাহ্মগণের সহিত উপাসনায় যোগ দিতেন, কখন বা বৈষ্ণবগণের সহিত সংকীর্ত্তন করিতেন। এই স্থলেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সূত্রপাত! জগজ্জননীকে মাতৃভাবে ভজনা করাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভজনপদ্ধতি। এই ভাব তাঁহার এতই অকৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছিল যে কখন কখন এরূপও দেখা যাইত যে, যাই একটি বিড়াল ম্যাও করিয়া ডাকিয়াছে এবং কেহ 'ওই বিড়াল!' বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে, অমনি মাতৃগতপ্রাণ শিশু শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে তাঁহার ভবতারিণী মায়ের পরিহিত বস্ত্রাঞ্চলের অন্তরালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন! কেবল ভবতারিণী কেন, যে কোন স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেই তাঁহার চিত্তে বিশুদ্ধ মাতৃভক্তির উদয় হইত, এবং পৃথিবীর যাবতীয় নারীকেই তিনি তাঁহার ইষ্টদেবীস্বরূপা মনে করিতেন। এই সময় হইতে সকলেই তাঁহাকে 'পরমহংসদেব' বলিত।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু ও অপর কতিপয় ভক্তের মনে একবার বড় সাধ হইল যে পরমহংসদেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে এক গৃহে এক শয্যায় শয়ন করাইবেন। মথুরবাবুর আয়োজনে উত্তম শয্যা পুষ্পমাল্য প্রভৃতিতে

গৃহ সজ্জিত হইল, সায়ংকালীন আরাত্রিক সমাধা হইলেই স্ত্রীগণ শ্রীমতী সারদাদেবীকে উত্তম বেশভূষণে সুসজ্জিত করিয়া গৃহমধ্যে সেই শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিলেন।

পরমহংসদেব নিজগৃহে ভক্তগণের সহিত নানাবিধ ধর্ম্মকথা কহিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে ভক্তগণ তাঁহাকে বলিতেছেন,—'আজ এই অবধি থাক্, রাত্রি হইয়াছে, আপনি গিয়া শয়ন করুন্', পরমহংসদেব কেবল বলিতেছেন,—'এই যাই, এই যাই।' এইরূপে 'এই যাই, এই যাই' করিতে করিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। তখন সকলে নছোড় হইলে, তিনি ধর্ম্মালাপ বন্ধ করিয়া সেই শয়নগৃহে গমন করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, পালঙ্কে বস্ত্রাবৃতা হইয়া সহধর্ম্মিণীদেবী শয়ান রহিয়াছেন, মাত্র তাঁহার অলক্তক-রঞ্জিত পদদ্বয় অনাবৃত! পদদ্বয় দর্শনমাত্রেই রামকৃষ্ণের ইষ্টদেবীর শ্রীপাদপদ্ম বলিয়া মনে হইল; অমনি বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন,—'হাঁ মা, এতদিনের পর বৌ সেজে ভুলাতে এলি?'

এই কথা বলিয়াই সমাধিমগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। তৎক্ষণাৎ ভক্তগণ আসিয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সমাধিভঙ্গ হইতে হইতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সেই অবধি আর কেহ কখন সেরূপ শয়নোদ্‌যোগ করিতে সাহসী হইতেন না।

পরমহংসদেবের উক্তরূপ ভাবাবেশ বা সমাধি মধ্যেমধ্যেই হইত। সে সময়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকিতেন। হয়ত বসিয়া আছেন, তাঁহার ইষ্টদেবতার সহিত অন্যের অবোধ্য ভাবে আলাপ করিতেছেন, দৃষ্টি স্থির, দেহ নিঃস্পন্দ, ভাব দেখিয়া সকলেই নির্ব্বাক্, সকলেই যেন সমাহিত! সে ভাব বড়ই অলৌকিক, বড়ই বিস্ময়কর।

পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণীও ক্রমশঃ স্বামিধর্ম্মাশ্রিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়বৈরাগ্য আদর্শনীয়। একদা মথুরবাবুর ইচ্ছা হইল, কিছু টাকা পরমহংসদেবকে দান করিবেন। পরমহংসদেব কিন্তু তাঁহার এ ইচ্ছাপূরণে একান্তই অসম্মত। অগত্যা মথুরবাবু সাধ্বী সারদাদেবীর নিকট তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—মা, আমার বড় ইচ্ছা, আপনাকে কিছু অর্থ প্রদান করি।

মথুরবাবু কয়েক সহস্র টাকা দিয়া তাঁহাদিগের যে একটা জীবনোপায়ের সংস্থান করিয়া দিবেন, ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহার ইচ্ছা। বস্তুতঃ তিনি

তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তিমান্ ছিলেন তাহাতে তাঁহারা প্রার্থনা করিলে সে সময়ে দশ সহস্র মুদ্রাও তিনি সন্তোষপূর্ব্বক প্রদান করিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই পতিপরায়ণা সতীসাবিত্রী উত্তর করিলেন,—"আমি টাকা লইয়া কি করিব ?"

তখন মথুরবাবু কিছু অলঙ্কার দিবার প্রার্থনা জানাইলেন, তাহাতেও অস্বীকার! অগত্যা মথুরবাবু কহিলেন, আমার বড় ইচ্ছা আপনাকে কিছু দেই, আপনি বলুন্ আপনার কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন ?

তখন পরমহংসপত্নী সবিনয়ে কহিলেন, আমার ত বাবা কিছুরই অভাব নাই, তবে যদি আমি কিছু লইলে তুমি সন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে আমাকে ভাল দেখিয়া দু'পয়সার দোক্তার পাতা আনিয়া দাও।

কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্! যেখানে দশ পাঁচ হাজার টাকা চাহিলেও পাইতেন, সেখানে না হয় হাজার টাকার—না হয় পাঁচ শত টাকার স্বর্ণালঙ্কার—নিদানে একশত টাকার একখানা গয়নাই প্রার্থনা করুন্! কিছুই না! একেবারে দু'পয়সার দোক্তার পাতা! ধন্য এই অসামান্যা ব্রাহ্মণপত্নীর লোভরাহিত্য!

পরমহংসদেবের অলৌকিক ভাব দর্শন করিয়া অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন, অনেকে শিষ্যত্বও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেন এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার উপদেশের বিশিষ্টতা এই ছিল যে, তিনি গল্পচ্ছলে সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এমন কি বেদান্তের জটিল সমস্যা সকলেরও সুসমাধান করিয়া দিতেন। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও তাঁহার নিকট গিয়া অনেক নূতন শিক্ষা লাভ করিতেন। তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ স্বামী), সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ব্রাহ্মধর্ম্ম-ধুরন্ধর মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাম চন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, রাখাল (রাখাল মহারাজ বা ব্রহ্মানন্দস্বামী) প্রভৃতি মহাত্মগণই সর্ব্বপ্রধান। এই সকলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ যে কালক্রমে একজন দিগ্‌বিজয়ী মহাপুরুষ হইবেন, পরমহংসদেব তাহা দিব্যজ্ঞানে জানিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যখন নববিধান ধর্ম্মমতে 'নববৃন্দাবন' নাটকের

অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমান্ নরেন্দ্র দত্ত গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া তাপসবেশে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন দেখিয়া পরমহংসদেব বলিয়া উঠেন,—"ওরে নরেন্, তুই আর ও বেশ ছাড়িস্ নি, অমনি আমার কাছে চলে' আয়;" এবং কেশবচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন,—"দেখ কেশব, তুমি এক কেশব, আর নরেন্ আমার আঠার কেশব!"

পরমহংসদেব এইরূপে নানা শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া নানাবিধ উপদেশ দান করিয়া এবং স্বয়ং সমুজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বঙ্গে তথা ভারতে ও ভূমণ্ডলে যেন এক অভাবনীয় অভিনব যুগপ্রবর্ত্তনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে এই মহাপুরুষের মর্ত্ত্যলীলার অবসান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের মধ্যদিয়া নিজশক্তি যে,—কেবল বঙ্গে নয়,—সমগ্র ভারতে, ইউরোপে ও আমেরিকায় যথেষ্ট সঞ্চারিত করিয়াছেন, এ কথা এক্ষণে সকলেই বুঝিতেছেন। রামকৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্তগণ অনেকেই এক্ষণে ইঁহাকে শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণাদির ন্যায় ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ইঁহার শিষ্যগণ এক্ষণে ভারতের বহুস্থানে সেবাশ্রম স্থাপন করিয়া অনাথ নিরাশ্রয় দুঃস্থ ও পীড়িতগণের আশ্রয়আহার্য্যদান ও সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই গৃহত্যাগী ও কৌমারব্রতধারী। এই সকল সেবাশ্রমের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ দেশবিদেশ হইতে অনেক মহাত্মা অনেক অর্থ দান করিয়াছেন ও করিতেছেন। রামকৃষ্ণের ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপ রামকৃষ্ণধর্ম্মই কালে ভারতের তথা সমস্ত সভ্যজগতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম হইবে।

রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মাত্র পাশ্চাত্যবিদ্যা খৃষ্টধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রভাবই প্রসারিত হইতেছিল। কালীদুর্গা শিববিষ্ণু প্রভৃতি ভারতের পুরাণোক্ত দেবদেবীর উপাসনা মাত্র পৌত্তলিক কুসংস্কারমূলক এবং ঐরূপ উপাসনার ফলে মাত্র কুসংস্কারই বৃদ্ধি পায়, বিশুদ্ধ ভগবদ্‌ভক্তি বা তত্ত্বজ্ঞানের উহা বিষম অন্তরায়, এইরূপই শিক্ষিত সমাজের দৃঢ়সংস্কার জন্মিতেছিল। কিন্তু এই মহাপুরুষের সাধনব্যাপার অবগত হইয়া, ইঁহার প্রদর্শিত উজ্জ্বল আদর্শ পাইয়া এবং ইঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া সমাজের মোহভঙ্গ হইল। আরও বিচিত্র এই যে, তাহা বলিয়া লোকের মনে অপরাপর ধর্ম্মমতের প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ না হইয়া বরং সর্ব্বধর্ম্মই সত্যমূলক এবং শ্রেয়ঃপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল। শিক্ষিত সমাজ হইতে পুরাণোক্ত দেবদেবীগণ যেন ক্রমশঃ বিদায় গ্রহণ করিতে-

ছিলেন, পরমহংসদেবই যেন বহুআহ্বানে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। ইহা ব্যতীত সাধনার্থ কৌমার্য্য তথা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়াছিল বলিলেই হয়, দেশীয় শিক্ষিতসমাজে মাত্র দুইএকজন খৃষ্টভক্ত মহাত্মাই উহা অবলম্বন করিতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণপ্রসাদাৎ ক্রমশঃ পুনর্ব্বার এই ব্রতের প্রসার দেখা যাইতেছে।

রামকৃষ্ণের প্রবর্ত্তিত প্রকৃত সাম্যভাব নববিধানসূত্রে সঞ্চারিত হইয়া অধুনাতন হিন্দু ও ব্রাহ্মগণের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকাংশে নিরাকৃত করিয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণ যেমন হিন্দুগণকে পৌত্তলিক বলিয়া একেবারেই অন্ধকারনিমগ্ন ও একমাত্র আপনাদিগকেই আলোকদর্শী বলিয়া মনে করিতেন, এবং হিন্দুগণও যেমন ব্রাহ্মগণকে জাতিচ্যুত আচারভ্রষ্ট ও আপনাদিগকে কুলপাবন পবিত্রচরিত ভাবিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেন, এখন যেন অনেকাংশে সে ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়াছে। ফলতঃ আচারে না হউক বিচারে ভারতবাসী কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি অপরধর্ম্মাবলম্বী হইতে যেন এখন পূর্ব্বের ন্যায় আর সম্পূর্ণ পৃথগ্‌দিগ্‌বর্ত্তী নহেন।

রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম যখন এখনকার মত এত দূর প্রসারিত হয় নাই, সেই সময়ে আর দুইটি শক্তি বঙ্গসমাজে ব্রাহ্মসমাজ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বপ্রভাব প্রকাশ করিতেছিল। এই দুই শক্তির একটি শক্তি (কুমার) কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতা-সূত্রে ও অপরটি স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সংবাদপত্রসূত্রে অনেক বাঙ্গালীর অন্তরে অভিনব ভাবের উদ্‌ভব করিতেছিল। এ কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে উক্ত দুই ব্যক্তিকেও পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষগণের সমশ্রেণিক বলিয়া বর্ণন করা হইতেছে। তবে একথা নিশ্চিত যে উক্ত মহাত্মদ্বয় বঙ্গের নবযুগ গঠনে কিয়দংশে সহায়ক বটে।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় একজন কৌমার্য্য ব্রতধারী ধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদ্যবংশীয় যুবক। তিনি তাঁহার প্রথম উদ্যমে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে নানাস্থানে বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল হৃদয়োন্মাদক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে শিক্ষিত যুবকসমাজ ব্রাহ্মশক্তির অনুসরণ করিতে করিতে সহসা অর্দ্ধপথ হইতে যেন আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে অনেক শিক্ষিত যুবককে মাথায় শিখা রাখিতে, ত্রিসন্ধ্যা অর্চ্চনা করিতে এবং হিন্দুর শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যাদি পরিহার করিতে দেখা যাইতে লাগিল। এ ভাব অকৃত্রিম বা স্থায়ী না হইলেও কাল-প্রবাহ যে দিকে ছুটিতেছিল, কিয়ৎপরিমাণে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়।

সম্ভবতঃ ইহাতে সবিশেষ পরিবর্ত্তনই ঘটিত, কিন্তু কিছুদিন বক্তৃতাদ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া প্রশংসিত সেন মহাশয় কাশীধামে এক মঠ স্থাপন করিয়া কৃষ্ণানন্দস্বামী নামধারণ পূর্ব্বক স্বয়ং সেই মঠস্বামী হইয়া বসিলেন। এই সময়ে, শুনা যায়, অনেক ব্রাহ্মণকেও তিনি অবাধে নিজ পদধূলি গ্রহণ করিতে দিতেন এবং নানাবিধ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য কবিতেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি অনেকেরই শ্রদ্ধার লাঘব হইতে থাকে। ফলতঃ এই হইতেই সমাজ ইহা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। অবশেষে ইনি কুৎসিতকর্ম্মা বলিয়া অনেকেরই অশ্রদ্ধাভাজন হন, এবং নানারূপ অবমাননা ও ক্লেশভোগ করিয়া কিয়ৎকাল পরেই কালগ্রাসে পতিত হন। পরিণাম-রক্ষা না হইলেও ইহার প্রারম্ভ বড়ই প্রশংসার্হ ও শুভসূচক হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

বঙ্গসমাজে যখন একদিকে কৃষ্ণপ্রসন্নের শক্তি অবাধে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে সেই সময়ে অপরদিকে ঐ শক্তিরই অনুরূপ আর একটি শক্তি প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সংবাদপত্র-পবিচালক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুই এই শক্তির সঞ্চাবক।

দশম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও শরৎবাবুর ব্যবসায়।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের পিতার নাম মাধবচন্দ্র বসু, নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড় গ্রামে। সন ১২৬১ সালের ১৬ই পৌষ তারিখে উক্ত জেলার ইলসরা গ্রামে মাতুলালয়ে যোগেন্দ্রের জন্ম হয়। প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায় পরে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ইহার বাল্যশিক্ষা। পরে এফ, এ, পরীক্ষা দিয়া ইনি জনাই স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। প্রতিভা সাধারণতঃ পরাধীনতাপ্রিয় নহে, সুতরাং চাকরিতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের মন ধরিল না, চাকরি ছাড়িয়া দিলেন। এই সময়ে তিনি মেলেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত কটক প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে এলাহাবাদে আসিয়া আইন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তথা হইতে আসিয়া চুঁচুড়ায় 'সাধারণী' নামক সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক হইলেন। এইবার তাঁহার প্রতিভার দিঙ্‌নিরূপণ হইল।

এই সময়েই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরিচয়, এবং সম্ভবতঃ এই সময়েই তাঁহার অন্তরে অল্পমূল্যে একখানি দেশীয় সংবাদপত্র প্রচারিত করিবার সঙ্কল্পোদয়। অতঃপর যোগেন্দ্রবাবু সন ১২৮৭ সালে কলিকাতায় আসিয়া 'বঙ্গবাসী' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারিত করিলেন।

প্রথমতঃ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার লিখন-পদ্ধতি পাশ্চাত্য ভাবানুযায়ী ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই 'বঙ্গবাসী' আপনাকে গোঁড়া হিন্দু এবং হিন্দুসমাজের মুখপাত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। তদবধি যোগেন্দ্রবাবু এই কাগজখানিকে হিন্দুসাধারণের পাঠোপযোগী করিয়াই ছাপিতে লাগিলেন।

বাঙ্গলা ভাষায় দুই পয়সা মূল্যে এত বড় সংবাদপত্র যোগেন্দ্রবাবুই সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত করেন। 'বঙ্গবাসী'র যেরূপ প্রসার হইল, পূর্ব্বে দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে কোন পত্রেরই এরূপ প্রসার হয় নাই। এই প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদপত্র বঙ্গসমাজে ইহার শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের বক্তৃতা ও বঙ্গবাসীর প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া বঙ্গসমাজে হিন্দুয়ানির কতকটা পুনরভ্যুদয় দেখা যাইতে লাগিল। তবে গোঁড়ামি মাত্র অশিক্ষিত দলেই

আবদ্ধ রহিল, কিন্তু শিক্ষিতসমাজে পাশ্চাত্য জ্ঞানানুশীলন, ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা, উপরিউক্ত বক্তৃতাদি শ্রবণ, 'বঙ্গবাসী'পাঠ এবং রামকৃষ্ণধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি ব্যাপার একত্র সমভাবে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তন করিতে লাগিল।

'বঙ্গবাসী' গোঁড়ামিই প্রকাশ করুন বা ব্যবসাদারিই করুন, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় যে তদ্দারা বঙ্গসমাজের অশেষ উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগেন্দ্রবাবু সংবাদপত্র পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে সটীক ও সানুবাদ সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং অন্যান্য বহুবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া যে আমাদের জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে সবিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহার অনুকরণেই ইদানীং অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় অল্পমূল্যের বৃহৎ সংবাদপত্র ও অনেক প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর হইতে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে কুৎসিত ভাষায় পরনিন্দাপ্রচারের কুপ্রথা কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বঙ্গবাসীর অভ্যুদয় হইতে পুনর্ব্বার উহার প্রবর্ত্তন দেখা যায়। মত-বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তির প্রতি 'কুলাঙ্গার' 'নরাধম' প্রভৃতি কটূক্তি করা নিশ্চিতই অভদ্রতার পরিচয়। বঙ্গবাসী এরূপ কটূক্তিবর্ষণে বড়ই পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। এই আদর্শে অনেক দেশীয় সংবাদপত্রই ভদ্রতার সীমালঙ্ঘনে সাহসী হইয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রবাবু প্রকৃতই একজন সুলেখক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, পরগ্লানিকর বা রসিকতাসূচক রচনাতেই ইঁহার সবিশেষ পটুতা। বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যোগেন্দ্রবাবুর সহিত যোগ দিয়া, ইংরাজী 'পঞ্চ্' পত্রের অনুকরণে 'পঞ্চানন্দ' নাম দিয়া বঙ্গবাসীতে উপহাস-পরিহাসাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। একদিকে এই হইতেই 'বঙ্গবাসী' পত্রের অধঃপতন, অপর দিকে ইহা হইতেই তাহার প্রসারবৃদ্ধি। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তিগণের নিকট বঙ্গবাসীর ঐ সকল বাচালতা অধিকাংশেই বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ঐ পত্রের প্রকৃত মর্য্যাদার লাঘব হইল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অনেক অর্ব্বাচীন অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রলোক এবং দোকানী পসারী প্রভৃতির ইহাতে বড়ই আমোদ অনুভব হইতে লাগিল, সুতরাং উহার গ্রাহকসংখ্যা ও আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ইন্দ্রবাবুর সহযোগিতায় যোগেন্দ্রবাবু বঙ্গদেশে হিন্দুয়ানির একজন প্রধান পাণ্ডা হইয়া উঠিলেন। পসার-পসারও তাঁহার দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া অনেক বাঙ্গালী যেন হিন্দুয়ানির দিকে ঝোঁক দিলেন। কিন্তু এই হিন্দুয়ানির লক্ষণ মাত্র স্নানাহ্নিক তর্পণ চণ্ডীপাঠ জাতিবিচার খাদ্যবিচার— আচারে যেরূপই ঘটুক,—আর চূড়ান্ত লক্ষণ অহিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ,—সুযোগমতে বা গালিবর্ষণ! কিন্তু সে যাহা হউক, যোগেন্দ্রবাবু বহুপরিশ্রমে বহু অর্থব্যয়ে বহুসংখ্যক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া দেশের যে ভূরিকল্যাণ সাধন করিয়াছেন, এবং দেশীয় সংবাদপত্রের যে আশাতীত উন্নতি বিধান করিয়াছেন, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই উদ্‌যোগী কর্ম্মকৌশলাভিজ্ঞ পুরুষ সন ১৩১২ সালের ২রা ভাদ্র তারিখে পরলোক গমন করেন।

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রতিভা যে কেবল সাহিত্য বা সংবাদপত্রেই প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং মাত্র ঐ দুই ক্ষেত্রেই যে তিনি দেশের উপকারক হইয়াছিলেন তাহা নহে, ব্যবসায়কার্য্যেও তিনি সুচতুর ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চতুরতা যে সর্ব্বতোভাবেই সাধুত্বসঙ্গত, এবং সর্ব্বাঙ্গবিচারে পরিণামে উহাতে যে তিনি যথার্থই লাভবান্ হইয়াছিলেন, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। তবে, বঙ্গদেশে বিজ্ঞাপনমূলক ব্যবসায়, সাহিত্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংবাদপত্র ও তথাভিহিত হিন্দুয়ানির প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে যোগেন্দ্রবাবু যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও সফলতালাভ করিয়াছিলেন এ বিষয় নিঃসন্দেহ।

আমাদের শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ও কিছুদিন চাকরী করিবার পর, তদুপায়ে সংসারের অভাবমোচন ও বৃদ্ধপিতার সম্যক্ সেবাশুশ্রূষাবিধান অসাধ্য দেখিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তখন একে তরুণবয়স্ক, ব্যবসায়কার্য্যে ত একেবারেই অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার অর্থহীন; এ অবস্থায় এরূপ সঙ্কল্প যুক্তিসঙ্গত কি না, এ বিষয়ের পরামর্শই বা কাহার সহিত করিবেন? সংসারে প্রধান সহায়, অভিভাবক, আশাভরসাস্থল ও পরামর্শদাতা আছেন পিতা, তিনি ত সদাই উদাসীন; গৃহী বলিলেও হয়, ফকির বলিলেও হয়। দারিদ্র্যকষ্টে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, আর্থিক উন্নতিতে আর স্পৃহা নাই, তাঁহার অহরহঃ আকিঞ্চন কেবল ভগবৎ-কৃপালাভে। উহাই তাঁহার ইহপরত্র সর্ব্বাপৎ-প্রশামক সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ পরমপুরুষার্থ বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস। সুতরাং শরৎবাবু পিতার নিকট আপাততঃ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মাতার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

জননী গঙ্গামণি দেবী বহুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে কোন এক আত্মীয় ভদ্রলোকের নিকট দুইশত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। পরে ঐ ভদ্রলোকের আর্থিক

অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হওয়ায় তিনি এতাবৎকাল ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে পারেন নাই, দয়াবতী ব্রাহ্মণকন্যাও আর তদ্‌বিষয়ে কাহারও নিকট কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। সম্প্রতি—বোধ হয় শরৎবাবুর সৌভাগ্যক্রমেই,—উক্ত ভদ্রলোক কোন উপায়ে ঐ দুইশত টাকা সংগ্রহ করিয়া শরৎবাবুর জননীকে পুনঃ প্রদান করিয়া গেলেন। শরৎবাবু এ বিষয় কিছুই জানিতেন না। তিনি মাতার নিকট ব্যবসায়কার্য্য অবলম্বনের প্রস্তাব করিলে, পুত্রবৎসলা জননী পুত্রকে তদ্‌বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়া ব্যবসায়ারম্ভের নিমিত্ত উপরিউক্ত দুইশত টাকা দিতে চাহিলেন।

তখন শরৎবাবুর চিন্তা উপস্থিত হইল,—কি ব্যবসায় করি? ভদ্রসমাজে হেয় না হইতে হয়, সাধুতার সীমা অতিক্রমণ করিতে না হয়, পিতার পবিত্র নামে কলঙ্ক না হয়, এরূপ কি ব্যবসায় হইতে পারে?—কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ধীরে ধীরে একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শরৎবাবুর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া কহিলেন,—শরৎ, তুমি পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন কর, ইহাতে ইচ্ছা করিলে মান সম্ভ্রম ভদ্রতা ও সাধুত্ব সকলই রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, এবং বুঝিয়া চলিতে পারিলে লাভবান্‌ও হইতে পারিবে। তুমি আপাততঃ যে টাকা সংগ্রহ করিতে পার তাহা লইয়াই কার্য্য আরম্ভ কর, আমি সংস্কৃত-প্রেস্‌-ডিপজিটরিতে বলিয়া দিব, তথা হইতে তুমি একশত টাকা মূল্যের পুস্তক অগ্রিম পাইতে পারিবে; ঐ পুস্তক বিক্রয় করিয়া ঐ একশত টাকা পরিশোধ করিয়া দিলে পুনরায় আর একশত টাকার পুস্তক পাইবে।

শরৎবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ আশ্বাস বাক্য শুনিয়া একেবারে যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন!

রামতনু বাবুর পরিবারবর্গের এই দারিদ্র্যদশা ও তাহার বিমোচনার্থে শরৎবাবুর এইরূপ শ্লাঘনীয় আকিঞ্চনের কথা স্মরণ করিলে সহজেই মনে হয়, তখন বুঝি গুণগ্রাহী বা পরোপকারী লোক এখনকার মত এত অধিকসংখ্যক ছিলেন না, তাই রামতনু বাবুর ন্যায় দেবোপম ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে দারিদ্র্যপীড়নে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, আর শরৎবাবুর ন্যায় সাধুপুত্র পিতৃক্লেশ বিমোচনার্থ বৃথা দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

কিন্তু সে অনুমান একান্তই ভ্রান্তিমূলক। এখনকার মত তখন এত পরোপকার-সাধিনী সভাসমিতি স্থাপিত হয় নাই বা কৃত্রিম উপচিকীর্ষাবৃত্তিধারী

ব্যক্তিও কার্য্যক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় অবতীর্ণ হন নাই বটে, কিন্তু সহৃদয় দয়াবান্ ধনবান্ মহাজন তখনও দেশে অনেকেই ছিলেন। তবে, কে কাহার দিকে ফিরিয়া চায়? মরিয়া গেলে অনেকের জন্যে অনেকে অশ্রুপ্রবাহে ধরাতল অভিষিক্ত করেন, শোকপ্রকাশের সভাসমিতি করেন, প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত লক্ষমুদ্রাসংগ্রহার্থ গলায় ঝুলি বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে শ্লাঘাসূচক আনন্দের ভিক্ষা মাগিয়া থাকেন, সে ঝুলিতে তখন অনেকের অনেক বদান্যতাবৃষ্টিও হইয়া থাকে, কিন্তু বিপন্ন নিরীহ নিরন্নের ঝুলি অনেক সময়ে মাত্র নয়নাসারেই সিক্ত হয়, মুষ্টিভিক্ষাও মিলে না! সহানুভূতির হস্তে তীরোত্তীর্ণের সিক্ত গাত্র জলমুক্ত করিতে লোকাভাব হয় না, কিন্তু অগাধে পতিত আকুল অভাগ্যবানের দিকে দৃক্পাত করিতেও জগৎ যেন জনশূন্য হইয়া যায়! এ দোষ আত্মকৃত নহে, পরকৃতও নহে; ইহা মঙ্গলময়েরই মঙ্গলবিধান, প্রকৃত মঙ্গলই ইহার প্রকৃষ্ট পরিণাম;—'হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা'!—সেই বিচক্ষণ বিশ্ব-কর্ম্মকার বাস্তবিকই 'পুড়িয়ে সোণা পিটিয়ে করেন খাঁটি।'

সাধু সুকৃতিমান্ শরৎকুমার ইদানীং তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার পরিচয় কহিতে কহিতে কখন কখন প্রাণের আবেগে ব্যক্ত করিয়াছেন,—'ভাই, এই কলিকাতা সহরে আমাদের যখন বড় কষ্ট, বৃদ্ধ অসুস্থ পিতাকে একটি স্বাস্থ্যকর ভবনে বাস করাইতে বা তাঁহার সেবনার্থ একটু দুগ্ধ ক্রয় করিতেও যখন আমার ক্ষমতায় কুলাইত না, সেই সময়ে আমি রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে দু'ধারের দিব্য অট্টালিকাশ্রেণী দেখিয়া নিতান্তই দুঃখিত চিত্তে এই বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতাম,—হায়, আমার দরিদ্র বৃদ্ধ মাতাপিতাকে একদিনের তরেও এইরূপ একটী অট্টালিকাভবনে বাস করাইতে পারিলাম না!

আবার পরক্ষণেই মনে হইত,—ছি ছি! আমি পরসৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইতেছি! ভিখারী হইয়া রাজোচিত বিলাসোপভোগের বাসনা করিতেছি!

ধন্য শরৎকুমারের অপূর্ব্ব ঈর্ষা! ধন্য তাঁহার এই আদর্শনীয় বিলাসবাসনা!

দরিদ্র ভদ্রসন্তানের সেই সুদীর্ঘ হৃদয়োচ্ছ্বাস যে রাজরাজেশ্বরের স্বর্গসিংহাসন পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, স্বল্পদিন পরেই তাহা সুস্পষ্ট সপ্রমাণ!

বস্তুতঃ শরৎবাবু অচিরেই প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া হারিসন্ রোডের পার্শ্বে চতুস্তল অট্টালিকাভবন নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে তথায় রাজোচিত পরিচর্য্যায় শান্তসুস্থ দেখিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন।

শুভক্ষণে শরৎকুমার চাকরী ছাড়িয়া পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন! কিন্তু পুত্রের এরূপ বৃত্তি অবলম্বন সাধুশিরোমণি রামতনু বাবুর আপত্তিজনক না হইলেও যেন ঠিক মনঃপূত হয় নাই। এই ব্যবসায়ের উদ্যমে তিনি একদিন পুত্রকে একান্তে কহিয়াছিলেন,—শরৎ, পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায় আরম্ভ করিবে বটে, কিন্তু উহাতে সাধুতা রক্ষা হইবে কি?

শরৎবাবু উত্তর করিলেন,—কেন বাবা, আমি উচিত মূল্যে পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিয়া, উচিত মূল্যে বিক্রয় করিব, ইহাতে আমার অসাধুতা হইবে কিসে?

ঈষৎ হাসিয়া বৃদ্ধ কহিলেন,—"উচিত মূল্যে কিনিয়া উচিত মূল্যে বেচিলে লাভ হইবে কোথা হইতে? লাভ করিতে হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই উচিত মূল্যে কিনিয়া অনুচিত মূল্যে বেচিতে হইবে, অথবা অনুচিত মূল্যে কিনিয়া উচিত মূল্যে বেচিতে হইবে। একথা আপাততঃ অনেকের নিকট উপহাসকর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চিত জানিও, ঈশ্বরের তুলাদণ্ডে ন্যায়ের পরিমাণপরীক্ষা ইহা অপেক্ষাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপই হইবে।"

শরৎবাবু নিরুত্তর অধোবদন! পিতৃদেব পুত্রকে সান্ত্বনাপ্রদান করিয়া কহিলেন,—আচ্ছা, যাও যাহা করিতেছ কর, তবে এইটা ঠিক রাখিও, যেন কথায় বা কার্য্যে কখন কাহাকেও প্রতারিত করিও না।

পিতার এই উপদেশটি সাধুপুত্র শরৎকুমারের ব্যবসায়কার্য্যের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে একখানি পুস্তকের দোকান খুলিলেন, মূলধন অতি অল্প, নগদবিক্রয় সামান্যমাত্র, ভরসা কেবল মফস্বলে বিক্রয়; তাহার উপায় মাত্র সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন,—সে ত কেবল টাকার খেলা! দরিদ্র শরৎকুমার তত টাকা কোথায় পাইবেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বনামধন্য পুত্র মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার 'বেঙ্গলী' নামক ইংরাজি সংবাদপত্রে শরৎবাবুর নবপ্রতিষ্ঠিত 'এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং' নামক পুস্তকালয়ের বিজ্ঞাপন স্বল্পমূল্যে প্রকাশিত করিবেন বলিয়া ভরসা দিলেন, এবং নানারূপ প্রবোধবাক্যে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। বস্তুতঃ সুরেন্দ্রনাথের এই সদাশয়তাই শরৎকুমারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সম্প্রবোধক হইল। সেই হইতে শরৎবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সমুচিত কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে

ক্রটী করেন নাই, সুরেন্দ্র বাবুও সেই অবধি শরৎকুমারের শুভানুধ্যানে বিরত হন নাই।

'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র তখন সাপ্তাহিক ছিল, কিন্তু তখন ইহাতে সুরেন্দ্র বাবুর স্বরচিত প্রবন্ধ অনেক প্রকাশিত হইত বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ে ইহার আরও সমাদর ছিল, গ্রাহকগণ সাগ্রহে উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎবাবুর বিজ্ঞাপন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল।

মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি তখন দেশীয় শিক্ষিত সমাজের নবানুরাগ। তিনি তখন দেশের অনেকেরই অন্তরে ইষ্টদেবাসনে সমাসীন। সুতরাং তাঁহার নামসংস্পৃষ্ট বা তাঁহার পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত যাহা কিছু তাহার প্রতিই যেন দেশের লোকের সবিশেষ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ তখন দেশের কাণে কাণে যে মন্ত্র কহিতেছিলেন, সে মন্ত্র এখন অনেকাংশে পুরাতন হইলেও তখন সম্পূর্ণ নূতন।

সেই নূতন মন্ত্রের নূতন দীক্ষা-গুরু, ভারতগৌরব—

(একাদশ পরিচ্ছেদ।)

—মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

—কলিকাতা তালতলার অসাধারণ প্রতিভান্বিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে ইঁহার জন্ম। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিয়াই শিক্ষালাভ করেন, এবং ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতার অনুমতি-ক্রমে সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ঐ বৎসরেই বিলাত যাত্রা করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারিলাল গুপ্তও সুরেন্দ্র নাথের সহিত একই উদ্দেশ্যে একই যাত্রায় যাত্রিক হন।

যথাকালে তিনজনেই প্রতিষ্ঠার সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেও সুরেন্দ্রনাথের বয়স লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় তিনি আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। বিলাতে বয়সের মামলা উঠিবার পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথের নাম সিবিলসার্বিস্ তালিকাভুক্ত করা হইল, পরে ১৮৭১ খৃঃ

অব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইনি সিলেটের আসিষ্টাণ্ট্ মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল পরে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে আদালতের নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করার অপরাধে কর্ম্ম হইতে অপসারিত করেন।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে মাসিক ২০০৲ দুই শত টাকা বেতনে মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসনে ইংরাজি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে ১৮৮১ খৃঃ অব্দে তিনি ফ্রি চর্চ্চ্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে প্রধান সাহিত্যাধ্যাপকরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহার পর বৌবাজারে স্বয়ং একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া তথায় অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই বিদ্যালয়ই কালে রিপণ-কলেজ নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সুরেন্দ্রবাবু 'বেঙ্গলী' নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া স্বয়ং উহার সম্পাদক হইলেন। ইদানীং এই পত্র ইঁহারই সম্পাদকতায় দৈনিকরূপে পরিচালিত হইতেছে।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা মিউনিসিপাল সভার সদস্যরূপে প্রবিষ্ট হন, ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে উহার প্রতিনিধিস্বরূপে ছোটলাটের ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশ লাভ করেন, এবং ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে যখন উক্ত সভায় নূতন মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয়, তখন ইনি তাহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। অতঃপর ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে সুরেন্দ্রনাথ ও তৎসহ অন্যান্য ২৭ জন সদস্য মিউনিসিপাল সভার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্রে তৎকালীন হাইকোর্ট্-জজ মাননীয় নরিস্ সাহেবের আচরণ সম্বন্ধে তীব্র দোষারোপ করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ইতঃপূর্ব্বে নরিস্ সাহেব একটি মোকদ্দমায় বাদীপ্রতিবাদী উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে শালগ্রামশিলা আদালতে লইয়া আসিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। এই সূত্রে একখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, নরিস্ সাহেবের স্বেচ্ছাচারিত্ব হেতুই শালগ্রামশিলা আদালতগৃহে আনীত হইয়াছে। বাঙ্গলা পত্রের এই অমূলক উক্তি অবলম্বনেই সুরেন্দ্র বাবু নরিস্ সাহেবের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত করেন। ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথ এই হেতু আদালতের অবমাননা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের বিচারে দুই মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারা-দণ্ডভোগ করেন।

সুরেন্দ্রনাথই ভারতে (National Congress) জাতীয় সম্মিলনী নামক সমিতি স্থাপনের প্রধান উদ্‌যোক্তা। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে এই সমিতির প্রথম

অধিবেশন। পরে যখন ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে পুনা নগরে উহার একাদশ অধিবেশন এবং ১৯০২ খৃঃ অব্দে আমেদাবাদে অষ্টাদশ অধিবেশন হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথই উহার সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে Royal Commission on India Expenditure নামক সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্যপ্রদানচ্ছলে সুরেন্দ্রবাবু অপূর্ব্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং প্রধানতঃ ইঁহারই আন্দোলনের ফলে জুরি নোটিফিকেশনের প্রত্যাহার হইয়াছিল। মহামতি লর্ড কর্জ্জনকৃত বঙ্গবিভাগ ব্যাপারের প্রতিবাদে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সুরেন্দ্রবাবুই তাহার একজন প্রধান অধিনায়ক।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালে একটি প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন-উদ্যোগ হয়, সুরেন্দ্রনাথ এবং অপরাপর অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি ঐ উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হন। সহসা স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে অধিবেশন বন্ধ হইল। অতঃপর তাঁহারা যখন অভিযানে বহির্গত হইয়াছেন, সেই সময়ে সুরেন্দ্রবাবু পুলিস্ কর্ত্তৃক সহসা ধৃত হইয়া আদেশ-অবজ্ঞার অপরাধে অভিযুক্ত ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু হাইকোর্ট সুরেন্দ্রনাথকে নিরপরাধ বলিয়া অব্যাহতি দেন।

গত ৩৫ বৎসর ধরিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেশের ও দশের হিতার্থে যেরূপ ভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, ভারতবাসী অপর কেহ কোন দিন অনন্যকর্ম্মা হইয়া এরূপ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। সুরেন্দ্রবাবুর মনে দৃঢ় সংস্কার এই যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বস্তুতঃ নিঃস্বার্থ ন্যায়নিষ্ঠ; কর্ত্তৃপক্ষায় রাজপুরুষগণকে দশের অভাব ও অভিযোগ সবিশেষ বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাঁহাদের কর্ত্তৃক ইষ্ট বই অনিষ্ট কখনই ঘটিতে পারে না। অতএব যে কোন বিষয়েই হউক, আমাদের অসুবিধা ও আশঙ্কা হইলেই তাহার মোচনের নিমিত্ত সকলে সমবেত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিলে, বিচক্ষণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কখনই বধির হইয়া থাকিবেন না। এই সংস্কারই সুরেন্দ্রনাথের সর্ব্বানুষ্ঠানের উদ্দীপক হেতু।

সুরেন্দ্রবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী যাহা প্রদত্ত হইল, তাহাতে মাত্র তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলীরই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সমাজের উপর তাঁহার প্রভাবের বিষয় কিছুই বর্ণিত হয় নাই। ধর্ম্মবিষয়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যেরূপ জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক শিক্ষিত সমাজের অন্তর্ভাব গঠিত করিয়াছেন, মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথও সেইরূপ জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক রাজনৈতিক বিষয়ে সাধারণতঃ শিক্ষিত সমাজের অন্তর্ভাব গঠিত

করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ দুই এক জন দেশীয় মনস্বী ব্যক্তি কোন কোন বিষয়ে মাননীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু একদিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ অপর দিকে দেশীয় জনসাধারণের চক্ষুরুন্মীলন করিবার শক্তি বাঙ্গালীর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় আর কাহারও ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

সুরেন্দ্রবাবু যখন মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক, সেই সময় হইতেই যুবক ছাত্রগণের সহিত তাঁহার সবিশেষ সদ্‌ভাব সংস্থাপিত হয়। তিনি ছাত্রগণকে লইয়া নানাস্থানে সভা করিয়া ইংরাজিতে বক্তৃতা করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ যেমন প্রিয়দর্শন প্রফুল্লমূর্ত্তি সহাস্যবদন সুপুরুষ, তেমনই মিষ্টভাষী অথচ স্পষ্টবক্তা, তেজস্বী অথচ শিষ্টশান্ত সুবিনীত। সরল ও সরস ভাষায় বক্তৃতা করিবার শক্তিও তাঁহার অপূর্ব্ব। ছাত্রগণ ও শিক্ষিত যুবকগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সহজেই বিমোহিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি প্রথমতঃ বালকগণ লইয়া বালক্রীড়াচ্ছলে সাধারণের অজ্ঞাতসারেই যেন কি এক অপূর্ব্ব নবযুগের অনুক্রমণিকা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্র শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যেন মন্ত্রচালিতবৎ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। কি বক্তৃতায় কি সংবাদপত্র-প্রবন্ধে, রাজনৈতিক ব্যাপারই তাঁহার প্রধান আলোচ্য। বলিতে গেলে আধুনিক বঙ্গসমাজ প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথ হইতেই রাজাপ্রজা সম্বন্ধীয় ব্যাপারের সমালোচনা করিতে শিখিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষও রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়া বক্তৃতাদান ও প্রবন্ধাদি প্রচার করিতেন বটে, কিন্তু উদারপ্রকৃতি ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের রাজত্বে প্রত্যেক প্রজারই যে ন্যায়ানুমোদিতরূপে রাজকার্য্যাকার্য্যের পর্য্যালোচনা প্রতিবাদ ও প্রতীকার-প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে, এবং ন্যায়পরায়ণ দয়াবান্ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রজামণ্ডলীর আর্ত্তনাদ ও অভয়-প্রার্থনা শুনিতে সতত উৎকর্ণ ও ন্যায়ানুমোদিত অভয়প্রদানে সতত অগ্রহস্ত, একথা জনসাধারণকে কেবল সুরেন্দ্রবাবুই বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সমবেতভাবে ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ ও প্রতীকার-প্রার্থনা করিতে শিক্ষিত সমাজকে তিনিই শিখাইয়াছেন, সমগ্র বাঙ্গালীদলকে জাত্যাকারে

গঠিত করিয়া একটি বাঙ্গালী শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথই করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা—কালে ফলবতী হউক আর নাই হউক,—সবিশেষ প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। বাস্তবিকই এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ আমাদের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ও সর্ব্বপ্রধান যুগাবতার!

সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি দেশবাসী জনসাধারণের অনুরাগ ক্রমশঃ এরূপ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি যখন আদালতের অবমাননা অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, তখন কলিকাতা-সহরে ও মফস্বলের নানাস্থানে তাঁহার সেই বিপৎপাত জন্য দুঃখপ্রকাশের নিমিত্ত সভা সমিতি বসিতে লাগিল, হাটে মাঠে ঘাটে পথে সুরেন্দ্রনাথের নামই যেন সকলের জপমালা হইল, বালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার এই বিপদ্‌কে দেশের বিপদ্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সুরেন্দ্রবাবু সমগ্র দেশকে যেরূপ একতাবন্ধনে—জাতীয়তার বন্ধনে বাঁধিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, দৈবনির্ব্বন্ধে তাঁহার এই কারাবন্ধনেই সে প্রয়াসের সফলতা সপ্রমাণ হইল। সমগ্র বঙ্গ—সমগ্র ভারত সে সময়ে যেন একধ্যান একপ্রাণ হইয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। একলোকের জন্য—একই উদ্দেশ্যে দেশের কোটি কোটি লোক একই কালে একই ভাবে উজ্জীবিত হইবার দৃশ্য সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস-কল্যাণে এই আমরা নূতন দেখিলাম, তাঁহারই কল্যাণে এ শিক্ষা এই আমরা নূতন শিখিলাম! যদি কেহ আশা করিয়া থাকেন যে, কারাবন্ধনে সুরেন্দ্রনাথকে খর্ব্ব হইতে হইবে, তবে তাঁহার সে আশার বিপরীত ফলই ফলিয়াছে। কারাবন্ধনে সুরেন্দ্রনাথের শক্তি যেন শতমুখী হইয়া সমগ্র দেশে সঞ্চারিত হইল!

এ দেশে এমন কোন সাধারণ হিতকর রাজনৈতিক সভাসমিতি নাই যাহার সহিত সুরেন্দ্রনাথ কোন না কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট নহেন। লর্ড্ কর্জ্জনের শাসন সময়ে বঙ্গব্যবচ্ছেদ-উপলক্ষে এ দেশে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই আন্দোলনের পর সুরেন্দ্রনাথ পুনর্ব্বার বিলাতযাত্রা করেন। তথায় গিয়া তিনি তত্রত্য রাজনৈতিক সমাজে এরূপ ওজস্বিনী ভাষায় সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন, যে ঐ বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং অনেকেই তাঁহাকে বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় বাগ্মী এডমণ্ড্ বার্কের সমতুল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ এখনও জীবিত। বৃদ্ধ হইলেও এখনও তিনি শতযুবকের উৎসাহ-

উদ্যমসম্পন্ন। এখনও তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে সমভাবেই অবিশ্রাম অগ্রসর হইতেছেন। ধন্য জীবন! ধন্য অধ্যবসায়!

এই মহাপুরুষের অভ্যুদয়কাল হইতেই যেন বঙ্গে ক্ষত্রিয়বীর্য্যের পুনর্জ্জাগরণের সূচনা অনুভূত হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর জিতেন্দ্রনাথ ব্যায়ামাদি দ্বারা এরূপ শারীরিক বলোন্নতি করিয়াছিলেন যে, সে সময়ে বাঙ্গালী যুবকগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় বলবান্ পুরুষ আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ তৎকাল হইতে শারীরিক বলচর্চ্চার প্রতি বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে অনেকের আগ্রহ জন্মে। 'অম্বু গুহ' নামক একজন কলিকাতাবাসী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ যুবক এই সময়ে নিজভবনে একটি কুস্তির আখ্ড়া খুলেন। অম্বু বাবু যেমন বলশালী, ব্যায়ামেও তাঁহার তেমনই নৈপুণ্য, আর্থিক অবস্থাও উত্তমরূপ।

অনেক বাঙ্গালী যুবক তাঁহার আখ্ড়ায় গিয়া প্রত্যহ রীতিমত কুস্তি লড়িতেন। অম্বু বাবু স্বয়ং, এবং বেতন দিয়া পালোয়ান রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারা, এই সকল যুবককে ব্যায়ামশিক্ষা দিতেন। শারীরিক বলোন্নতি হইলে অনেকে একটু অসহিষ্ণু অশান্ত ও উদ্ধতস্বভাব হইয়া থাকেন, কিন্তু অম্বু বাবু ও তাঁহার সাক্রেৎগুলির বিশিষ্ট গুণ এই ছিল যে, তাঁহারা বড়ই শিষ্টশান্ত ক্ষমাপরায়ণ ও বিনয়ী। তাঁহারা বলদৃপ্ত হইয়া কখন কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অশিষ্ট ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলে তাঁহারা যথাশক্তি তাহার পরিত্রাণে প্রয়াস পাইতেন; দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার দেখিলেই তাঁহারা তাহা নিবারণ করিতে যত্নবান্ হইতেন।

এই সময়ে অনেক বঙ্গীয় যুবকের মনে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্তও প্রবৃত্তি জন্মে। আধুনিক বাঙ্গালীগণের মধ্যে স্বর্গীয় সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আমেরিকায় গিয়া সৈনিকদলে প্রবেশ লাভ করেন, এবং সমরক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস।

বাঙ্গালী বীর কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের পিত্রালয় নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের সাত ক্রোশ পশ্চিমে নাথপুর গ্রামে। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে রাণাঘাটে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম, পিতার নাম গিরিশ চন্দ্র বিশ্বাস। গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া কেরাণীগিরি করিতেন।

সুরেশ বাল্যকালে যুদ্ধ দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি বিষয়ের গল্প শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন, নিজেও অত্যন্ত সাহসী নির্ভীক ও দৈধকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সমবয়স্ক বালকগণকে লইয়া তিনি অনেক সময়ে ক্রীড়াচ্ছলে কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেন। স্থানীয় নীলকর সাহেবগণ সুরেশের অসম সাহসিকতা দেখিয়া তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন।

অতঃপর সুরেশচন্দ্র কলিকাতা লণ্ডন মিশন সোসাইটির বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে উক্ত সোসাইটির মিশনারিগণের সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ও আনুগত্য জন্মে।

সুরেশচন্দ্রের পিতা একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। একে বিদ্যাভ্যাসে সুরেশচন্দ্রের তাদৃশ মনোযোগ ছিল না, তাহাতে আবার খৃষ্টিয়ানগণের সহিত তাঁহার বিশিষ্ট-রূপ ঘনিষ্ঠতা, সুতরাং পিতাপুত্রে অধিক কাল সদ্ভাব রহিল না। সুরেশচন্দ্র পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া উপরিউক্ত বিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ আষ্টন্ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং অচিরেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

অতঃপর খৃষ্টিয়ান বাঙ্গালী-বালক সুরেশচন্দ্র চাকরীর চেষ্টায় মাদ্রাজ ও রেঙ্গুনে গমন করেন, কিন্তু মনোমত চাকরী না মিলায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ইংলণ্ডগামী একখানি জাহাজে সহকারী ষ্টুয়ার্ডের পদে নিযুক্ত হইয়া বিলাতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ মাত্র।

তিনি বিলাতে গিয়া প্রথমতঃ সংবাদপত্র বিক্রয়, পরে কুলীগিরি করিয়া অতিকষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ইহার পর কিছুকাল বিলাতের মফস্বলে গ্রামে গ্রামে ভারতীয় নানা দ্রব্য লইয়া ফেরি করিতে লাগিলেন।

অভাবে স্বভাব-পরিবর্ত্তন ঘটে। সুরেশচন্দ্র দারিদ্র্যকষ্টে পড়িয়া সবিশেষ

বুঝিলেন যে, লেখাপড়া না শিখিলে কোন দিকেই কোনরূপ সুবিধা হওয়া সুকঠিন। তখন সেই অমনোযোগী বালক শতকষ্টের মধ্যেও মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই গ্রীক্ ও লাটিন ভাষা, এবং রসায়ন গণিত ও জ্যোতিঃশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলেন।

সুরেশচন্দ্র স্বদেশে থাকিতেই ব্যায়াম অভ্যাস করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার যথেষ্ট পটুতাও জন্মিয়াছিল। বিলাতে এক্ষণে তিনি ব্যায়ামকৌশল-প্রদর্শনার্থ একটি সরকস্ কোম্পানি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইলেন। পরে পশুদমনের কৌশল শিক্ষা করিয়া ১৮৮২ খৃঃ অব্দে একবিংশতি বর্ষ বয়সে ইনি লণ্ডনপ্রদর্শনীতে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর সুরেশচন্দ্র ক্রমান্বয়ে বিখ্যাত পশুদমনকারী জাম্‌বাক্ ও জোগ্‌কাল্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন। এই সময়ে পশুদমনকারী সম্প্রদায়ের জর্ম্মণদেশীয়া এক ভদ্রবংশীয়া যুবতী সুরেশচন্দ্রকে প্রলোভিত করায়, যুবতীর আত্মীয় স্বজনগণ সুরেশচন্দ্রের প্রাণবিনাশের সঙ্কল্প করেন। সুরেশচন্দ্র বিপদ বুঝিয়া ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে কোন একটি বৃহৎ সরকস্ কোম্পানীর অধীনে চাকরী লইয়া তাহাদের সহিত আমেরিকায় প্রস্থান করেন।

আমেরিকায় গিয়া সুরেশ প্রথমতঃ ব্রেজিল রাজ্যে ক্রীড়াপ্রদর্শন ও বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। এখানে থাকিয়া তিনি অনেক ভাষা শিক্ষা করিয়া ক্রমে সরকসের কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তত্রত্য রাজকীয় পশুশালার অধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত হইলেন।

এই সময়ে ঐ স্থানের জনৈক চিকিৎসকের কন্যার সহিত তাঁহার যথেষ্ট স্নেহানুরক্তি জন্মে এবং উক্ত সদ্‌গুণশালিনী রমণীর উপদেশানুসারেই তিনি উপরিউক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া তিন বৎসরের নিমিত্ত ব্রেজিল গবর্ণমেণ্টের অধীনে সেনানীর পদগ্রহণ করিলেন। শৈশব হইতেই সুরেশচন্দ্রের মনোবৃত্তি যে দিকে প্রধাবিত, বিধাতৃ-বিধানে এতদিনের পর তিনি সেই সমর-রঙ্গে মনের সাধ মিটাইবার অবসর পাইলেন। এ রঙ্গে তাঁহার এতই আসক্তি জন্মিল যে, নির্দ্ধারিত বর্ষত্রয় অতীত হইলে তিনি পুনরায় সৈনিক বিভাগেই কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ইত্যবসরে ১৮৯১ খৃঃ অব্দে ত্রিশ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসক-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

সৈনিক বিভাগে পুনঃপ্রবেশ করিয়া তিনি কর্পোরালের পদ হইতে উন্নীত হইয়া পদাতিক প্রথম সার্জ্জেণ্টের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে যখন ব্রেজিলের

নাবিকসৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া নাথেরয় নামক নগর আক্রমণ করিল, তখন বঙ্গবীর সুরেশচন্দ্র মাত্র ৫০টি সৈনিকের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহিদলকে পরাজিত করিলেন। এই অদ্ভুত বীরত্বকথা ব্রেজিল রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, সর্ব্বত্রই সেই সুকৃতিমান্ বঙ্গসন্তানের যশোগান গীত হইতে লাগিল। পুরস্কার স্বরূপ সুরেশচন্দ্র প্রথম লেব্‌টেনেণ্টের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

ক্রমে তিনি রাজ্য মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত বড়লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ভাষা বিজ্ঞানশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যলাভ করিলেন; অস্ত্রোপচারেও তাঁহার সবিশেষ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। সৈনিক বিভাগে তিনি ক্রমশঃ লেব্‌টেনেণ্ট্ কর্ণেলের পদে, পরে কর্ণেলের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

সামরিক কার্য্যে সুরেশচন্দ্রকে অনেক সময়ে অনেক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে ও পরাক্রমপ্রভাবে তিনি সে সমুদায় হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়াছিলেন। একবার কোন রণক্ষেত্রে যুদ্ধাবসানে তিনি স্বীয় শিবিরসম্মুখে স্বচ্ছন্দে পদচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটি দুঃখিনী রমণী আসিয়া কাতর ভাবে কহিল, "মহাশয় আজকার যুদ্ধে শুনিলাম, আমার পতির প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। তাঁহার শবদেহটি কোন্ স্থানে নিপতিত আছে, তাহা যদি আমাকে সানুগ্রহে দেখাইয়া দেন, তবে একবার জন্মের মত পতিমুখ দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ শোকনিবারণ করি।"

দুঃখিনীর করুণবাক্যে সুরেশচন্দ্রের মনে দয়ার উদ্রেক হইল; রমণীর মৃত পতির নাম শুনিয়া চিনিতে পারিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে যথার্থই সে ব্যক্তি হত হইয়াছে; তাহার মৃতদেহ তখনও রণক্ষেত্রের যে স্থানে নিপতিত ছিল তাহাও জানিলেন। কিন্তু, রমণী যে তাহার পত্নী নহে, সুরেশচন্দ্রকে ছলনা করিয়া বন্দী করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ছদ্মবেশে আসিয়াছে, সুরেশচন্দ্র তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নিঃসন্দেহে নিরস্ত্র হইয়া রমণীর সঙ্গে রণক্ষেত্রের অংশবিশেষে গিয়া মৃতব্যক্তির দেহটি যেমন দেখাইয়া দিবেন, অমনি লুক্কায়িত শত্রুসৈন্যগণ সহসা আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। তাঁহার স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ এ ব্যাপার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। সেই হইতে সুরেশচন্দ্র কিছুকাল নিরুদ্দেশ রহিলেন। অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া অনেক কৌশলে কয়েক মাসের পর শত্রুপক্ষ হইতে পলায়ন করিয়া তিনি সহসা স্বগণমধ্যে উপনীত হইলেন। সকলেই

তাঁহার পুনর্দ্দর্শনে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিল, এবং তাঁহারই মুখে তাঁহার এইরূপ নিরুদ্দেশ হইবার কারণ অবগত হইল।

এই স্থানে একটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুরেশচন্দ্র যখন আমেরিকায় ক্রমশঃ অভ্যুদিত হইতেছিলেন, ভারতে পিতা গিরিশচন্দ্র তখন গৃহসংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে রাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়া ভগবানের নাম জপ করিতেন। ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহহেতু পুত্রের প্রতি তাঁহার তেমন অনুরাগ ছিল না বা পুত্রের মঙ্গলামঙ্গলের নিমিত্তও তিনি আর চিন্তিত ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র মাত্র নিজ পারলৌকিক মঙ্গলার্থেই ভগবদারাধনা করিতেন। কিন্তু পিতৃপুণ্যে সন্তানের অভ্যুদয়, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে,—খৃষ্টিয়ান্ হইলেও সুরেশচন্দ্র আমাদের উপযুক্ত পুণ্যবান্ পিতার পুণ্যফলভাগী উপযুক্ত পুত্র।

১৯০৫ খৃঃ অব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে অকালে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে রাইওডিজেনেরো নগরে বঙ্গগৌরব বীরবর কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করেন।

এই মহাত্মা যেমন পশুদমনাদিচ্ছলে ইংলণ্ডে এবং সামরিক পরাক্রমে আমেরিকায় ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, আর এক মহাপুরুষ—আর এক যুগাবতার ঐ সময়ে সুদূর পাশ্চাত্যে ভারতের ঋষিধর্ম্ম—বেদান্তধর্ম্ম—সর্ব্বোপরি বঙ্গের শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম্ম প্রচার করিয়া বিজ্ঞানাভিমানী পাশ্চাত্যসমাজকে দিব্যজ্ঞানালোচনায় চমৎকৃত করিতেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতের ধর্ম্মসমাজে ভারতের আসন---বিশেষতঃ বঙ্গের আসন সর্ব্বোচ্চস্থানে উন্নয়ন করিতেছিলেন। এই মহাপুরুষের—এই সুমহান্ যুগাবতারের নাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বা—

(ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।)

—শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামী।

ইঁহার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান পরিচয় এই যে, ইনি দক্ষিণেশ্বর-ধামের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য। অতঃপর পরিচয়, ইনি কলিকাতা—সিমুলিয়ানিবাসী স্বর্গীয় বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র; ১৮৬২ খৃঃ অব্দের ৯ই জানুয়ারি তারিখে ইঁহার জন্ম। জননী ৺বিশ্বেশ্বরদেবের বহু আরাধনা

করিয়া এই পুত্রলাভ করেন বলিয়া ইঁহার প্রথম নাম হয় বিশ্বেশ্বর, পরে বিদ্যালয়-প্রবেশ কালে উক্ত নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া আধুনিক ধরণে নূতন নামকরণ হইল—শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নরেন্দ্রনাথ বড়ই বুদ্ধিমান্ বালক,—স্মরণশক্তিও তাঁহার যথেষ্ট; কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ বলিতে পারি না যে, তাঁহার বাল্যকালীন বুদ্ধি বা স্মরণশক্তি দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ অসাধারণ প্রতিভার নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ও ধর্ম্মপিপাসু। ইনি স্কুলকলেজে অধ্যয়ন করিয়া ক্রমান্বয়ে এণ্ট্রান্স্, এল্ এ, ও বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে ইঁহার বড়ই অনুরাগ ছিল। পঠদ্দশায় ইনি একবার দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া মহাদার্শনিক হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের নিকট পাঠাইয়া দেন। ঐ প্রবন্ধে নরেন্দ্রনাথ স্পেন্সার-প্রবর্ত্তিত দর্শন-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছিলেন। স্পেন্সার প্রবন্ধপাঠে নরেন্দ্রনাথের গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন এবং নরেন্দ্রনাথকে তত্ত্বানুসন্ধানে উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখেন।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ নাস্তিকভাবাপন্ন হন, পরে তত্ত্বজ্ঞানপিপাসা-হেতু কেশবচন্দ্র-প্রমুখ ব্রাহ্মগণের সংসর্গে আসিয়া তাঁহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল বটে, কিন্তু পিপাসার শান্তি হইল না।

নরেন্দ্রনাথের এক খুল্লতাত দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ইনি একদিন পরমহংসদেবকে দেখিতে যান। এইবার নরেন্দ্র-নাথের পিপাসার বারি মিলিল। এই মিলন সম্ভবতঃ ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল। তিনি তখন বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন।

প্রথম দর্শনেই তিনি রামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, পরমহংসদেবও যেন তাঁহাকে পাইয়া কতই পুলকিত হইলেন! নরেন্দ্রনাথ স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইলেন; গান শুনিয়া পরমহংসদেব ভাবে বিভোর! ভাব দেখিয়া নরেন্দ্রনাথও চমৎকৃত ও বিমোহিত! সেই হইতে তিনি পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়ে নরেন্দ্রনাথের সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে। কিন্তু রামকৃষ্ণের আকর্ষণে তিনি এমনই আকৃষ্ট যে, অবস্থার উন্নতিসাধন বা বিদ্যার্জ্জনের সবিশেষ

যন্ত্র ইত্যাদি কোন বিষয়েই আর তাঁহার মনোযোগ রহিল না। রামকৃষ্ণ নামই তাঁহার ইষ্ট মন্ত্র এবং দক্ষিণেশ্বরই তাঁহার প্রধান তীর্থ হইয়া উঠিল।

কথিত আছে, একদিন নরেন্দ্রনাথের গৃহে পর্য্যাপ্ত অন্নসংস্থান ছিল না। নরেন্দ্র দেখিলেন, যাহা কিছু আছে তাহাতে জননীর ও ভ্রাতৃগণের কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু তিনি স্বয়ং উহার অংশপ্রত্যাশী হইলে আর কুলায় না। অথচ নিজে অনাহারে থাকিবেন শুনিলে পুত্রবৎসলা মাতৃদেবীও আহার করিবেন না। এই হেতু কহিলেন,—'আমি দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম, তথায় আমার নিমন্ত্রণ আছে।' দক্ষিণেশ্বরে গেলেন সত্যই, কিন্তু নিমন্ত্রণ মিথ্যা—উপবাসেই দিনযাপন!

পরমহংসদেবের শিক্ষানুসারে কামিনীকাঞ্চন-পরিত্যাগ ভগবৎপ্রেমপিপাসুর পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু একদিন নরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিকালে কোন এক যুবক পরমহংসদেবকে কহিলেন,—প্রভো, আপনার এই প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ আমার সহিত বারাঙ্গনালয়ে গমন করিয়াছিল।

পরমহংসদেব একথা একেবারেই মিথ্যা ভাবিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু সংবাদদাতা সনির্ব্বন্ধে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন,—মহাশয়, আপনি বিশ্বাস করিতেছেন না? আমি স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষী, তাহাতেও বিশ্বাস না হয়, ওই ত নরেন্ আপনার সম্মুখেই বসিয়া আছে, উহাকেই জিজ্ঞাসা করুন্, ও বলুক্ যে, যায় নাই।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ নরেন্, সত্যি না কি?

নরেন্দ্র স্পষ্ট স্বীকার করিলেন,—হাঁ মহাশয়, সত্যই গিয়াছিলাম।

পরমহংস।—বলিস্ কি রে! না, তুই মিথ্যে বল্‌চিস্!

নরেন্দ্র।—না মহাশয়, সত্যই বলিতেছি, গিয়াছিলাম। আপনার নিকট মিথ্যা কথা কহিব!

প।—এমন কাজ কেনে কর্‌লি?

ন।—আজ্ঞা, করি কি! পেটের দায়ে গিয়াছিলাম। ঘরে খাবার ছিল না, হাতেও পয়সা ছিল না। ও বলিল, তুই যদি আমার সঙ্গে যাস্, তবে তোকে দুইটা টাকা দিব। তাই গিয়াছিলাম।

প।—তা'র পর?

ন।—তা'র পর সেখানে গিয়ে, ও গান গাইল, আমি খুব বাজালাম।

প।—তা'র পর?

ন।—তা'র পর আবার কি? ওর কাণ পাক্‌ড়ে দুই টাকা আদায় ক'রে এনে চা'ল ডা'ল কিনে মাকে দিলাম।

প।—(উচ্চৈঃস্বরে সানন্দে) ওরে লরেন্, বেশ্ করিচিস! আরও কর্‌বি। মনে ত কোন বিকার এসে নি?

ন।—কিছুমাত্র না; আপনার নামের কাছে আবার বিকার! সে আর কি সম্ভবে!

প।—ভ্যালা মোর মাণিক! ওরে শালারা, লরেন্‌কে ভুলাবি তোরা! সে আর তোরা লয়। লরেনই আমার তোদের মত কত লোক ভুলাবে।

এই যে কামিনীকাঞ্চন-পরিত্যাগ-মন্ত্র পরমহংসদেব দিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ যথাকালে উহা পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

উক্তরূপ ঘোর দারিদ্রকষ্ট উপেক্ষা করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার মন্ত্রদাতা পরমগুরু পরমহংসদেবের আদেশোপদেশ অনুসারে দিন দিন ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দারিদ্র-যন্ত্রণার সবিশেষ ভুক্তভোগী বলিয়াই বোধ হয় ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি দরিদ্রের নিমিত্ত, অনাথঅসহায়ের নিমিত্ত এত উদ্‌যোগ এত অর্থব্যয় ও এত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

দরিদ্র নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপায় ক্রমশঃ ভগবৎ-প্রেমরূপ মহাধনের অপূর্ব্ব অধিকারী হইয়া উঠিলেন। ধ্যানধারণা সমাধি প্রভৃতিতে ইঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মিল। এমন কি নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বসিলে, পাছে প্রগাঢ় সমাধিমগ্ন হইয়া দেহত্যাগ করেন, এই ভয়ে পরমহংসদেব বড়ই উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিতেন। তিনি অপর শিষ্যগণকে শ্রাদ্ধের অন্ন প্রভৃতি কদর্য্য ভোজ্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিতেন, উহাকে তোরা যতই কদর্য্য ভোজন করাইতে পারিবি, ততই পৃথিবীতে উহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের সম্ভাবনা। নচেৎ, যে দিন উহার শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইবে এবং ও কে তাহা জানিতে পারিবে, সেই দিনই পলাইবে। তিনি নাকি ইহাও বলিতেন,—নরেন্দ্রনাথ সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম।

বস্তুতঃ নরেন্দ্রনাথ আকাশচ্যুত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় যেরূপ নিমেষে বিশ্বসংসার চমকিত করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন, যেন কি এক স্বর্গীয় সন্দেশ আনিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা করিয়া,—কি এক অদ্‌ভুত অলৌকিক বৈদ্যুতানল আনিয়া পৃথিবীর প্রাচীন হইতে প্রতীচীন প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত করিয়া, দেখিতে

দেখিতে অদৃশ্য হইলেন, তাহাতে তিনি যে প্রকৃতই প্রাকৃত মানুষ নহেন, ইহা অনেকের বিশ্বাস।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে পরমহংসদেব মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাঁহার শিষ্যগণ গুরুনির্দ্দিষ্ট পথানুসরণে কৃতনিশ্চয় হইলেন; ইত্যবসরে নরেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ স্বামী কয়েক বৎসরকাল হিমালয় প্রদেশে অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে তিনি তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

তৎপরে খেতরী-রাজ্যে আসিয়া তত্রত্য মহারাজকে স্বাবলম্বিত ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করেন এবং ১৮৯০খৃঃ অব্দে মাদ্রাজ প্রদেশে আসিয়া রামনাদের রাজার নিকট সবিশেষ সম্মান-সমাদর প্রাপ্ত হন।

১৮৯৩ খৃঃ অব্দে আমেরিকায় শিকাগো নগরে সর্ব্বধর্ম্মসমবায়াত্মক মহা-সমিতির অধিবেশন হইলে মাদ্রাজবাসিগণের উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে বিবেকানন্দ তথায় গিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিস্বরূপে বক্তৃতা করেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অপূর্ব্ব ধর্ম্মমীমাংসা শুনিয়া আমেরিকাবাসিগণ চমৎকৃত হইলেন। তত্রত্য নিউইয়র্ক্‌হেরল্ড্ নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদক বিবেকানন্দস্বামীর ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া লিখিলেন,—হিন্দুর ন্যায় পণ্ডিতজাতির মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রয়াস পাওয়া যে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কর্ম্ম ইহা এখন আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।

এই সময়ে মাডাম্ লুই নাম্নী একটি আমেরিক রমণী ও মিষ্টর্ সাণ্ডস্‌বর্গ্ নামক একটি আমেরিক ভদ্রলোক বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহারা যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ নামে অভিহিত হন।

আমেরিকায় নানাস্থানে বেদান্তধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে আগমন করেন এবং বহুসংখ্যক সভাসমিতিস্থলে ওজস্বিনী ভাষায় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি এই সময়ে অধ্যাপক মাক্‌স-মুলরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে Life and sayings of Ramkrishna নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত করেন, এবং মিস্ মার্গারেট নোবল্ নাম্নী সদাশয়া রমণীকে রামকৃষ্ণ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই মিস্ নোবলই ভারতে সিষ্টার নিবেদিতা নামে সুপরিচিত।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ স্বামী সশিষ্যে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বত্র সাগ্রহে সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন।

অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গার পশ্চিম পারে বেলুড়গ্রামে এবং আলমোড়ায় এক একটি মঠ বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিতে থাকেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে নানাস্থ ন সাহায্যভাণ্ডার স্থাপিত করিয়া ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে পুনরায় ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গমন করেন। এই সময়ে সান্ ফ্রানসিস্কো নগরে বেদান্ত সোসাইটি ও শান্তি আশ্রম সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃঃ অব্দে ইনি ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরীতে ধর্ম্মসমবায়-সমিতিস্থলে নিমন্ত্রিত হইয়া ফরাসী ভাষায় হিন্দুদর্শনসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

আমেরিকা ও য়ুরোপের জলবায়ুতে বিবেকানন্দের স্বাস্থ্যলাভ হইল না। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া সেবাশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাশালা স্থাপন প্রভৃতি শুভানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন।

১৯০২ খৃঃ অব্দের ৪টা জুলাই সায়ংকালে বেলুড়মঠে মহাপুরুষ নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বসিলেন, ধ্যান গাঢ় হইতে হইতে রাত্রি ৯টার সময় মহাসমাধিতে পরিণত হইল। ভূলোকের ভৌতিক পিঞ্জর ভূতলেই পড়িয়া রহিল, দ্যুলোক-বিহঙ্গ দিব্যধামে উড়িয়া গেল!

যাঁহারা স্বামীজির শিষ্য তাঁহারা যে তদনুকরণে যত্নবান্ হইবেন ইহা ত সহজেই অনুমান করা যায়; কিন্তু তাহা ব্যতীত এই মহাপুরুষের জীবনাভাসে ভারতে—কেবল ভারতে কেন, ইউরোপ আমেরিকাতেও—অনেক নরনারীর জীবন প্রতিভাসিত হইয়াছে। ত্যাগ ও সেবাধর্ম্ম তিনি স্বদৃষ্টান্তে সম্যক্‌রূপে শিখাইয়া গিয়াছেন। এক বিবেকানন্দ বহুরূপে প্রকটিত হইয়া বহুলীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক বহুলোকশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দ বিবেকী, বিবেকানন্দ বৈরাগী, বিবেকানন্দ যোগী, বিবেকানন্দ ভক্ত, বিবেকানন্দ শিষ্য, বিবেকানন্দ গুরু, বিবেকানন্দ পণ্ডিত, বিবেকানন্দ বাগ্মী, বিবেকানন্দ বীর, বিবেকানন্দ সুপুরুষ, বিবেকানন্দ সুগায়ক, বিবেকানন্দ দয়াল, বিবেকানন্দ দাতা। তাঁহার বৈরাগ্য, বিবেকবুদ্ধি, যোগশক্তি, ভক্তি, শিষ্যত্ব, গুরুত্ব, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, বীরত্ব, দেহলাবণ্য, গীতশক্তি, দয়া ও দানশীলতা, সকলই অসাধারণ। সর্ব্বোপরি আদর্শনীয় তাঁহার অপূর্ব্ব গুরুবিশ্বাস। মানুষে দেবত্ববিশ্বাস পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছিল। ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের ব্রাহ্মভাবাপন্ন শিক্ষিত সমাজে ত সেরূপ বিশ্বাস একরূপ উপহাসের বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছিল। সহসা

বিবেকানন্দস্বামী উহাকে গাঢ়মূল করিলেন। এই অবসরে পদচ্যুত মানুষ-দেবতা-গণ শিক্ষিত সমাজে আবার অজ্ঞাতসারে স্ব স্ব পদাধিকার করিয়া লইলেন।

বিবেকানন্দ স্বয়ং বেদান্তবাদী অথচ অবতারভক্ত। তাঁহার এই বেদান্তবাদ ও অবতারভক্তির ফলে এক্ষণে অনেকে বেদান্তবাদী হইয়াছেন, অনেকে অবতার-ভক্তও হইয়াছেন সত্য, কিন্তু উভয় সংমিলনে সেরূপ সমমাত্রায় মণিকাঞ্চনযোগ তাঁহার জীবনে যেরূপ প্রকটিত হইয়াছিল, এরূপ আর ইদানীন্তন তদনুকারি-গণের কাহারও জীবনে প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না।

বিবেকানন্দস্বামী অকৃতদার চিরকুমার। তাঁহার এই লোক-প্রশস্য ভীষ্ম-ব্রত বহুসংখ্যক বঙ্গযুবকের চরিত্রে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গ-সমাজে যখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অখণ্ড প্রভাব ছিল, সে সময়ে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে স্ত্রীপরায়ণতা প্রকারভেদে যথেষ্টই ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ "ব্রাহ্মণী শর্ম্মা" বলিতে হতজ্ঞান হইতেন সত্য, কিন্তু প্রগাঢ় ভক্তিসম্ভ্রমে! জননী-জাতির অপব্যবহার করিবার কল্পনামাত্রও তাঁহাদের অন্তরে ভয়োৎপাদন করিত। কুমারী গৌরী, সধবা ভগবতী, বিধবা ব্রহ্মচারিণী, ইহাই তাঁহারা জানিতেন, এবং সেই জ্ঞান অনুসারেই স্ত্রীজাতির যথাশক্তি পূজা করিতেন।

সে সময়ের কোন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাঙ্গালী-ভদ্রলোকের বাটিতে গিয়া কেহ মাসাধিক কাল অবস্থিতি করিলেও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না, কোনটি গৃহস্বামীর গৃহিণী। বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী,—বালকবালিকাগণের লালনপালন-শাসনকর্ত্রী, ভৃত্যগণের ভোজনদাত্রী আদেশো-পদেশকর্ত্রী, গৃহদ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণকর্ত্রী, গোধনগণের পালনকর্ত্রী, অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনাকর্ত্রী, এমন কি সময়বিশেষে স্বয়ং গৃহস্বামীরও শাসনকর্ত্রীরূপে দেখিয়া যাঁহাকে সাক্ষাৎ গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানে আগন্তুক ব্যক্তি ভক্তিভরে প্রণাম করিতে উদ্যত, তিনি হয় ত গৃহস্বামীর রক্ষিতা স্ত্রী মাত্র। এমন কি তাঁহার ধর্ম্মপত্নীও ঐ সর্ব্বময়ী সর্ব্বেশ্বরীর বাধ্য অনুগত ও যথার্থই অনুরক্ত। এইরূপ এক একটী রক্ষিতা গৃহরঙ্গিণী তখন অনেক গৃহেই অধিষ্ঠিতা থাকিতেন। ইহাতে গৃহে অশান্তি বা সমাজে অখ্যাতি ছিল না। রক্ষিতাই হউন আর বিবাহিতাই হউন, সকলেরই সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধ প্রায়ই ভোজন বা শুশ্রূষা সময়ে। ইহাতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রীতির অসদ্ভাব কিছুমাত্র ছিল না; তবে আসক্তিজনিত অসার আমোদ আহ্লাদ এখনকার মত তখনকার স্ত্রীপুরুষগণ অল্পই বুঝিতেন।

কালপরিবর্ত্তনে ইদানীং ঐরূপ স্ত্রীপরায়ণতারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইদানীন্তন শিক্ষিত সমাজ স্ত্রীপরায়ণ যথেষ্টই সত্য, কিন্তু প্রকারান্তরে! এক-পরায়ণতা ও সোহাগসমাদর যথেষ্ট থাকিলেও সে সম্ভ্রম, সে ভক্তি, সে দেবীজ্ঞান বা সেরূপ সংযম আর নাই; আছে মাত্র আসক্তি অমিতাচার ও মোহ!

নবেল নাটকের যুগ আসিয়া যুবকগণের সমক্ষে যুবতীগণের চিত্র যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় চাকচিক্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল! বোধ হইল যেন পুরাতন রং পুঁচিয়া ফেলিয়া ইহাতে অপূর্ব্ব নূতন রং ফলাইল! কিন্তু শেষে সপ্রমাণ হইল, সে ঔজ্জ্বল্য কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী,—সে রং কাঁচা রং! স্পর্শ করিলে সে রং বিকৃত হইয়া যায়, স্রষ্টার হস্তও কলঙ্কিত হয়। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ সেই অদ্ভুত চাকচিক্যময় স্ত্রীচিত্র চিন্তা করিয়া একরূপ অভিনব স্ত্রীপরায়ণতায় মত্ত ও তাহাতেই আপনাদিগকে স্ত্রীজাতির যথার্থ মর্য্যাদারক্ষক নির্ণয় করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন।

এইরূপ স্ত্রীপরায়ণতা পরিণামে শিক্ষিত সমাজের সংযম প্রবৃত্তির উৎসাদক হইয়া উঠিল, ব্রহ্মচর্য্য পৌরাণিক উপকথামাত্রে পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু বিবেকানন্দ স্বামী স্বজীবনে এমন এক উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, তদনুসারে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধি ব্রহ্মচর্য্যপথে পরিচালিত হইল। কৌমার্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কেবল বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মঠে নহে, বস্তুতঃ বঙ্গের বহুল শিক্ষিত সমাজ মধ্যেও প্রবর্ত্তিত হইল। যাঁহারা বিবেকানন্দস্বামীর বা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পথাবলম্বী নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের দৃঢ় সংস্কার জন্মিল যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রয়ই শারীরিক মানসিক শক্তি-সঞ্চয়ের একমাত্র উপায়। এবং এই হইতে অনেক শিক্ষিত বঙ্গযুবক ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে লাগিলেন, বঙ্গে নবেল-নাটকীয় যুগের অবসান হইয়া এক নবযুগ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইতে লাগিল।

নবেল-নাটককারগণ নায়ক-নায়িকার লীলা বর্ণনচ্ছলে শিক্ষিত সমাজের চিত্তবৃত্তি যেরূপ গঠনে গঠিত করিতেছিলেন, তাহার আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বীরত্ব ও মাহাত্ম্যের চিত্র যেরূপ বর্ণে বর্ণিত করিয়াছিলেন, কতকগুলি বঙ্গযুবকের চিত্তে উহা এরূপ গাঢ় প্রতিফলিত হইল যে, অদ্যাবধি ঐ সম্প্রদায়ের আচারানুষ্ঠানে উহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। গ্রন্থকারগণের উদ্দেশ্য যেরূপই হউক, গ্রন্থমতাবলম্বিগণের আচরণ বা উদ্দেশ্য কোনমতেই যথার্থ মাহাত্ম্য বা বীরত্বের পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।

উক্তরূপ গ্রন্থপ্রচার দ্বারা গ্রন্থকারগণ বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে যে অদ্ভুত বীরত্ব ও মাহাত্ম্যের উদ্দীপনা করিয়াছেন, তাহার ফলে, পরিণামে মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে যতই সুমঙ্গল সংঘটিত হউক না কেন, আপাততঃ যে অসীম অমঙ্গল ঘটিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "আনন্দ মঠ"-প্রণেতা অপূর্ব্ব প্রতিভান্বিত সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই এইরূপ গ্রন্থকারগণের অগ্রণী। এই তথাভিহিত বঙ্গীয় সর্ ওয়াল্‌টর স্কট্—

(চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ)

—মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

—১৮৩৮ খৃঃ অব্দের ২৮ জুন রাত্রি ৯টার সময়ে ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন সম্ভ্রান্ত ডেপুটী কলেক্টর। শৈশবে স্বগ্রামে পাঠশালায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষাব আরম্ভ, এবং কলিকাতাব প্রেসিডেন্সি কলেজে উহার পরিসমাপ্তি। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি, ঐ বৎসর কলিকাতার হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সি-কলেজে পরিণত হয়, এবং ঐ বৎসরেই বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কলেজ হইতে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালীন বঙ্গসমাজে ইনি "বি, এ, বঙ্কিম" নামে প্রসিদ্ধ। পাঠসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমবাবু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিত হইলেন। পরে গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যদক্ষতা ও গুনবত্তার পুরস্কারস্বরূপ ইঁহাকে রায়বাহাদুর ও সি-আই-ই উপাধি প্রদান করেন। প্রায় ৩৩ বৎসর কাল সুযশের সহিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি করিয়া এই মহাত্মা ১৮৯১ খৃঃ অব্দে পেন্‌সন গ্রহণ এবং তৎপরে ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে স্বর্গলাভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্য হইতেই মাতৃভাষানুরক্ত। বাল্যকালে তিনি প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত প্রভাকর নামক পত্রে প্রকাশিত করিতেন এবং পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃকালে "ললিতা ও মানস" নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ২৬ বৎসর, সেই সময়ে ইঁহার রচিত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হয়। এই একখানি গ্রন্থই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে

বিষাণ-বিঘোষিত করিল। একখানি গ্রন্থই তাঁহাকে ভাষাভঙ্গির অভিনবত্ব-বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। এতাবৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহাজনগণ মাত্র সুপবিত্র শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাহার সহিত সুমধুর বীণাবংশীর স্বরসংযোগ করিলেন। ফলতঃ এই হইতে বঙ্গভাষায় এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

তৎপরে ক্রমশঃ তাঁহার কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের আবির্ভাব। ইহার প্রত্যেকখানিই স্ব স্ব মনোহারিত্বে রচয়িতার অসাধারণ প্রতিভা-পরিচায়ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের সবিশেষ রুচিপরিবর্ত্তন ঘটিল। ইহার পর প্রকাশিত হইল তাঁহার "কৃষ্ণচরিত"।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রধান গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় শ্রীমদ্‌ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; সে ত সকলই তৎকালীন সাধারণ শিক্ষিত সমাজের চক্ষে কুজ্ঝটিকাময়। বঙ্গভাষায় মাত্র কাশীদাসের মহাভারত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মলিন ম্রিয়মাণ ভাবে কোনরূপে জীবনধারণ করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সঞ্জীবিত করিলেন। বলিতেছি না যে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার শুকদেবাদি-প্রদত্ত সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন; বলিতেছি না যে, তিনি তাঁহাকে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা চৈতন্যের সমশ্রেণিক আসনে বসাইলেন,—বলিতেছি মাত্র এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ করিয়া অন্ততঃ তাঁহাকে চাণক্য, বিস্‌মার্ক্ বা গ্লাড্‌ষ্টোনের সমশ্রেণীতে আসন প্রদান করিলেন।

এক পক্ষে স্বীকার করিতে হইবে, ঋষিবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হইলেও তিনি তাঁহার কিছুই পরিচয় পান নাই; অপর পক্ষে অবশ্য স্বীকার্য্য, শ্রীকৃষ্ণের তথাবিধ মহাপুরুষোচিত পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন বঙ্গসমাজের মহোপকার সাধনই করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন শিক্ষিত বঙ্গে শ্রীনন্দনন্দন একরূপ সমাজচ্যুতই হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় একজন সুমহান্ সমাজগুরুর সুপারিস্ পত্র পাইয়া সকলে তাঁহাকে যেন আবার সমাজে তুলিয়া লইলেন এবং বঙ্কিমবাবুর অনুরোধেই যেন স্বেচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে একখানি উচ্চাসনে

উক্তরূপ গ্রন্থপ্রচার দ্বারা গ্রন্থকারগণ বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে যে অদ্ভুত বীরত্ব ও মাহাত্ম্যের উদ্দীপনা করিয়াছেন, তাহার ফলে, পরিণামে মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে যতই সুমঙ্গল সংঘটিত হউক না কেন, আপাততঃ যে অসীম অমঙ্গল ঘটিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "আনন্দ মঠ"-প্রণেতা অপূর্ব্ব প্রতিভান্বিত সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই এইরূপ গ্রন্থকারগণের অগ্রণী। এই তথাভিহিত বঙ্গীয় সর্ ওয়াল্টর স্কট্—

(চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ)

—মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

—১৮৩৮ খৃঃ অব্দের ২৮ জুন রাত্রি ৯টার সময়ে ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন সম্ভ্রান্ত ডেপুটী কলেক্টর। শৈশবে স্বগ্রামে পাঠশালায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ, এবং কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে উহার পরিসমাপ্তি। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি, ঐ বৎসর কলিকাতার হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সি-কলেজে পরিণত হয়, এবং ঐ বৎসরেই বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কলেজ হইতে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালীন বঙ্গসমাজে ইনি "বি, এ, বঙ্কিম" নামে প্রসিদ্ধ। পাঠসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমবাবু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিত হইলেন। পরে গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যদক্ষতা ও গুণবত্তার পুরস্কারস্বরূপ ইঁহাকে রায়বাহাদুর ও সি-আই-ই উপাধি প্রদান করেন। প্রায় ৩৩ বৎসর কাল সুযশের সহিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি করিয়া এই মহাত্মা ১৮৯১ খৃঃ অব্দে পেন্‌সন গ্রহণ এবং তৎপরে ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে স্বর্গলাভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্য হইতেই মাতৃভাষানুরক্ত। বাল্যকালে তিনি প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত প্রভাকর নামক পত্রে প্রকাশিত করিতেন এবং পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃকালে "ললিতা ও মানস" নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ২৬ বৎসর, সেই সময়ে ইঁহার রচিত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হয়। এই একখানি গ্রন্থই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে

বিষাণ-বিঘোষিত করিল। একখানি গ্রন্থই তাঁহাকে ভাষাভঙ্গির অভিনবত্ব-বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। এতাবৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহাজনগণ মাত্র সুপবিত্র শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাহার সহিত সুমধুর বীণাবংশীর স্বরসংযোগ করিলেন। ফলতঃ এই হইতে বঙ্গভাষায় এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

তৎপরে ক্রমশঃ তাঁহার কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের আবির্ভাব। ইহার প্রত্যেকখানিই স্ব স্ব মনোহারিত্বে রচয়িতার অসাধারণ প্রতিভা-পরিচায়ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের সবিশেষ রুচিপরিবর্ত্তন ঘটিল। ইহার পর প্রকাশিত হইল তাঁহার "কৃষ্ণচরিত"।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রধান গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় শ্রীমদ্‌ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; সে ত সকলই তৎকালীন সাধারণ শিক্ষিত সমাজের চক্ষে কুজ্ঝটিকাময়। বঙ্গভাষায় মাত্র কাশীদাসের মহাভারত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মলিন ম্রিয়মাণ ভাবে কোনরূপে জীবনধারণ করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সঞ্জীবিত করিলেন। বলিতেছি না যে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার শুকদেবাদি-প্রদত্ত সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন; বলিতেছি না যে, তিনি তাঁহাকে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা চৈতন্যের সমশ্রেণিক আসনে বসাইলেন,—বলিতেছি মাত্র এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ করিয়া অন্ততঃ তাঁহাকে চাণক্য, বিস্‌মার্ক্‌ বা গ্লাড্‌ষ্টোনের সমশ্রেণীতে আসন প্রদান করিলেন।

এক পক্ষে স্বীকার করিতে হইবে, ঋষিবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হইলেও তিনি তাঁহার কিছুই পরিচয় পান নাই; অপর পক্ষে অবশ্য স্বীকার্য্য, শ্রীকৃষ্ণের তথাবিধ মহাপুরুষোচিত পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন বঙ্গসমাজের মহোপকার সাধনই করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন শিক্ষিত বঙ্গে শ্রীনন্দনন্দন একরূপ সমাজচ্যুতই হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় একজন সুমহান্ সমাজগুরুর সুপারিস্ পত্র পাইয়া সকলে তাঁহাকে যেন আবার সমাজে তুলিয়া লইলেন এবং বঙ্কিমবাবুর অনুরোধেই যেন স্বেচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে একখানি উচ্চাসনে

বসাইলেন। এদিকে আবার তখন সংস্কৃত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থের প্রতিও অনেকের দৃষ্টি পড়িতে লাগিল; এরূপে সেরূপে সেই পুরাতন শ্রীকৃষ্ণ ইদানীং একজন মহাযোগী, মহা নীতিজ্ঞ, মহা বুদ্ধিমান্ বলিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৃন্দাবনবিহার-বর্ণনকারী ব্যাসদেব শুকদেব বা বোপদেব একজন মহামিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। যাহা হউক বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত পাঠের ফলে অনেকের গীতাভক্তি এবং গীতাপাঠ প্রবৃত্তি সবিশেষ বৃদ্ধি পাইল।

এদিকে আনন্দমঠ পাঠে এক দল বাঙ্গালী উক্ত গ্রন্থমতাবলম্বী হইয়া আর্ত্তত্রাণ দুষ্টদমন দেশোদ্ধার দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি কর্ম্ম সুনীতিসঙ্গত মনে করিলেন। গীতা-লিখিত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-বাক্যগুলি তাঁহারা স্বমত-সমর্থক রূপে বুঝিয়া লইলেন। অনধিকারে শাস্ত্রচর্চ্চার বিপরীত ফল ফলিতে লাগিল; 'পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং'; দুর্ব্বৃত্তগণের দুষ্প্রবৃত্তি গীতা ও আনন্দ মঠাশ্রয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে বঙ্গে বিষম দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত!

এদেশে উক্তরূপে দেশোদ্ধার-চেষ্টার প্রবর্ত্তক বা সমর্থক কেবল যে গীতা ও আনন্দমঠ তাহা নহে; আপামর সাধারণে সর্ব্ববিধ বিদ্যাশিক্ষাদান, আপামর সাধারণে সর্ব্ববিধ সংবাদপ্রচার, ইত্যাদিরূপ অত্যুদারনীতিক বিধানও বোধ হয় উহার একটি প্রধান উৎপত্তিহেতু। এবং যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও কি স্বীকার্য্য নহে যে, ইউরোপীয় অনেক গ্রন্থকার ও দেশীয় বিদেশীয় অনেক সংবাদ-পত্র বঙ্গযুবকগণের এ পাপের অংশভাগী?

সুদূর পল্লীগ্রামে পিতা হয় ত অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, পৈতৃক নিষ্কর ভূমি বিক্রয় করিয়া পুত্রের-সহর-বাস ও বিদ্যাভ্যাসের ব্যয় সঙ্কুলান করিতেছেন, মনে আশা—পুত্র আমার জ্ঞানবান্ ও উপার্জ্জনক্ষম হইলে সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে। কিন্তু সেই পুত্র—সেই অজাতশ্মশ্রু অসহায় বালক সহরে আসিয়া নিজভাগ্য-বিধানে সম্পূর্ণ স্বাধীন! অথচ কি সর্ব্বনাশ! সে যে সপ্তরথিসম্মুখে অভাগা অভিমন্যুবৎ বিপন্ন, তাহা সে স্বপ্নেও বুঝিতে পারে নাই! তাহাকে রক্ষা করিতে তাহার পিতা বা অন্য কোন আত্মীয়-বন্ধুরও অবসর বা অধিকার কোথায়? সহরের দুর্ব্বৃত্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত বালকদল আগন্তুককে অধঃপাত-পথে চালিত করিতে সতত সচেষ্ট, দুষ্টা-রমণীদল তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে সঙ্কল্পারূঢ়া, নানাবিধ অভিনয়-সম্প্রদায় তাহার পিতৃদত্ত অর্থের কিয়দংশ অপহরণ করিবার নিমিত্ত কুহকজাল পাতিয়া রাখিয়াছে, নানা সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ ঐ বালকের ইহলোক আলোকিত ও পরকাল পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত কতরূপ তথাভিহিত হিতানুষ্ঠানে নিরত,

স্বদেশীয় দেশোদ্ধারক সম্প্রদায়ও সংগোপনে বা প্রকাশ্যে মোহকর বক্তৃতাদিদানে তাহাকে দলভুক্ত করিতে নিশ্চেষ্ট নহেন। এ সকল ব্যতীত প্রবঞ্চক প্রতারক তস্করাদির ত অবধি নাই। নবাগন্তুক বিদ্যার্থী বালকের রক্ষাকর্ত্তা কোথায়?

হয় ত কিছুদিন পরে আশামুগ্ধ দরিদ্র পিতা সহসা সংবাদ পাইলেন, প্রাণাধিক পুত্র ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে বা রাজদ্রোহিতার অপরাধে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে! আর তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার অধিকার নাই।

নির্ব্বোধ নিরপরাধ পিতার মস্তকে এ আকস্মিক বজ্রাঘাতের নিমিত্ত দায়ী কে? কাহার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণাধিক ধনকে বিদ্যাভ্যাসে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন? এ বিশ্বাসঘাতকতা কে করিল?

অসহায় ছাত্রগণের এইরূপ সঙ্কটাবস্থান কি দেশের পূর্ব্বোক্ত দুর্দশার একটি প্রধান হেতু নহে? কিন্তু সর্ব্বপ্রধান হেতু বোধ হয় আমাদের স্বাধীনতা-বাতিক।

এ বাতিক,—এ বিষম রোগ কোথা হইতে আসিল? সংস্কৃতগ্রন্থে ত ইহার কথা কোথাও খুঁজিয়া পাই না! ইংরাজি লিবার্টি (Liberty) কথাটি আসিবার পূর্ব্বে এদেশে স্বাধীনতা কথাটির জন্ম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই বাতিকগ্রস্ত হইয়াই পতির পত্নী স্বাধীন, পিতার পুত্র স্বাধীন, গুরুর শিষ্য স্বাধীন, রাজার প্রজা স্বাধীন। ক্রমশঃ পাত্রবিশেষে ঐ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে! এই মহাসংক্রামক ব্যাধি ইউরোপ জর্জ্জরিত করিয়া ইদানীং এদেশের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। কেবল রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিলে কি হইবে? সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক রোগবীজ বিনাশই প্রকৃষ্ট প্রতীকারোপায়।

যাহা হউক, এই স্বাধীনতা-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অনেক শিক্ষিত বঙ্গযুবক দাসত্ববৃত্তির পরিবর্ত্তে শিল্প ও বাণিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বাঙ্গালীর ব্যবসায়-কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পণ্য-বিক্রয়ের প্রথাটি সাধারণতঃ এই হইতেই প্রচলিত হইল।

কচিৎ কদাচিৎ শিল্প বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে শিক্ষিত বাঙ্গালী যে ইতঃপূর্ব্বেও নিযুক্ত হন নাই, তাহা নহে। বিখ্যাত বাগ্মী ও সুবিদ্বান স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার সুপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কৃষিবাণিজ্যানুষ্ঠান আরও বিস্ময়কর। কেবল কৃষিবাণিজ্য কেন, দেশাচারের সংস্কার বিষয়েও তাঁহার অনুরাগ অতীব প্রশংসনীয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

অগাধ পাণ্ডিত্যহেতু বঙ্গের সমুজ্জ্বল রত্ন তারানাথের নাম দেশে বিদেশে সুবিখ্যাত। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম। ইনি কাশীধামে ও কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। তারানাথ বড়ই উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত কাপড়ের কারবার, স্বর্ণালঙ্কারের দোকান প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; ইহা ভিন্ন নেপাল হইতে কাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন, বীরভূমে প্রতিবিঘা দুই আনা নিরিখে দশ হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন, এবং তথায় পাঁচশত গোরু রাখিয়া তাহাদের দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতায় চালান দিতেন। এই প্রকার অনুষ্ঠানেব মধ্যেও তিনি শাস্ত্রালোচনা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সেবা যথেষ্ট করিতেন। তাবানাথের এ চরিত্র বঙ্গবাসীর সমক্ষে এক অপূর্ব্ব অভিনব আদর্শ।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বাচস্পতি মহাশয়ের সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই চেষ্টায় তিনি ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত হন।

বাচস্পতি মহাশয় বৈদিক ধর্ম্ম মানিয়া চলিতেন, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহারের মধ্যে যেটি তাঁহার মনঃপূত সেইটি করিতেন, যেটি তাঁহার নিকট আযৌক্তিক বিবেচিত হইত, সেটি করিতেন না। তিনি বড়ই তেজস্বী মহাপুরুষ ছিলেন, নিজে যাহা অন্যায্য বলিয়া মনে করিতেন সহস্র অনুরোধেও কেহ তাঁহাকে সে কার্য্য করাইতে পারিত না, আবার নিজে যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বুঝিতেন সহস্র যুক্তি প্রমাণ দিয়া বা সহস্র নিন্দাবাদ করিয়াও কেহ তাঁহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারিত না। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুবিবাহ সম্বন্ধে তারানাথ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধবাদী। এমন কি তিনি বহুবিবাহ-প্রথার পক্ষসমর্থন করিয়া 'লাঠী থাকিলে পড়ে না' এবং 'বহুবিবাহ-বাদ' নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত

বাচস্পতি মহাশয় আশুবোধ-ব্যাকরণ, শব্দার্থরত্ন, শব্দস্তোম-মহানিধি প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ এবং বেণীসংহার, কাদম্বরী, মুদ্রারাক্ষস, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের টীকা রচনা করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান ও বিদ্যার্থিগণের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎপ্রণীত বাচস্পত্য অভিধানই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ। সংস্কৃতভাষায় এ অভিধান এক অপূর্ব্ব রত্নভাণ্ডার। তিনি দৃঢ় সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া দ্বাদশবর্ষকাল বহুপরিশ্রম স্বীকার-পূর্ব্বক অগাধ সংস্কৃতসাহিত্য-বারিধি মন্থন করিয়া যে অমূল্য রত্নাবলী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় ঐ মহাভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যূন ৮০০০০৲ অশীতিসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া তিনি উক্ত অভিধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

বাচস্পতি মহাশয় ১৮৬১ খৃঃ অব্দে গয়ামাহাত্ম্য ও গয়া-শ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার তিন সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

এই সকল গুরুতর কার্য্যের মধ্যেও বাণিজ্য কার্য্যে তাঁহার বিশিষ্ট মনোযোগ ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যায়ী এবং সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক বাচস্পতি মহাশয়ের কৃষি-বাণিজ্যানুষ্ঠানে এইরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় আধুনিক অভ্যুদয়োৎসুক ইংরাজি-শিক্ষিত যুবকবৃন্দের সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে মহাপুরুষ তারানাথ কাশীধামে মানবলীলাসংবরণ করেন।

ভূমণ্ডলের সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় রহিবে, সন্দেহ নাই।

বাচস্পতি মহাশয়ের জীবিতকালে একজন বিদ্যার্থী বঙ্গযুবক সংস্কৃত শাস্ত্রা-ধ্যয়নের নিমিত্ত কাশীধামে মিসিরপোখারা-নিবাসী প্রসিদ্ধ উপাধ্যায় স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বেদাধ্যায়ী মহাশয়ের মঠে উপস্থিত হইলে, উপাধ্যায় মহাশয় আগন্তুকের অভিপ্রায় অবগত হইয়া হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি বঙ্গদেশ ছাড়িয়া কাশীতে আসিলেন কেন?

বিদ্যার্থী মহাশয় উত্তর করিলেন,—কাশীধামে যেরূপ বহুশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক আছেন, বঙ্গদেশে তেমন কেহ নাই।

উপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—এ কথা আপনাকে কে বলিল? আমি ত জানি, বঙ্গদেশে যেরূপ মহাবিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, সম্প্রতি কাশীধামে তেমন কেহ নাই; অন্য কোথাও আছেন কি না সন্দেহ।

বিদ্যার্থী।—বঙ্গদেশে এরূপ মহাবিদ্বান্ কে?

উপাধ্যায়।—কেন? কলিকাতার তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নাম শুনেন নাই কি?

বিদ্যার্থী। - বাচস্পতি মহাশয় কি এতই মহাপণ্ডিত?

উপাধ্যায়।—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এইরূপ কথোপকথনের পর বিদ্যার্থী মহাশয় বাচস্পতি মহাশয়েরই নিকট অধ্যয়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বড়ই লজ্জার বিষয় যে, আধুনিক শিক্ষিত সমাজ বঙ্গভূমির এই কিরীট-রত্নটির প্রতি অদ্যাপি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে শিখেন নাই।

ইদানীং অনেক বঙ্গযুবক কৃতবিদ্য হইয়া বাচস্পতি মহাশয়ের ন্যায় বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন। এমন কি বি এ, এম্ এ পাস করিয়াও কেহ কেহ দাসত্ব পরিহারপূর্ব্বক সামান্য পণ্যাদি-বিক্রয়রূপ ক্ষুদ্র ব্যবসায় অবলম্বন করিতে-ছেন। ইহারা যদি সাধুতা ও অধ্যবসায় সহকারে কর্ত্তব্য-নিরত থাকেন, তাহা হইলে কালে যে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন, স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে সে বিষয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শরৎ বাবু সামান্য দুই শত মুদ্রা মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া প্রায় সপ্ত লক্ষ মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার মূলধন মাত্র টাকা নহে, পিতৃপিতামহ প্রাপ্ত সাধুতা সত্যনিষ্ঠা বিনয় ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি মহাধনই শরৎকুমারের যথার্থ মূলধন। শরৎ বাবুর সাধুপ্রকৃতি ও বিনয় শিষ্টাচার-গুণে তিনি সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সর্ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের অধুনাতন শিরোরত্নগণ এবং অনেক ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ মহানুভব ব্যক্তি শরৎবাবুকে চিনিতেন মানিতেন এবং যথেষ্ট সমাদর করিতেন। আধুনিক বঙ্গের যথার্থ গুরুস্থানীয় মহাত্মা সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে শরৎবাবু যথার্থই গুরুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং উপযুক্ত অভিভাবক জ্ঞানে অনেক সময়ে তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। গুণগ্রাহী সর্ গুরুদাসও শরৎবাবুকে সদাই সস্নেহে সানুগ্রহ-নয়নে দেখিতেন, এমন কি মহানুভব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শরৎবাবুর সম্পদে বিপদে তদীয় ভবনে আসিয়া অমায়িকভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তবে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এরূপ উদারতা কেবল ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ নহে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টিয়ান্,

কি ব্রাহ্ম, যে কেহই হউন, সদ্‌গুণান্বিত ও সাধুচরিত্র হইলে সর্ গুরুদাস তাঁহাকেই সমুচিত সমাদর করিয়া থাকেন। যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে, অহিন্দুর চরিত্রেও মাহাত্ম্য পরিচয় পাইলে তাহার সমুচিত সৎকার করিয়া থাকেন, এরূপ অকপটাচার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অথচ অহিন্দুর অদ্বেষ্টা অমায়িক অপক্ষপাতী সমদর্শী সাধুপুরুষ কে? তবে, আমরা অসঙ্কোচে অসন্দেহে সর্ব্বাগ্রেই উত্তর করিতে পারি, সে মহাপুরুষ—

(ষোড়শ পরিচ্ছেদ)

—মহর্ষিকল্প সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই স্বনামধন্য সাধু মহাত্মার জন্ম ১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে। কলিকাতা হেয়ার স্কুলে নিম্নশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে গণিত বিদ্যায় এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার স্বরূপ সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন; এবং পর বৎসরেই বি, এল, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। বিদ্যাভ্যাসের পর ইনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের এবং বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। বহরমপুরে ইনি ওকালতিও করিতেন এবং তথায় ইঁহার আইন ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়া ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ডি, এল, উপাধিলাভ করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি ঠাকুর-ল-লেক্‌চারার-পদে নিযুক্ত হইয়া 'হিন্দুগণের বিবাহ ও স্ত্রীধন বিষয়ক আইন' সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে এই মহাত্মা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-রূপে মনোনীত হন এবং ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ অস্থায়িভাবে, পরে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে স্থায়িভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপরবৎসরে মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চান্‌সেলরের পদ প্রাপ্ত হন এবং নির্দ্দিষ্ট বর্ষদ্বয়কাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১৮৯২ খৃঃ অব্দে পুনর্ব্বার তৎপদে নিযুক্ত, এবং উক্ত বর্ষেই ইণ্ডিয়ান্ ইউনিবর্সিটি কমিশনের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। পরে ১৯০৪ খৃঃ অব্দে ইনি পেন্‌সন্ লইয়া হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

এই মহাত্মা সাতিশয় বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্যার্থিগণের অনুকূলাচারী। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইঁহার সবিশেষ অনুরাগ, এবং সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যিক ব্যাপারে যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। ইঁহার প্রণীত ইংরাজি ও বাঙ্গালা গণিত গ্রন্থগুলি শিক্ষার্থিগণের সবিশেষ উপকারী। শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে এই মহাত্মার রচিত 'A Few Thoughts on Education' নামক ইংরাজি গ্রন্থখানির প্রস্তাবগুলি অতীব সমীচীন ও সারগর্ভ। সর্ব্বোপরি, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' নামক উপাদেয় গ্রন্থই সাধারণের সবিশেষ হিতকর। এই গ্রন্থ পাঠে যেমনই জ্ঞানোপার্জ্জন হয়, তেমনই গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এ সংসারে কেহই অমর নহেন। কালে আমাদের সকলেরই জীবলীলা সাঙ্গ হইবে। কিন্তু, যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে ততদিন,—অন্ততঃ ততদিন বোধ করি সদ্‌বিচারগুরু গুরুদাস,—দেহাশ্রয়ে না থাকুন,—তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্মাশ্রয়ে জীবিত থাকিবেন। বস্তুতঃ অনসূয় পাঠকের চক্ষে এই গ্রন্থ এক নিগূঢ় জ্ঞানভাণ্ডার এবং বঙ্গীয় সারস্বত-ভাণ্ডারের এক অপূর্ব্ব অভিনব রত্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে।

মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নিষ্ঠাবান্ ও আনুষ্ঠানিক সামাজিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার নিষ্ঠা ও আনুষ্ঠানিকতা একেবারেই আড়ম্বরশূন্য; কিন্তু উহা এতই অবিচল যে কখনও কোনরূপ ইষ্টানিষ্টের আশাভয়ে উহার অবচ্যুতি ঘটিবার নহে।

সর্ গুরুদাস জজ্ অর্থাৎ বিচারক। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতিত্বে অবসরপ্রাপ্ত বটে, কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক আচাব ব্যবহারে, এমন কি প্রতি কথায় প্রতি পাদবিক্ষেপে সর্ গুরুদাস এখনও সুবিচক্ষণ জজ্! তাঁহার প্রত্যেক কথা প্রত্যেক ব্যবহার যথোপযুক্ত হেতু ও যুক্তিসঙ্গত,—অথচ বিনয়বর্জ্জিত নহে।

বিনয় ও লঘুতাস্বীকার গুরুদাস-চরিত্রের অপূর্ব্ব অলঙ্কার। তাঁহার বাক্যে ব্যবহারে রুক্ষতা আদৌ নাই, পরন্তু অমায়িকতা ও দীনতা সততই স্বপ্রকাশিত।

এই মহাপুরুষ মহাভক্ত! কৃষ্ণভক্ত, খৃষ্টভক্ত, বিষ্ণুভক্ত ইত্যাদিরূপ অনেকে অনেকপ্রকার ভক্ত আছেন, কিন্তু ইনি বড়ই শ্রেষ্ঠভক্ত; মহাপুরুষ গুরুদাস মাতৃভক্ত। ইঁহার বাল্যশিক্ষা দুই প্রকারের; নিম্নশিক্ষা বিদ্যালয়ে, সর্ গুরুদাসের উচ্চশিক্ষা মাতৃসন্নিধানে! ইনি নিজমুখে যখন স্বীয় স্বর্গগতা

মাতৃদেবীর সম্বন্ধে কোন আখ্যায়িকা বর্ণন করেন, তখন এই বৃদ্ধের ভক্তি ও শোকসূচক কণ্ঠস্বর শ্রবণে এবং বালবৎ অমায়িকতা ও তন্ময়তা দর্শনে ইঁহার অতুলনীয় মাতৃভক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এবং ভক্তের কথিত সেই উপাখ্যান শ্রবণে পাষণ্ডের চিত্তেও ভক্তির উদ্রেক হয়।

একদিন মহাভক্ত গুরুদাস স্বীয় ভবনে একজন নগণ্য ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে স্বীয় জননীর প্রদত্ত একটি উপদেশের বিষয় নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিলেন ঃ—

"আমি যখন কলেজে পড়িতাম, তখন অন্য একটি ব্রাহ্মণবালক আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি অনেক সময়ে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন; মা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমরা দুজনেই ক্রমে এম্, এ, পাস করিলাম। তাহার পরে আমি বি, এল্, পড়িতে লাগিলাম, তিনিও বি, এল্, পড়িতে লাগিলেন। আমি সবিশেষ পরিশ্রমের সহিত দিবারাত্র সমান পড়িতে লাগিলাম। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়িল।

এই সময়ে একদিন স্নানকালে মা আমার শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—গুরুদাস, তোমার এবারকার পরীক্ষা কি বি,এ, এম্,এ, অপেক্ষাও কঠিন?

আমি কহিলাম,—না মা; বি,এ, এম্,এ, অপেক্ষা বড় বেশি কঠিন নহে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে তুমি অন্যান্যবার অপেক্ষা এবারে এত অধিক পরিশ্রম করিয়া, অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়িতেছ কেন? অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর রাত্রিজাগরণে তোমার শরীর যে ক্রমে কাহিল্ হইয়া পড়িয়াছে!

আমি একটু লজ্জিত ভাবে উত্তর করিলাম,—হাঁ মা, এবারে একটু বেশি বেশি পরিশ্রম করিতেছি; তাহার কারণ আছে।

মা।—কারণ কি, বল দেখি।

আমি।—কারণ আর কিছুই নয়; যে যে পরীক্ষা পাস করিয়াছি, সব পরীক্ষাতেই আমি ফাষ্ট্ হইয়াছি, আর অমুক (সেই ব্রাহ্মণবালক) সেকণ্ড্ হইয়াছেন। এবারে তিনি যাহাতে ফাষ্ট্ হইতে পারেন এইরূপ পরিশ্রম করিয়া পড়িতেছেন। এইবার হইলেই আমাদের পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইল। এই শেষ পরীক্ষায় তিনি যদি ফাষ্ট্ হন, তবে পূর্ব্বপরীক্ষাগুলিতে যে আমি ফাষ্ট্ হইয়া-

ছিলাম, সে সব চাপা পড়িয়া গেল, শেষ জয় তাঁহারই হইল। এই জন্যই আমি একটু বেশি পরিশ্রম করিয়া পড়িতেছি।

আমার কথা শুনিয়া মা একটু বিষণ্ণ হইয়া বিরক্ত ভাবে কহিলেন,—গুরুদাস, তোমার বড় দুরাশা! যে এরূপ দুরাশা করে, সে ব্যক্তি জীবনে কখন সুখী হইতে পারে না। প্রতিবারে সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারে নাই, তুমিই ফার্ষ্ট্ হইয়াছ। এই শেষবারেও সে বেচারার আশা বিফল করিয়া নিজে ফার্ষ্ট্ হইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছ? ছি ছি! এরূপ কাজ কি করিতে আছে! হোক্, সে এবারে ফার্ষ্ট্ হোক্! তুমি আর রাত্রি জাগিয়া অত মেহনৎ করিও না। অত স্বার্থপর হইতে নাই। উহাতে কখনই ভদ্র হয় না। আমি বারণ করিতেছি, আর তুমি ওরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিও না, দস্তুর মত পড়িয়া যাও, তাহাতেই যাহা হয় তাহাই ভাল। ওরূপ দুরাশায় কাজ নাই।

মায়ের এই উপদেশ শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল। আমি তখন আমার কার্য্যের অনৌচিত্য বুঝিতে পারিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম, এবং সেই দিন হইতে সেরূপ পরিশ্রম পরিত্যাগ করিলাম। সেই অবধি মায়ের সেই উপদেশটি স্মরণ করিয়া আমি আর ওরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হই না।

অতঃপর শ্রোতা মহাশয় কৌতূহলান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, সেবারে বি, এল্, পরীক্ষায় কিরূপ ফল হইল?

চিরবিনীত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিতভাবে উত্তর করিলেন,—হাঁ, তা', সেবারেও পূর্ব্বের মতই হইল।—

অর্থাৎ সেবারেও গুরুদাস ফার্ষ্ট্ হইলেন।

সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালীকুলের গৌরব-স্থল। তিনি জীবনে বিদ্যা ও অর্থ যথেষ্টই উপার্জ্জন করিয়াছেন। অর্থের সদ্ব্যয়ও ইঁহার যথেষ্ট, দানও যথোচিত। প্রত্যহ প্রভাতেই নারিকেলডাঙ্গার জজ্-ভবনের সম্মুখে অনেক অন্নবস্ত্রহীন দীন দুঃখী উপস্থিত হয়, এবং সকলেই যথাসম্ভব ভিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত প্রত্যহই অনেক ভিক্ষুকবৈষ্ণব ও ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণও উপস্থিত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অনেক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও তাঁহার নিকট বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর পুণ্যার্থে তিনি তন্নামে, প্রতিবর্ষে সংস্কৃতশাস্ত্রে যে ছাত্র এম্ এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন, তাঁহাকে "সোণামণি

পারিতোষিক” স্বরূপে বহুসংখ্যক মূল্যবান্ সংস্কৃত গ্রন্থ দান করিয়া থাকেন। এই দানের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

সমদর্শী সর্ গুরুদাস স্বয়ং নিষ্ঠাবান্ আনুষ্ঠানিক হিন্দু হইলেও অন্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন নহেন, বরং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মাদিতে তিনি অমায়িক ভাবে যথাসম্ভব যোগদানও করেন।

এক সময়ে কলিকাতা-ঝামাপুকুরে স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটীতে কথকতা হইতেছিল; শান্তিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোস্বামী মহাশয় মাসত্রয় ব্যাপিয়া মহাভারত কীর্ত্তন করিতেছিলেন; স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় শুনিলেন যে, গোস্বামী মহাশয়ের ভারত-কথা অতীব রসোদ্দীপক ও সদ্‌ভাবসূচক। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয়তা ছিল; লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাকে স্বীয় হারিসন্ রোড্স্থিত ভবনে ভারত-কথা কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন; এবং কি ব্রাহ্ম কি হিন্দু স্বীয় সমস্ত আত্মীয় বন্ধুকে কথকতা শুনিবার নিমন্ত্রণ করিলেন।—অবশ্য, এ নিমন্ত্রণ এইরূপ সাধারণ নিমন্ত্রণের ন্যায় প্রকারান্তরে অর্থ সংগ্রহার্থ নহে।—এই উপলক্ষে শরৎবাবু তাঁহার চিরানুগ্রাহক সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

যথাকালে কথারম্ভ হইল। অন্যান্য শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সমাসীন। যতক্ষণ কথা হইল, ততক্ষণ তিনি স্থিরভাবে সবিশেষ অভিনিবেশ-পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। কথা সমাপনান্তে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গল্পচ্ছলে বলিতে লাগিলেন,—

আমি বাল্যবয়সে যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন কথকতার প্রতি আমার তাদৃশ আস্থা ছিল না; মনোযোগপূর্ব্বক কথকতা শুনি নাই বলিয়াই সম্ভবতঃ সেরূপ অনাস্থা ছিল, শুনিবার অবসরও তেমন যুটে নাই। পরে যখন বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, সেই সময়ে সহসা একদিন কোন স্থানে কথকতা শুনিয়া আমার এতই বিস্ময়বোধ ও তৃপ্তিলাভ হইল যে, সেই হইতে কথকতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং উহা শুনিবার নিমিত্ত আমার আগ্রহ জন্মিল। বাস্তবিকই এরূপ পুরাণব্যাখ্যা সমাজের পক্ষে বড়ই হিতজনক।

অতঃপর লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে উপর্য্যুপরি কয়েকদিন বসিয়া মোহনলাল গোস্বামী মহাশয় পুরাণব্যাখ্যা করিলেন। অনেক ব্রাহ্ম ও হিন্দু স্ত্রীপুরুষ আসিয়া উহা শ্রবণ করিলেন। সকলেই যে সমান সন্তোষ লাভ করিলেন

তাহা নহে; সম্ভবতঃ কোন কোন একদেশদর্শী ব্রাহ্মবন্ধু লাহিড়ী মহাশয়ের এইরূপ হিন্দুসমাজপ্রচলিত আচরণ দেখিয়া একটু বিরক্তও হইলেন।

বস্তুতঃ স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকের সহিত ব্যবহারে যেরূপ অমায়িক সমদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অল্প লোকের চরিত্রেই সেরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অমায়িক সমদর্শিতাগুণে তিনি কি হিন্দু কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম কি খৃষ্টিয়ান, কি রাজপক্ষীয় কি প্রজাপক্ষীয়, সর্ব্বপ্রকারের লোককর্তৃকই সমাদৃত ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন। সামান্য পুস্তকপ্রকাশক হইয়া তিনি যেমন দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের তথা বিদেশীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সমাদর সম্মান ও বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কেহ করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

অনরেবল্ সর্ লরেন্স্ জেঙ্কিন্স্, লর্ড্ ফুল্টন্ (র‍্যাম্পিনি), অনরেবল্ মিঃ ডব্লিউ, আর্, গুর্লে, সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনরেবল্ সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র দেবরায়, উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহামহিমান্বিত মহাজনগণ তাঁহাকে সমাদর করিতেন, অনেকেই তাঁহার সাদরাহ্বানে তদীয় ভবনে শুভাগমন করিতেন, অনেকেই তাঁহার সুখদুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন।

সর্ গুরুদাসের ন্যায়, সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেও শরৎবাবু পরম হিতৈষী উপদেশক বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মহাত্মা আশুতোষ অনেক সময়ে শরৎবাবুকে অনেক সৎকর্ম্মে সমুৎসাহিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, আধুনিক বঙ্গসমাজের শিরোরত্ন স্বরূপ এই মহাপ্রতিভান্বিত মনীষী—

(সপ্তদশ পরিচ্ছেদ)

—অনরেবল্ সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—

—গুণবানের গুণগ্রহণে ও উৎসাহ-প্রদানে সতত তৎপর। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন,—

মুক্তা হি জবয়া রক্তা জবা শুভ্রা ন মুক্তয়া।
ভবেৎ পরগুণগ্রাহী মহীয়ানেব নাপরঃ॥

একটি মূল্যবান্ মুক্তার নিকট একটি জবাফুল ধরিলে, জবার গুণগ্রহণ করিয়া মুক্তাটিই রক্তবর্ণ দেখায়, কিন্তু সামান্য জবাফুলটি কখনই মুক্তার গুণগ্রহণে

শুভ্রবর্ণ ধারণ করে না। মহাগুণবান্ মহীয়ান্ শ্রীলশ্রীযুক্ত সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও সেইরূপ পরগুণগ্রাহিতা অতীব প্রশংসনীয়। তিনি অনাদৃত অঙ্গার-রাশি হইতে অনেক সময়ে অনেক মলাচ্ছন্ন হীরকখণ্ডের উদ্ধারসাধন করিয়া নিজ যত্নে উহার ঔজ্জ্বল্যসংস্কার ও তৎপ্রতি দশের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার সহৃদারতা ও সদ্‌গুণগ্রাহিতার অসদ্‌ভাবে হয়ত ঐ সকল মহারত্ন চিরদিনই অনাদৃত অসংস্কৃত থাকিয়া অঙ্গারসহ অকিঞ্চিৎকর মূল্যেই বিক্রীত হইত।

এই মহানুভব মনীষী বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বভাব প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষা-বিভাগে এক শুভযুগের অবতারণা করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মহাত্মগণের চেষ্টায় যেমন সংস্কৃত ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যতর ভাষারূপে প্রচলিত হওয়ায় সম্প্রতি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান প্রায় সকলেই ঐ ভাষায় অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সর্ আশুতোষের অনুগ্রহে ইদানীং বঙ্গভাষাশিক্ষাও সেইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হওয়ায় ঐ ভাষার উৎকর্ষসাধন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ থাকায় নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধি প্রদানে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন। বাস্তবিকই বঙ্গগৌরব মহাত্মা সর্ আশুতোষ অসাধারণ প্রতিভান্বিত মহাপণ্ডিত।

বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কার্‌মাইকেল মহোদয় স্বয়ং এক সময়ে কলিকাতার বহুসংখ্যক খ্যাতনামা স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্বান্ সুসম্ভ্রান্ত সভ্যগণ-সমক্ষে প্রকাশ্যে সভাস্থলে এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে কহিয়াছিলেন, "এই সভায় আমরা যত লোক উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের সকলের অপেক্ষাই সর্ আশুতোষের পাণ্ডিত্য প্রশস্ততর।" জানি না, বঙ্গে বা সমগ্র ভারতে মহাত্মা আশুতোষ ব্যতীত আর এমন লোক কে আছেন, যাহার সম্বন্ধে মহামান্য লর্ড কারমাইকেলের ন্যায় মহাবিচক্ষণ ব্যক্তি কলিকাতা রাজধানীর বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অবাধে উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশে সাহসী হইতে পারেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে এ স্থলে আমাদের এই অমায়িক মহানুভব শাসনকর্ত্তা মহাশয়ের গুণগ্রাহিতা ও উদারতার প্রশংসা ও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাস্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাকে জগদীশ্বর নিরাময় দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন।

সর্ আশুতোষ ভবানীপুর নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে

গণিত শাস্ত্রে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৎপর বৎসরেই রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন, এবং ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন পরেই ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য-পদে মনোনীত হন এবং ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ডি, এল, উপাধি লাভ করেন। প্রথমতঃ ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে এবং পুনর্ব্বার ১৯০১ খৃঃ অব্দে মহাত্মা আশুতোষ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, এবং পরে ১৯০৩ খৃঃ অব্দে উক্ত সভার প্রতিনিধিস্বরূপে বড়লাটের সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ১৯০৪ খৃঃ অব্দে মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাইকোর্টের জজ পদে নিয়োজিত হন, অদ্যাপি তিনি প্রশংসার সহিত উক্ত পদেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইত্যবসরে এই মহাত্মা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শিক্ষাবিধান ব্যাপারের বহু পরিবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বের স্মৃতিরক্ষার্থ, তাঁহারই উদ্যোগ-তত্ত্বাবধানে সুনির্ম্মিত "দ্বারভাঙ্গা বিল্‌ডিং" নামক বিচিত্র অট্টালিকাভবনে, তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ ভারতে অনেক স্থানে অনেক গুণবান্ মহীয়ান্ ব্যক্তির মৃত্যুঅন্তে রাজপক্ষ ও প্রজাপক্ষ মিলিত হইয়া প্রস্তররচিত প্রতিমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক মৃতের সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মহাত্মা সর্ আশুতোষের ন্যায় জীবিতাবস্থায় কোথাও কাহারও উক্তরূপ সংবর্দ্ধনা এবং সম্মাননা প্রাপ্তির সৌভাগ্য ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

১৯০৮ খৃঃ অব্দে এই মহাত্মা এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি পদসুশোভিত করিয়াছিলেন।

মহানুভব সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃতই একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তবে ১৯০৮ খৃঃ অব্দে ইনি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ইঁহার বাল-বিধবা তনয়ার বিবাহ দেওয়ায় অনেকে ইঁহাকে তথাকথিত ব্রাহ্মমতাবলম্বী মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইঁহার আচার ব্যবহার বেশভূষা ইত্যাদি দেখিলে সহজেই সে সন্দেহের নিরাকরণ হয়।

প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা আশুতোষ বড়ই ধীর, বড়ই বিচক্ষণ, বড়ই তেজীয়ান্। তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধিতে যাহা শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিসঙ্গত সুবিধিসঙ্গত বলিয়া একবার বুঝিতে পারেন, শতভ্রূকুটী সহস্র বিভীষিকা বা অশেষ প্রলোভনেও তাঁহার সে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে না, তাঁহাকে স্বপথচ্যুত করিতে পারে না। যাহা হউক, উক্ত বিবাহহেতু হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণনীতিক

সম্প্রদায় স্বাভিমান-গণ্ডী মধ্যে বসিয়া, বিদ্যাসাগরিক দলভুক্ত বলিয়া তাঁহার প্রতি কখন কখন কুটিল কটাক্ষপাত করিলেও, হিন্দু সমাজের উদারনীতিক সম্প্রদায় ঐ বিবাহহেতুই মহাত্মা আশুতোষকে তেজস্বী বিবেকবান্ অমায়িক মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন। আমরা বলি, বর্ত্তমান হিন্দুমণ্ডলের একাংশ যখন বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা স্বীকার করেন, এবং স্বয়ং রাজপক্ষও যখন বিধবাবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলিয়াই পরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন যাহারা হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া বিধবাবিবাহ দিতেছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থাবান্ বলিব? আবার যাহারা বিধবাবিবাহকে অশাস্ত্রীয় বলিতেছেন, অথচ অপরাপর ঘোরতর অশাস্ত্রীয়তার মধ্যে অহঃরহঃ চলিতেছেন ফিরিতেছেন, তাঁহাদিগকেই বা কি বলিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিব?

যাহা হউক, সর্ আশুতোষের ন্যায় উচ্চপদারূঢ় হিন্দুগণের মধ্যে অথবা অন্যান্য ধনবান্ সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীগণের মধ্যে দুই এক জন ভিন্ন অপরাপরের আচার-ব্যবহারে ও বেশভূষায় হিন্দুত্বের পরিচয় যেরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, বা বাঙ্গালীত্ব যেরূপ যতটা বুঝা যায়, সর্ আশুতোষের চরিত্রে অন্ততঃ তদপেক্ষা ঐ সকলের অনেক স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। এমন কি শুনা যায়, তিনি নিজের হিন্দুয়ানী ও বাঙ্গালী-আনা ভাব বজায় রাখিতে গিয়া কখন কখন অর্ব্বাচীনের বিষম বার্ব্বরিক ব্যবহারও অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন, তথাপি মহাপুরুষ নিজ জাতীয় বা দেশীয় ভাব বর্জ্জন করেন নাই। সাধে কি বলি, মহাত্মা আশুতোষ বড়ই বিচক্ষণ, বড়ই তেজস্বী। অধীরতা ও প্রতিহিংসা তেজস্বিতার পরিচায়ক নহে, ধীরতা ও ক্ষমাই তেজস্বিতার প্রকৃত লক্ষণ। হিন্দুস্থানী কোন এক কবি কহিয়াছেন,—"হস্তী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুঁকে হাজার," অর্থাৎ হস্তী যখন বাজারের পথ দিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাকে দেখিয়া হাজার হাজার কুক্কুর কোলাহল করিতে থাকে, তেজীয়ান্ গজরাজ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। কিন্তু অপর কোন ভীরু প্রাণী সেরূপ ক্ষেত্রে বিকটদংষ্ট্রাবলী বহিষ্কৃত করিয়া দ্বিগুণতর বীভৎস স্বরে চীৎকার করিতে করিতে দংশনোদ্যত হয়। তেজীয়ান্ আশুতোষ ধীরভাবে আপন মতে আপন পথে চলিয়াছেন, ঈর্ষাপর অর্ব্বাচীনগণের অন্যায় অপবাদের সাধ্য কি যে তাঁহার ধৃতিভঙ্গ বা গতিরোধ করে?

ধর্ম্মক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, সামাজিক সংস্কারক্ষেত্রে, আমরা অনেক

দেশের ইতিহাসে অনেক তেজস্বী মহাজনের পরিচয় পাইয়া থাকি বটে, কিন্তু সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে মহাত্মা আশুতোষের ন্যায় শান্ত সুধীর সুবিচক্ষণ সুপণ্ডিত নীরব-কঠোরশ্রমী কঠিন-প্রতিজ্ঞ মহাপুরুষ সর্ব্বদেশেই সুবিরল।

বঙ্গের অতীত ও বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত বঙ্গসমাজে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক স্বাধীনচেতাঃ তেজস্বী ব্যক্তির নাম সকলেই শুনিয়াছেন ও শুনিতেছেন, ইদানীং শিক্ষিতা মহিলাগণের মধ্যেও কদাচিৎ দুই একটী তেজস্বিনী বঙ্গবালার নাম শুনা যাইতেছে; কিন্তু বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধভাগে যখন পাশ্চাত্যশিক্ষা,—স্ত্রীসমাজ দূরে থাকুক,—বঙ্গের পুরুষমণ্ডলেও অতি ক্ষীণালোক মাত্র প্রকাশ করিয়াছে, তখনও সেই তথাভিহিত অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গীয় নারীসমাজে কচিৎ দু'একটি অপূর্ব্ব কহিনুর নয়নগোচর হইত।

প্রাচীনকালে বঙ্গের বীরাঙ্গনাগণমধ্যে স্বর্গীয়া রাণী ভবানীর নামই প্রাতঃস্মরণীয়, তৎপরে দয়াদানপ্রভৃতিবিষয়ে স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীও সুবিখ্যাত। বুদ্ধিমত্তায় ও প্রবলপ্রতাপে ময়মনসিংহের জাহ্নবী চৌধুরাণী ও বিন্দুবাসিনী দেবীও পূর্ব্ববঙ্গে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাবতী। কিন্তু আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যশিক্ষাবিহীন যে একটি বঙ্গ বীরাঙ্গনার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা তেজস্বিতা ধর্ম্মশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কেবল আমরাই যে এখন মানুষ হইয়াছি এবং আমাদের মহিলাগণই যে ক্রমে পশুত্বপরিহারে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতেছেন তাহা নহে, এ বঙ্গে বহুপূর্ব্ব হইতেই এরূপ অনেক মানুষ মানুষীর—দেবদেবীর বাস ছিল, যাঁহাদের তুলনায় আমরা অনেকেই হয়ত এখনও পিশাচপিশাচী-পদ-বাচ্য। স্বর্গীয়া স্বনামধন্যা—

(অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ)

—রাণী রাসমণি—

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-মহিলাকুলের শিরোমণি। উক্ত শতাব্দীর প্রাক্‌কালে ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী হালিসহরের সংলগ্ন কোনা নামক গ্রামে এক দরিদ্র

কৃষিজীবী কৈবর্ত্ত-গৃহে এই রমণীরত্নের জন্ম; রাসমণির পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। কৈবর্ত্ত-কন্যা রাসমণি কিন্তু রূপেগুণে সাক্ষাৎ দেবকন্যা! অষ্টবর্ষকাল ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে কঠোর দ্রারিদ্র্য-মঠের অপূর্ব্ব শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তৎফলে রাণী রাসমণি দারিদ্রের ক্লেশ—দুঃখীর দুঃখ চিরদিনই বুঝিতেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে ইঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে, পরে একাদশ বর্ষে পিতা হরেকৃষ্ণ দাস এই মাতৃহীনা কন্যাকে কলিকাতানিবাসী অতুলঐশ্বর্য্যশালী প্রীতিরাম মাড়ের পুত্র শ্রীমান্ রাজচন্দ্র মাড়ের হস্তে সম্প্রদান করিলেন।

১৮১৭ খৃঃ অব্দে প্রীতিরাম স্বর্গলাভ করিলে তাঁহার পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তির ভার রাজচন্দ্রের হস্তেই পড়িল। ইতঃপূর্ব্বেই পতি রাজচন্দ্র পত্নী রাসমণিকে কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সে সময়ে রাণী রাসমণি "দেবী চৌধুরাণী" "রাণী ভবানী" প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতে পান নাই; সীতা সাবিত্রী শৈব্যা শকুন্তলা চিন্তা দময়ন্তী প্রভৃতি ঋষি-অঙ্কিত পবিত্র চিত্রাবলীই মাত্র তাঁহার মানসনেত্রের গোচর হইয়াছিল। ফলও আশাতীত ফলিয়াছে! সৎসাহস, সদাচার, সদ্‌বুদ্ধি, সদ্ব্যয়, সদনুষ্ঠান ইত্যাদি হেতু তাঁহার মর্ত্ত্যজীবন ধন্য হইয়াছে, এবং ইদানীং অবশ্যই তিনি অমরধামে চিরানন্দের অধিকারিণী হইয়াছেন।

যাহা হউক, রাজচন্দ্র বুদ্ধিমতী সদ্‌গুণান্বিতা সাধ্বী পত্নী রাসমণির সুপরামর্শানুসারে সুশৃঙ্খলাক্রমে বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু,—নিয়তির নির্ব্বন্ধ,—১৮৩৬ খৃঃ অব্দে সহসা তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইল। বিধবা বীরাঙ্গনা রাণী রাসমণি এক্ষণে একাকিনী সুবৃহৎ সম্পত্তির গুরুভার-বহনে যত্নবতী রহিলেন। ইঁহার বুদ্ধিবিচক্ষণতা-গুণে এই সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিসাধনও হইতে লাগিল।

এই বিধবা বঙ্গবালা বড়ই তেজস্বিনী ছিলেন। ইনি কখনই কাহারও যথেচ্ছাচার সহ্য করিতে পারিতেন না, অত্যাচার দেখিলেই সাধ্যমত প্রতিবিধান করিতে ত্রুটি করিতেন না।

কলিকাতা—জানবাজারে রাণী রাসমণির বাসভবনের নিকটবর্ত্তী পথে দুর্গোৎসবের সময়ে সদাই নানারূপ বাদ্যধ্বনি হইত। উহাতে সাহেবদিগের কর্ণশূল উপস্থিত হইল। তাঁহারা পুলিশের সাহায্যে উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। অমনি রাণী রাসমণির কড়া হুকুম জাহির হইল যে, তাঁহার অধিকৃত পথে কোন সাহেব আর চলিতে ফিরিতে পারিবেন না! ইংরাজ মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল! রাসমণি

নিজের হুকুম বজায় রাখিলেন। অগত্যা কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। মহিমান্বিতা রাণী রাসমণিও অমনি অনুরোধ রক্ষা করিয়া স্বীয় মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

আর এক সময়ে মাননীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য জালিয়াদিগের উপর কর ধার্য্য করেন। জালিয়ারা আসিয়া রাণীরাসমণির শরণাপন্ন হইল। রাসমণি উক্ত করগ্রহণপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে সবিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর সে অনুরোধ রক্ষা না করায় অগত্যা রাসমণি স্বয়ং দশহাজার টাকা দিয়া উক্ত জলকর মহাল ইজারা লইলেন। তৎপরেও ঐ জলকরপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি পুনঃপুনঃ আবেদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন কোন মতেই উক্ত প্রথা রহিত করিলেন না, তখন সেই মনস্বিনী বঙ্গমহিলা এক অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবিত করিলেন। তিনি লৌহশৃঙ্খল দ্বারা বয়াগুলি পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া নদীমুখ বন্ধ করিয়া দিলেন, ইহাতে নৌকা ও জাহাজ যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। বণিক্‌কুল ব্যাকুল ভাবে বিষম কোলাহল তুলিয়া সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ রাসমণির নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়া পাঠাইলেন। রাণীরাসমণিও নির্ভয়ে কৈফিয়ৎ দিলেন,—আমি মাছের জন্য দশহাজার টাকা দিয়া নদী জমা করিয়া লইয়াছি। সতত নৌকা জাহাজ ইত্যাদি যাতায়াত করিলে নদীর সব মাছ পলাইয়া যাইবে; সুতরাং মৎস্যরক্ষার নিমিত্ত আমি নদীমুখ বন্ধ রাখিব।

উত্তরশুনিয়া সকলেই নিরুত্তর! তখন ন্যায়বান্ গবর্ণমেণ্ট্ গঙ্গায় জলকর-আদায়ের অযৌক্তিকতা অবধারণ পূর্ব্বক উক্ত করপ্রথা রহিত করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। এ দৃষ্টান্তে, সৎসাহস ও সুবিচক্ষণতা-বিচারে আমরা কখনই এই মনস্বিনীর আসন রামগোপাল ঘোষ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাজনগণের নিম্নশ্রেণীতে নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

এই মহোদয়ার দূরদর্শিতা ও বিষয়বুদ্ধিও বড়ই প্রশংসনীয়। সিপাহী-বিদ্রোহ সময়ে অনেকেই ইংরাজরাজত্বের উচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়াছিল। এ কারণ ঐ সময়ে কোম্পানীর কাগজের দর বড়ই কমিয়া গিয়াছিল। অনেকে অনেক মূল্যবান্ দ্রব্যও অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী রাসমণি কিন্তু ঠিক বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজরাজত্ব যাইবার নহে। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তিনি অবিলম্বে অল্পমূল্যে বিস্তর কোম্পানির কাগজ ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি ক্রয়

করিয়া রাখিলেন এবং বিদ্রোহাবসানে যথোচিত মূল্যে ঐ সকল বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিলেন।

রাণী রাসমণির ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারবুদ্ধি ও দীনবৎসলতা প্রকৃতই আদর্শনীয়। একবার, ইনি তীর্থদর্শনোদ্দেশ্যে কাশীধামে যাইবার আয়োজন করেন। তখন রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই, সুতরাং জলপথে কাশীযাত্রার নিমিত্ত অনেকগুলি নৌকা নির্ম্মিত হইল। তীর্থযাত্রার সকল আয়োজনই প্রস্তুত, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; অসংখ্য নরনারী অন্নাভাবে অনাহারে মরিতেছে! দয়াবতী রাসমণি আর নিশ্চিন্ত হইয়া তীর্থযাত্রা করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ কর্ম্মচারিগণকে ডাকাইয়া কহিলেন,—আমার আর কাশীযাত্রায় প্রয়োজন নাই। উহাতে আমার যত অর্থব্যয় হইত, ঐ অর্থ অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্নক্লেশ নিবারণার্থে ব্যয় করা হউক; তাহাতেই আমার সর্ব্বতীর্থদর্শনের ফললাভ হইবে।

দক্ষিণেশ্বরে দেবালয়-প্রতিষ্ঠা এবং তথায় দেবসেবা ও অতিথিসেবার সুব্যবস্থা রাণী রাসমণির একটি প্রধান সংকীর্ত্তি। এই পুণ্যশ্লোকা কৃষক-কন্যার অনুরাগ-ভক্তির রজ্জুতে বদ্ধ হইয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পুণ্যধাম দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কঠোর সাধনাফলে ভাবোন্মত্ত, তখন দেবালয়ের কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে যথার্থই অপ্রকৃতিস্থ উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তর্দর্শিনী ভক্তিমতী রাসমণি পরমহংস-চরিত্রের তথাবিধ মহাপুরুষোচিত লক্ষণসমূহ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্বরূপ-নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎফলে আজ কি ভারতে কি ইউরোপে, কি আমেরিকায়, যে যে স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব চরিত-মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই সঙ্গে সঙ্গে রাণী রাসমণির নাম ও তাঁহার দক্ষিণেশ্বর-কীর্ত্তি-কথা সংকীর্ত্তিত হইয়াছে।

রাণী রাসমণির পুত্রসন্তান ছিল না, মাত্র তিনটি কন্যা। তিনি উল্লিখিতরূপ নানাবিধ সদনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় ধন ও জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ৬৭ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এই অসীম মহিমান্বিতা বঙ্গমহিলার উদ্দেশে অদ্যাপি সুদূর-পল্লীবাসী নিরক্ষর কৃষকেরাও কহিয়া থাকে,—"ধন্য ধন্য রাসমণি! চাষার মেয়ে হলে রাণী!"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গের সঙ্গীত-সম্প্রদায়।

লেখক, গায়ক, বক্তা ও অভিনেতা, ইঁহাদিগের প্রত্যেকেই পৃথিবীর যুগপ্রণয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকেন। মূল কথা, পৃথিবীর যুগপ্রথা প্রতিভার অনুগামিনী। যে দেশের প্রতিভা যতই সন্মার্গগামিনী, সে দেশে ততই মঙ্গলময় যুগের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

লেখকের প্রতিভা অপেক্ষাও যেন বাচক গায়ক ও অভিনায়কের প্রতিভাই লোকচিত্তের উপর সহজেই অধিকতর প্রভাব প্রকাশ করে। গ্রন্থাদির মর্ম্মবোধ আয়াস ও অভিনিবেশ সাপেক্ষ, কিন্তু গীত বক্তৃতাভিনয়াদির শ্রবণ দর্শন তাদৃশ আয়াসসাধ্য নহে, এবং ঐরূপ শ্রবণদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই মন যেন স্বতঃই তন্ময়, তদ্ভাব-ভাবিত ও তৎস্বরূপ হইয়া উঠে।

প্রাচীন বঙ্গে আধুনিকের ন্যায় বক্তৃতা ও অভিনয়ের বাহুল্য ছিল না বটে, কিন্তু সঙ্গীত ও তথাভিহিত গীতাভিনয়ের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ঐ সকল গীত ও গীতাভিনয়াদি ক্রমশঃ বর্ত্তমান যুগের অবতারণায় যে কিয়দংশে সহায়ভূত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গের গীতিপ্রতিভায় প্রথম স্থান জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের। মহাজন-পদাবলীর মাধুর্য্য ওজস্বিতা গাম্ভীর্য্য প্রাঞ্জলতা, এবং ছন্দোলালিত্য ও শব্দবিন্যাস, এমন কি বর্ণবিন্যাসাদি পর্য্যন্ত এতই সুন্দর এতই স্বাভাবিক, যে সুগায়কের কণ্ঠনিঃসৃত ঐ সকল সঙ্গীত শুনিলে মনে হয়, যেন উহাতে অন্তর্নিহিত কি এক বিস্মৃত কাহিনী স্মৃতি-পথে পুনরানয়ন করিয়া দিল, কি এক হারানিধির সন্ধান কহিয়া দিল, ক্ষণেকের মধ্যে দম্ভাহঙ্কারের সুদৃঢ় দুর্গ ভাঙ্গিয়া সমভূম করিয়া দিয়া, চিত্তকে যেন কোথায় হরণ করিয়া লইল!

এই সকল সঙ্গীতের প্রভাবে এক সময়ে লোকচিত্তে নিরীহতা প্রেমিকতা দীনতা সহিষ্ণুতা প্রভৃতির যথেষ্ট প্রশ্রয়দান করিয়াছিল।

সঙ্গীতসমাজে বৈষ্ণব মহাজনগণের পরবর্ত্তী স্থান রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, দেওয়ান মহাশয় প্রভৃতি শাক্ত ভক্তগণের। এ শ্রেণীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

রামপ্রসাদ। এই মহাশক্ত মহাভক্ত যুগনায়ক বহুদিন ধরিয়া বঙ্গের সঙ্গীত-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। বোধ করি এখনও এ বঙ্গে বালকবৃদ্ধবনিতা এমন কেহ নাই, যাঁহার চিত্ত কোন না কোন দিনে উক্ত মহাপুরুষের রচিত কোন না কোন একটি সঙ্গীতপদ-প্রভাবে দ্রবীভূত হইয়া অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের তরেও একবার তদ্‌ভাব-ভাবিত—তন্মুদ্রাঙ্কপ্রাপ্ত না হইয়াছে।

রামপ্রসাদের পদ ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী অনেকেই অবগত আছেন। পূর্ব্বোক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও রামপ্রসাদের ন্যায় একজন সাধক মহাপুরুষ। কেহ কেহ বলেন, কমলাকান্ত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। সে যাহাই হউক, সঙ্গীতচ্ছলে তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভা একদিন বঙ্গসমাজে সবিশেষ প্রভাব প্রকাশ করিয়াছিল, এখনও সে প্রতিভার ক্ষীণরশ্মি বঙ্গের হৃদয়াকাশে ক্বচিৎ প্রতিভাসিত রহিয়াছে। এস্থলে আমরা পাঠকগণের সম্মুখে তাঁহার সে সমুজ্জ্বল প্রতিভার একখানি আলেখ্য উপস্থিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

(বামকিরী ; ঠুংরি)

(কে রে) শবহর-হৃদি-পরে নগনা ॥
(বামা) নাচিছে আনন্দ মনে, (কত) বাজিছে বাজনা।
ভুবন আলো কালো চাঁদে, মুক্ত কেশ নাহি বাঁধে,
আপনার রঙ্গরসে আপনি মগনা ;—
কে কোথা দেখেছ ভাই, (এমন) নব রস এক ঠাঁই,
(বামা) চঞ্চলা কি ধীরা, বুঝা গেল না ॥
কালো কি উজ্জ্বল তনু, শশী কি নির্ম্মল ভানু,
কি দিয়ে করিব মায়ের রূপতুলনা ;
বিধুমুখে মৃদু হাসে, সদা সদানন্দে ভাসে,
হেরিলে বামারে যায় যম-যাতনা ॥
ও রূপ অন্তরে রাখি, নিরন্তর নিরখি,
কমলাকান্তের এই মনে বাসনা ॥

এই সাধকপ্রবরকে সাধারণতঃ সকলে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়া জানিত। ইনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের গুরু ছিলেন, এবং বর্দ্ধমানের নিকট-

বর্ত্তী কোটালহাট গ্রামে বাস করিতেন। এই স্থানে তিনি প্রতিবৎসর মহাসমারোহে কালীপূজা করিতেন।

তখন রাঢ়-অঞ্চলে পথিকগণকে প্রায়ই দস্যুহস্তে পতিত হইতে হইত। শুনা যায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও একদিন ঐরূপ বিপদাপন্ন হইয়া স্বরচিত সঙ্গীত-সহকারে তাঁহার সাধনের ধন শ্যামা-মাকে ডাকিতে লাগিলেন। দস্যুগণ সঙ্গীতশ্রবণে মুগ্ধ ও অনুতপ্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে সাধকশ্রেষ্ঠের চরণে শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ইঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, যখন ইনি শয্যাশায়ী হইলেন, আর জীবনের আশা রহিল না, তখন মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আসিয়া সজ্ঞান-গঙ্গালাভ-নিমিত্ত ইঁহাকে কাল্‌নার ঠাকুরবাড়ীতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; কিন্তু গুরু কমলাকান্ত ভক্তিমান্ শিষ্যের এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। ইহাতে মহারাজ গুরুকে একান্ত বিষয়াসক্ত মনে করিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। কিন্তু অবিলম্বেই কমলাকান্তের অন্তকাল উপস্থিত হইলে, যখন তাঁহাকে সকলে গৃহবহির্ভাগে আনিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করাইল, তখন মহারাজ ও অন্যান্য সকলেই দেখিলেন, সাধকশিরোমণির শিরোদেশে সহসা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া পাতালগঙ্গার স্বচ্ছ সলিলধারা উত্থিত হইয়া তাঁহার মস্তকে মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে নিপতিত হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর সবিশেষ বুঝিলেন,—সাধারণতঃ তৃষ্ণাই গঙ্গার সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু ক্বচিদ্ বা গঙ্গাও যে তৃষ্ণার অনুগামিনী হইয়া থাকেন, এ কথাও মিথ্যা নহে।

দেওয়ান মহাশয়ের গান অতীতযুগের গায়কগণের মধ্যে বড়ই সমাদৃত হইত। এই দেওয়ান মহাশয় যে কে, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ বলেন, "অকিঞ্চন" ও "দেওয়ান মহাশয়" একই ব্যক্তি। যাহাই হউক, এই দেওয়ান মহাশয়ের ও অকিঞ্চনের গানগুলিতে এক সময়ে বাঙ্গালীর চিত্তে বড়ই ভাবোদয় হইত। সে ভাব ক্রমশঃ সামাজিক আচার বিচারেও প্রভাব প্রকাশ করিত। নিম্নে আমরা দেওয়ান মহাশয়ের ও অকিঞ্চনের রচিত দুইটী গান প্রকাশিত করিলাম, পাঠকগণ উহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন, রচয়িতা যিনি বা যাঁহারাই হউন, তাঁহার বা তাঁহাদের সঙ্গীতজ্ঞান ব্যতীত ভাষাভিজ্ঞতাও যথেষ্ট।—

(খাম্বাজ, একতাল)

নীলবরণী নবীনা রমণী, নাগিনীজড়িতা জটাবিভূষিণী,
নীলনলিনী জিনি ত্রিনয়নী, নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী।
নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগমে উহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে জীবের উপায়, নিত্যসিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী ॥
নিতম্বে নিচোল শার্দ্দূলছাল, নীলপদ্ম করে করী করবাল,
অপর দুকর নৃমুণ্ড খর্পর, লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী ॥
নিরমল-নিশাকর-কপালিনী, নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখাশ্রেণী,
নৃকরনিকরে চারু সুশোভিনী, লোল-রসনা করাল-বদনী ॥

—(দেওয়ান মহাশয়)

(পুরবী, কাওয়ালী)

মধুসূদন হে মুকুন্দ-মুরারি।
শ্যাম সুন্দরবর কুঞ্জবিহারী ॥
গোপীনাথ গোপাল দয়ানিধি,
প্রপন্ন-বিপদভঞ্জন গিরিধারী ॥
সুরেশ সুরেশ্বর সব-সুখ-সাগর, ত্রিভুবন-জন-হিতকারী ;
দীননাথ, অকিঞ্চনে তার হে, করুণানয়নে প্রভো বারেক নেহারি ॥

—(অকিঞ্চন)

রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্ত সঙ্গীতকারগণের সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গে শক্তি-উপাসনার প্রবলতা ছিল। বৈষ্ণব-উপাসকদলের সংখ্যাও তখন কম নহে। উক্ত সময়ের সঙ্গীতকারগণও তখন শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল সঙ্গীত বঙ্গসমাজে প্রচলিত হইল, ঐ সকলের রচয়িতৃগণ অধিকাংশই রীতিমত ব্যবসায়ী, অর্থাৎ কবির দল বা যাত্রার দল বাঁধিয়া বায়না লইয়া গান করিয়া বেড়াইতেন।

কবিওয়ালাগণের মধ্যে হরুঠাকুর, রামবসু, নীলু পাটনী, এণ্টনি সাহেব, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা, এবং যাত্রাওয়ালাদিগের মধ্যে বদন অধিকারী, দুগো গড়িয়াল, বকু মিঞা (জোলা), তৎপরে গোপ্‌লা উড়ে, গোবিন্দ অধিকারী, লোকা ধোপা প্রভৃতিই প্রসিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইলেন মদনমাষ্টার (পরে বৌমাষ্টার প্রভৃতি), তৎপরে ব্রজরায়, মতিরায়, বৌকুণ্ড প্রভৃতি। ইতোমধ্যে

প্রাদুর্ভূত রাধারমণ বাউল মধুসূদন কিন্নর (কান্), দাশরথি রায়, সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

আমাদের অনেক সরলচিত্ত পাঠক মনে করিতে পারেন যে, যে গ্রন্থে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিবেকানন্দ স্বামী, সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাজনগণের চরিত বর্ণন করা হইল, সেই গ্রন্থে সামান্য বদন অধিকারী, বকু মিঞা বা গোপ্‌লা উড়ে প্রভৃতি পেশাদার যাত্রাওয়ালাদিগের নামোল্লেখ একান্তই অসঙ্গত। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই সকল পেশাদার বঙ্গের শিরায় শিরায়, অস্থিমজ্জায় পর্য্যন্ত, ইহাদের গান বক্তৃতাদির রস সঞ্চারিত করিয়াছে।

কলিকাতা মহানগরীর কত কত মহারথী ব্যক্তির ও শত শত শিক্ষিত বঙ্গ-যুবকের সমক্ষে দাঁড়াইয়া সেদিন সেই স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ শ্রীলশ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন যখন " Philosophy and Madness in Religion " নামক হৃদয়োন্মাদক মহাবক্তৃতা প্রদান করিলেন, ধনী মানী গুণী জ্ঞানী যুবক বৃদ্ধ প্রভৃতি অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ চিত্রার্পিত পুত্তলিকাপ্রায় নিঃস্পন্দভাবে বসিয়া কেশবের মুখনিঃসৃত মন্ত্রসুধা পানে যেন মাতোয়ারা হইয়া গেলেন, প্রত্যেক নেত্রেই দর দর ধারে অশ্রু পাত হইতে লাগিল, সে দিনের সে কাণ্ড—ভক্তজীবনের সে অপূর্ব্বলীলা যিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, কেশবচন্দ্র তদানীন্তন শিক্ষিত বঙ্গের আধ্যাত্মরাজ্যে কি অপূর্ব্ব রাজত্বই স্থাপন করিয়াছেন!

কিন্তু আবার ঐ সময়েই বঙ্গের কোন নগণ্য পল্লীতে গিয়া দেখুন, পল্লীর প্রান্তভাগে এক প্রশস্ত চত্বরে হয় ত বারইয়ারির ধুম্ লাগিয়া গিয়াছে! বৃহৎ মণ্ডপমধ্যে জার্ম্মাণি-নির্ম্মিত বিচিত্র ডাকের সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মহাদেবী 'মাতঙ্গী'-মূর্ত্তিতে বিরাজিতা, সম্মুখে বংশনির্ম্মিত বিস্তীর্ণ নাট্যশালায় যাত্রারম্ভ!

লোকে লোকারণ্য! ব্যাপার কি?—না, মতিরায়ের "বস্ত্রহরণ"!

সাধ্য কি যে, লোকের ভিড় ভাঙ্গিয়া আপনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবেন! বহুকষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী কোন একটি শতারূঢ় অশ্বথ বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া একবার নেত্রপাত করুন,—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! দর্শন মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, পল্লীবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালী-দল কতপ্রকার বিভিন্ন বিভিন্ন পাঠশালায় শিক্ষিত! দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বঙ্গের বর্ত্তমান যুগপ্রবর্ত্তনে আদৌ বকুমিঞা হইতে মতিরায় পর্য্যন্ত পেশাদারী যাত্রাওয়ালাদের প্রবল কর্ত্তৃত্ব ছিল কি না!

ঐ দেখুন, সভাস্থলে শ্বেতশ্মশ্রুধারী ভীষ্মদ্রোণ অধোবদন! রাজাভরণভূষিত

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নির্ব্বাক্ নিশ্চেষ্ট! গদাধারী ভীমদর্শন ভীমসেন অগ্নিনেত্রে এক একবার অগ্রজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যুধিষ্ঠিয়ের মৌনভাব দেখিয়া মহাবীর বৃকোদর আবার মন্ত্রৌষধরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গবৎ নম্রশির হইয়া রহিতেছেন, অপব পাণ্ডবত্রয়ও তথৈবচ! আর, প্রচণ্ড চণ্ডাল দুঃশাসন নিরীহা দ্রুপদনন্দিনীকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক সভামধ্যে আনিয়া বিবস্ত্রা করিতে সমুদ্যত! অশরণা রাজপত্নী রাজদুহিতা দ্রৌপদীদেবী হতাশ হইয়া কেবল হা মধুসূদন! হা মধুসূদন! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন!

এখন একবার শ্রোতৃমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করুন্! প্রাচীন বা ভদ্রগণের ত কথাই নাই, ঐ দেখুন্ ডোম-বৌ, মুচী-বৌ, পাঁচীর মা পর্য্যন্ত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, আর অবিরাম আঁচল দিয়া চোখ্ মুছিতেছে; পঞ্চবর্ষীয়া পাচী পর্য্যন্ত হতজ্ঞান!—সে একবার মায়ের কোল হইতে উঠিয়া দাড়াইয়াছিল, পরে অন্যমনস্কতা হেতু পার্শ্ববর্ত্তী অপর এক রমণীর কোলে গিয়া বসিয়া আছে। সে বমণীরও বাহ্যজ্ঞান রহিত! মুসলমানগণ পর্য্যন্ত মোহিত! এক মিঞা দ্রৌপদীর অবমাননা দেখিয়া অপর মিঞাকে বলিতেছেন,—'আচ্ছা মাজ্‌চাচা, ধেরপদী-বিবির খসম্-মুমিন্দিরা কি একবাবেই মবে' আছে! এই বে-ইমান দুশ্‌মন্‌টাকে জবাই করে' ফেল্লে না কেন্?'

এ দিকে অভিনয়-সভার অপর পার্শ্বে দ্বারকার দৃশ্য! দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ বস্ত্রাকর্ষণ ও 'হা মধুসূদন!'-আর্ত্তনাদে মাধব-পত্নী রুক্মিণীদেবীর মনঃপ্রাণ স্বতঃই অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। রুক্মিণী ঠাকুরাণীর বোধ হইতেছে, যেন কেহ তাঁহার স্বীয় কেশ ও বসন আকর্ষণ করিতেছে! তিনি ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্ম-নিবেদন করিতেছেন। অমনি তাঁহার পক্ষ হইতে দিব্যাভরণ-ভূষিত কোকিলকণ্ঠ বালকদল ইণ্টারপ্রেটার রূপে উঠিয়া দাড়াইয়া মধুব ঝঙ্কারে বুঝাইতে লাগিল:—

"যন্ত্রণা সহে না, প্রাণকান্ত এ কি হ'ল!
ও হে দ্বারকেশ, হৃষীকেশ, মম কেশ কে টানে বল।
আমার মনে পড়ে, সে পঞ্চবটী-বন,
কেশে ধরেছিল রাবণ; হে, মরি মরি সে ভয়ে মরি, ইত্যাদি—"

এইবার জাঙ্গাল ভাঙ্গিল! নীরব রোদন-পরায়ণ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে বেগ-ধারণ অসাধ্য হইল। হিন্দু পুরুষগণ সহসা সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন,

স্ত্রীগণ হুলুধ্বনি করিলেন, মুসলমানগণও উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লা আল্লা' বলিয়া জিকীর ছাড়িলেন! ক্ষণেকের তরে সকলেই যেন আত্ম পর প্রভেদজ্ঞান ভুলিয়া গেলেন, সকলেরই চিত্ত যেন সমভূম হইয়া গেল! পরক্ষণেই দেবর্ষি-বেশধারী প্রতিভান্বিত মতিলাল রায় মহাশয়, তাঁহার দিব্যপ্রভা-সমন্বিত ভক্তিরসাপ্লুত নয়ন দুইটী দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া মনোমোহন সুমধুর বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে ব্যাপারখানা বুঝুন্! এ রঙ্গ একবার নহে, একস্থানে নহে, প্রতি-বর্ষে এ বঙ্গে শতাধিকবার শতাধিকস্থানে! এখন বুঝিয়া দেখুন, বাঙ্গালীর চিত্ত কতরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত! বুঝিয়া দেখুন্, হরুঠাকুর নীলুপাট্‌নী, বাকুমিঞা গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথি রায় গোপ্‌লা উড়ে, মধুকান্ নিধুবাবু, ইঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষীয় একশ্রেণীর অপূর্ব্ব শিক্ষক কি না, ইঁহারাও যুগপ্রবর্ত্তনে সহায়ভূত কি না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিভাই যুগপ্রণয়নের প্রধান সাধয়িত্রী; উপরি-উক্ত কবির দলে ও যাত্রার দলেও যে প্রতিভান্বিত ব্যক্তিগণের অসদ্‌ভাব ছিল তাহা নহে। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ তাঁহাদের কাহারও কাহারও সংক্ষিপ্ত জীবনী ও যথাসম্ভব প্রতিভা-পরিচয় প্রদান করিতেছি।—

হরু ঠাকুর।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অপরার্দ্ধভাগেই বঙ্গে হরুঠাকুর নীলুপাট্‌নী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাগণের প্রথম আবির্ভাব। ইঁহাদের মধ্যে হরুঠাকুরই সর্ব্ব-প্রধান।

জাতিতে ব্রাহ্মণ, হরুঠাকুরের প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। নিবাস কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়ায়, জন্ম ১৭৩৯ খৃঃ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী।

হরেকৃষ্ণ বাল্যকালে বৎসরদুই মাত্র পাঠশালায় বাঙ্গলা লেখাপড়া শিখিয়া-ছিলেন; তৎপরেই পিতৃবিয়োগ ঘটিল, হরুও লেখাপড়া ছাড়িয়া গান বাজনা আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু বাগ্‌দেবী তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন না। লেখাপড়া না শিখিয়াও হরু স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তির অধিকারী হইলেন।

ক্রমে যখন সংসার অচল হইয়া উঠিল, তখন জননীর ও প্রতিবেশিগণের

প্রবোধ ও ভৎর্সনা বাক্যে বাধ্য হইয়া হরেকৃষ্ণ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় মূর্খের পক্ষে চাকরি করা অসম্ভব। অগত্যা হরুঠাকুর কবির দল বাঁধিয়া বায়না লইয়া গান করিতে লাগিলেন। কবিত্বপ্রতিভা ও সঙ্গীতনৈপুণ্য হেতু অচিরেই তাঁহার প্রসার প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল, অর্থাগমও যথেষ্ট হইতে লাগিল। তিনি কবির গান গাইয়া এতই অর্থোপার্জ্জন করিতেন যে, দুই এক শত টাকা মূল্যের পারিতোষিক দ্রব্যাদিতে আর তাঁহার মন উঠিত না।

একবার মহারাজ নবকৃষ্ণ হরুঠাকুরের গানে মুগ্ধ হইয়া পুরস্কার স্বরূপ নিজ গাত্রস্থিত এক জোড়া শাল লইয়া হরুর গায়ে জড়াইয়া দিলেন। হরু মহারাজের এই দান তাঁহার পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ ও অবমাননাসূচক মনে করিয়া, শাল-জোড়াটি গাত্র হইতে খুলিয়া ঢুলীর মস্তকে ফেলিয়া দিলেন।

হরুঠাকুরের আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল, তিনি উপস্থিত ক্ষেত্রে সমস্যা পূরণ করিতে পারিতেন। এই গুণে তিনি সময়ে সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার সভাসদরূপে পরিগৃহীত হইতেন। একবার নবকৃষ্ণ সভাস্থলে সমস্যা উত্থাপন করিলেন ;—

"বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে!"

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী কেহই এ সমস্যা পূরণে সমর্থ হইলেন না। হরু কিন্তু তৎক্ষণাৎ উত্তর মিলাইয়া দিলেন,—

"একদিন কৃষ্ণধন, মৃত্তিকা করি ভোজন,
গোকুলে ধুলায় পড়ি কাঁদে।
(রাণী) অঙ্গুলী হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে,
বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥"

হরুর গুরুভক্তি বড়ই অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথমে কবির দল করিয়া যে সকল গান বাঁধিয়াছিলেন ঐ সকল গান রঘুনাথ নামক এক জন তন্তুবায় দ্বারা সংশোধিত করিয়া লন। এ জন্য ঐ সকল গানের শেষপদে তিনি নিজ নামের পরিবর্ত্তে চিরদিনই গুরু রঘুনাথের নামে ভণিতা দিয়া গাওনা করিতেন। এইরূপে গুরুভক্ত হরুঠাকুর নিজ যশোরাশির অগ্রভাগ গুরুকে উৎসর্গ করিয়া বড়ই মহত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এ যুগে আমরা কিন্তু অনেককে

পরের গান নিজের নামে ভণিতা দিয়া গাইতেও শুনিয়াছি, ও পরের রচনা চুরি করিয়া নিজেকে রচক বলিয়া পরিচয় দিতেও অনেককে দেখিয়াছি।

হরুঠাকুর শেষ বয়সে কবি গাওনা ছাড়িয়া দিয়া মহারাজ নবকৃষ্ণের পারিষদ রূপে দিনাতিপাত করিতেন। অনুমান ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে হরু ঠাকুরের পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

নীলু পাটনীও হরুঠাকুরের সমব্যবসায়ী ও সমসাময়িক ব্যক্তি। হরুর সহিত নীলুর প্রায়ই গানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিত। নীলুরও প্রতিভা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সে সময়ে কবির গানে অশ্লীলতার সমধিক প্রবর্ত্তন হয় নাই, তবে ব্যঙ্গোক্তির যথেষ্ট প্রচলন ছিল। একবার কোন এক আসোরে নীলমণি বৃদ্ধ হরেকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপ ব্যঙ্গোক্তি করায়, হরু সঙ্গীতপ্রসঙ্গে উত্তর করিলেন,—আমি স্বয়ং হরি ঠাকুর, তুমি সামান্য পাটনীর ছেলে, আমার প্রতি তোমার ব্যঙ্গোক্তি বড়ই অপরাধজনক।

অমনি নীলমণি প্রত্যুত্তরে গাইলেন,—

"তুমি, এই হরু কি সেই হরি ঠাকুর?—
ও যাঁর শ্রীপাদপদ্ম শিরে ধবে' উদ্ধার হ'ল গয়াসুর।
বটে, ব্রাহ্মণ আর শালগ্রাম উভয়ে অভিন্,
কিন্তু বায়াত্তুরে পেয়ে ঠাকুর হয়েছ অচিন্,
তোমার চক্করে লেগেছে পোকা, স্বর্ণরেখা অতিক্ষীণ,
ঠাকুর, বাঁচবে না আর বেশি দিন; ইত্যাদি।"

হরু ঠাকুরের মাথায় টাক্ পড়িয়াছিল; তখনকার লোকের বিশ্বাস ছিল যে, টেকোপোকা নামে একরূপ পোকা লাগিলেই মানুষের মাথায় টাক্ ধরে। তদ্ব্যতীত, সে দিন হরুঠাকুরের গলায় এক গাছি মলিন সরু পৈতা ছিল। অনেকেই জানেন, শালগ্রামশিলায় চক্র থাকে এবং মধ্যদেশ বেষ্টন করিয়া একটী স্বর্ণরেখা থাকে। এই চক্র ও স্বর্ণরেখার সহিত হরুর টাকের ও পৈতার তুলনা করিয়া নীলু উপস্থিতক্ষেত্রে যৎতৎক্ষণেই কি চমৎকার ব্যঙ্গোক্তি করিলেন! ইহা বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয়, সন্দেহ নাই।

এই সকল কবিওয়ালার দেবীবন্দনা, গোষ্ঠ, বিরহ, সখীসংবাদ প্রভৃতি-বিষয়ক গীতগুলি অতীব সুমধুর ও নিরতিশয় ভাবোদ্দীপক। সে সময়ে এ বঙ্গ

এই ভাবের বড়ই ভাবুক হইয়াছিল। তৎপরে ক্রমে ক্রমে পাঁচালীওয়ালা ও যাত্রাওয়ালাগণ একে একে আসোরে আসিতে লাগিলেন।

দাশরথির ছড়া, বদনের তুক্কো, গোবিন্দের মানভঞ্জন, বকুমিশ্রার দক্ষযজ্ঞ, লোকাধোপার শ্রীমন্ত-মশান, মদনমাষ্টারের মদন-ভস্ম, ব্রজরায়ের অভিমন্যুবধ, মতিরায়েব ভীষ্মের শরশয্যা ইত্যাদি যাঁহারা শুনিয়াছেন, এবং আবালবৃদ্ধবনিতা শতশত বঙ্গবাসিগণকে সাগ্রহে সাশ্রুনয়নে শুনিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন ঐ সকল প্রতিভান্বিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালীব ঘবে ঘরে কি অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন!

অবশ্য আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, উঁহাদের সকলেই সর্ব্বদা সর্ব্বাংশে সমাজেব হিতসাধন করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার্য্য নহে যে, ভালই হউক আর মন্দই হউক, লোকচিত্তগঠনে কিয়দংশ কর্ত্তৃত্ব প্রত্যেকেরই ছিল। ইঁহাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল।——

দাশরথি রায়—

জাতিতে ব্রাহ্মণ, জন্ম ১৮০৪ খৃঃ অব্দে কাটোয়ার নিকট বাঁদমুড়া গ্রামে, মাতুলালয় অগ্রদ্বীপেব নিকট পীলাগ্রামে। ইনি যথার্থই একজন সুকবি। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরেব ন্যায় দাশরথি রায়ের দুইএকপদ কবিতা অদ্যাপি পল্লীবাসিনী বাঙ্গালীর মেয়েদেরও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। দাশরথি বাল্যকালে যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা ও ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। পরে নীলকুঠীতে চাকরি আরম্ভ করেন।

স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিহেতু দাশরথি গান ও ছড়া বাঁধিতে সবিশেষ পটুতালাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ পীলা গ্রামের কোন একটি কবির দলে ইনি ছড়া ও গান বাধিতেন। পরে এক স্থানে কবির গান গাইতে গিয়া প্রতিপক্ষ দলের নিকট বড়ই অপদস্থ হইয়া আসেন। সেই হইতে দাশরথি রায় কবিব দলের সংস্রব ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজ বন্ধুবয়স্যাদি লইয়া একটি পাঁচালীর দল গড়িলেন। পাঁচালী-গাওনায় ক্রমে তিনি অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। বঙ্গের বহুস্থানেই তৎকালে তাঁহার পাঁচালী গাওনা হইত, অর্থও যথেষ্ট পাইতেন। দাশরথি রায়ের ছড়ায় অনেক স্থানে অশ্রাব্য অশ্লীলোক্তি আছে বলিয়া দাশরথি রায়কে অসাধু লোক মনে করা নিতান্ত ভ্রম। দাশরথি বাস্তবিকই মহাসাধু মহাভক্ত। প্রকৃত প্রতিভা প্রকৃতই নবরসাত্মিকা, যথন

যে রস আশ্রয় করিবে, তাহাতেই নূতনত্বের ও চমৎকারিত্বের পরিচয় দিবে। কালিদাসাদি মহাকবির রচনাতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কুমারে "নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ স্বষ্টেঃ কেবলাত্মনে। গুণত্রয়-বিভাগায় পশ্চাদ্‌ভেদ-মুপেয়ুষে॥" তথা "জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ। জগদ্‌যোনিরযো-নিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ॥" প্রভৃতি কবিতাও যে হস্তে লিখিত রঘুর নবম স্বর্গের আদিবসাত্মক শ্লোকগুলিও সেই হস্তেই লিখিত।

দাশরথি রায় মহাশয়ের অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় স্বরূপে আমরা তাঁহার একটি দ্ব্যর্থবোধক সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। রাধিকার কলঙ্কভঞ্জনোদ্দেশ্যে যখন গোপরাজগৃহে শ্রীকৃষ্ণ কপটজ্বরাক্রান্ত, সেই সময়ে তিনিই পুনরায় মায়াবলম্বনে বৈদ্যমূর্ত্তি ধরিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত! বৃন্দাসখীর সহিত বৈদ্যবেশ-ধারী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইলে, বৃন্দা বৈদ্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তদুত্তরে বৈদ্যের উক্তি :—

(সুরট মল্লার, একতাল)

"ধনি, আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার বিশেষ গুণ সে জানে॥
যুগে যুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে করি চূর্ণ সমুদয়,
গঙ্গাধর চূর্ণ আমারই আলয়, তুল্য কেবা মম গুণে;—
ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক, আমারই স্বষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি-বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ, ভ্রমণ করি ভুবনে॥
আমারই নির্ম্মাণ করা চণ্ডেশ্বর, আমারই দেখ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,
জয়মঙ্গলাদি কোথা পাবে নর, কেবলই আমারই স্থানে;—
(ছাড়ি) বিষয়লালসা যে লয় বৈরাগ্য, জনমের মত করি তায় আরোগ্য,
বাসনা-বাতিক প্রবৃত্তি-পৈত্তিক ঘুচাই তার যতনে॥"

উপরিউক্ত গীতটিতে নিদান শব্দে এক পক্ষে আয়ুর্ব্বেদসম্মত নিদান নামক গ্রন্থ, অপর পক্ষে অন্তিম কাল; এইরূপ গঙ্গাধর চূর্ণ=(এক পক্ষে) তন্নামক আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধবিশেষ, (অপর পক্ষে) মহাপ্রলয়ে মহাদেব অন্তর্হিত; চতুর্ম্মুখ=তন্নামক ঔষধ ও ব্রহ্মা; চণ্ডেশ্বর=ঔষধবিশেষ ও শঙ্কর; সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর=ঔষধবিশেষ, সর্ব্বশরীর সুদৃশ্য; জয়মঙ্গল=জয়মঙ্গলরস নামক ঔষধ, (অপর পক্ষে) জয় ও মঙ্গল।

এরূপ সুন্দর দ্ব্যর্থবোধক সঙ্গীত বাঙ্গালা সাহিত্যে গৌরবের সামগ্রী, সন্দেহ নাই। ভক্ত দাশরথি রায় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদটি বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন :—

দাশরথি রায় একবার শ্বাসকাস-রোগাক্রান্ত হইয়া বড়ই কষ্টভোগ করিতেছিলেন; ঐ সময়ে একদিন রাঢ়দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণসন্তান ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ্য কামনায় শিবমন্দিরে ধন্না দিবার নিমিত্ত বৈদ্যনাথধামে যাইতেছিলেন। পথে রেলগাড়ীর মধ্যে উক্ত ব্রাহ্মণ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন, স্বয়ং শঙ্কর ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া কহিতেছেন, "তোর আর ধন্না দিতে হইবে না, তোর পীড়া সারিয়াছে; তুই মাত্র এই কাজ করিস্ যে, দাশরথি রায়কে বলিস্ যেন সে আসিয়া আমাকে তাহার পাঁচালী শুনাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারও আরোগ্যলাভ হইবে।"

পথে এই দৈব আদেশ পাইবামাত্র ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং দাশরথি রায় মহাশয়কেও ঐ আদেশবাণী জ্ঞাপন করিলেন। রায় মহাশয় এই কথা শুনিয়া সহর্ষে সদলবলে বৈদ্যনাথধামে গিয়া এক মাস কাল অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ পুরীমধ্যে পাঁচালী গান করেন। শুনা যায় এই স্থানেই তিনি তাঁহার কাশীখণ্ড নামক পাঁচালী প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে শিবসমক্ষে গান করেন। ইহাতে নাকি শিবের আদেশ হয় যে ঐ কাশীখণ্ড পাঁচালী গাইয়া যেন তিনি ব্যবসায় না করেন। রায় মহাশয়ের শ্বাসরোগ সারিয়াছিল সত্য, কিন্তু কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধের দায়ে শেষোক্ত আদেশটি রক্ষা করিতে না পারায়, অপরাধ হেতু তাঁহার শরীরে অপর একটি বিশিষ্ট রোগের উৎপত্তি হইয়াছিল।

এই প্রতিভাশালী পুরুষ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ইহ ধাম পরিত্যাগ করেন।

সে কালে এই সকল সঙ্গীত পাঁচালী ও পালা প্রণেতৃদিগের মধ্যে প্রকৃতই দুই একটি সাধু মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ভক্ত রসিকচন্দ্র রায়—

পাঁচালী ও সঙ্গীতরচয়িতৃগণের মধ্যে বাস্তবিকই একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সাধক। ইনি জাতিতে কায়স্থ; জন্ম বাং ১২২৭ সালে, পালাড়াগ্রামে; পিতার নাম রামকমল রায়। রামকমল স্বীয় মাতামহ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী

হইয়া উত্তরকালে হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের নিকটে বড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

ভক্ত রসিকচন্দ্র হরিভক্তিচন্দ্রিকা, কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর, দশমহাবিদ্যাসাধন, পদাঙ্কদূত, শকুন্তলাবিহার, বর্দ্ধমানচন্দ্রোদয় প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ, বহুসংখ্যক সাধন-সঙ্গীত ও একাদশ খণ্ড পাঁচালী রচনা করেন। ইহার রচিত নিম্নলিখিত বীর-রসাত্মক সাধনসঙ্গীতটি একসময়ে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই জানিতেন এবং গাইতেন :—

(মূলতান, একতাল।)

আয় মা সাধন-সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে॥
আরোহণ করি পুণ্য-পুষ্পরথে, ভজন পূজন দুটি অশ্ব যুড়ি তাতে,
(দিয়ে) জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্মবাণ যুড়ে আছি ধরে॥
(মাগো) দেখ্‌বো এবার রণে, শঙ্কা নাই মরণে,
ডঙ্কা মেরে ল'ব মুক্তি-ধন ;—
রসনা ঝঙ্কারে, কালীনাম হুঙ্কারে, কার সাধ্য মোর সনে করে রণ ?—
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী, এইবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ি,
ভক্ত রসিকচন্দ্রে বলে, মা তোমারই বলে, (আজ) জিনিব তোমারে॥

এই মহা-সাধকের আর একটি সঙ্গীতের কিয়দংশ পাঠক মহাশয়গণের পরিতোষার্থে নিম্নে প্রকাশিত করিলাম :—

(মূলতান, একতাল।)

মা আমার অন্তরে, জাগো গো কুলকুণ্ডলিনি।
মম চতুর্দ্দলে, আধার কমলে, কত নিদ্রা যাও আর নিদ্রারূপিণি॥
শম্ভু সহ নিদ্রা যাও মা কত আর, ভক্তের ভক্তিযোগে জাগো গো একবার,
(আমার) গেল সুদিন, এল কুদিন, এ দীনের দশা কি হবে মা ;—
যাতায়াত করি সূক্ষ্মপথমধ্যে, কবে দেখা দিবি সহস্রদলপদ্মে,
রসিকচন্দ্রের হৃদিপদ্মে, তব শ্রীপাদপদ্মে, কবে পদ্মে পদ্মে মিলন হ'বে জননি॥

রসিকচন্দ্রের বাসভবনের নিকট একটি সুন্দর কুসুমোপবন ছিল। সাধক-

প্রবর অধিকাংশ সময়েই সেই কানন-বাটীতে একাকী বসিয়া তাঁহার মায়ের "শ্রীপাদপদ্মে" আর স্বীয় "হৃদিপদ্মে"—সেই "পদ্মে পদ্মে মিলন"-রূপ মহাযোগ সাধন করিতেন।

দাশরথি রায়ের সহিত ভক্ত রসিকচন্দ্রের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল। রসিকচন্দ্রের পুত্রের নামও দাশরথি রায়। বাং ১৩০০ সালে রসিকচন্দ্র পরলোকে তাঁহার চিরকাঙ্ক্ষিত শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়প্রাপ্ত হইলে, বঙ্গবাসী পত্রিকার সুযোগ্য পরিচালক স্বর্গীয় মহাত্মা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত ভক্তপ্রবরের স্বর্গারোহণ-বৃত্তান্ত সংবলিত একখানি পত্র স্বীয় পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই পত্রখানির নিম্নভাগে রসিকচন্দ্রেব উপযুক্ত পুত্র, "ভাগ্যহীন—দাশরথি রায়" বলিয়া, স্বীয় নাম স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন। পত্রলিখিত বিবরণপাঠে জানা যায়, প্রশংসিত সাধকশ্রেষ্ঠ ৭৩ বৎসর বয়সে সহসা একদিন পুত্র দাশরথিকে ইঙ্গিতে স্বীয় দেহত্যাগের কথা জানাইলেন। দাশরথি অমনি মাতুলালয় হইতে জননীকে বাটীতে লইয়া আসিলেন। পরে মাতৃভক্ত মহাপুরুষ রসিকচন্দ্র প্রাকৃত মানুষ-নেত্রেই দেখিতে লাগিলেন, দূর হইতে তাঁহার মায়ের শ্রীপাদপদ্ম-জ্যোতিঃ ক্রমশঃ দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি এ কথা পত্নী ও পুত্রসমীপে প্রকাশ করিয়া "ওই দেখ, ওই দেখ!" বলিয়া দেখাইতে লাগিলেন। সেই অলৌকিক ব্রহ্মজ্যোতিঃ তাঁহার চক্ষে ক্রমশঃই সুপ্রকাশ, ক্রমশঃই অগ্রসর! আর রসিকের দেহও ক্রমশঃ অসাড় হইয়া আসিল। পরক্ষণেই তাঁহার চিরপ্রার্থিত সেই মহামিলন! ভৌতিক পিঞ্জর ভূতলে পড়িয়া রহিল, যে বনের বিহঙ্গ সেই বনে পলাইয়া গেল!

ইদানীন্তন অনেক সঙ্গীতেও "রসিক" নামের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে সকল সঙ্গীত যশোর—রায়গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ বালকসঙ্গীত-প্রণেতা স্বর্গীয় রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও একজন ভক্ত কবি। তাঁহার রচিত গানগুলিতেও স্থানে স্থানে কবিত্ব ও ভক্তিরসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত ইত্যাদিতে যদি লোকচিত্ত গঠনে সহায়তা করিয়া থাকে, তবে রামপ্রসাদের গান, কবির গান, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, রসিকরায়ের গান, গোবিন্দ অধিকারী, মধুকান, মতিরায় প্রভৃতির গানেও যে অল্পাধিক পরিমাণে সেরূপ সহায়তা করে নাই, এরূপ মনে করা অসঙ্গত। বক্তা প্রচারক বা লেখকগণও যে অর্থে যুগনায়ক

বলিয়া পরিগণ্য, সঙ্গীতকারগণও সেই অর্থে উক্ত আখ্যায় সমাখ্যাত হইবার সম্যক্ অধিকারী, সন্দেহ নাই।

এই সকল সঙ্গীতকারগণের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারী ও মধুসূদন কিন্নরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গোবিন্দ অধিকারী—

একজন প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। ইঁহার গান ও পালা সমস্তই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক। অনুমান বাং ১২০৭ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত জঙ্গিয়াপাড়া গ্রামে অধিকারী-বৈষ্ণব-বংশে ইঁহার জন্ম। বাল্যবয়সে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া ইনি গোলোকদাস কীর্ত্তনিয়ার নিকট কীর্ত্তনগান অভ্যাস করেন, এবং পরে 'কালিয়-দমন' নামক যাত্রার দল বাঁধিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই দলে তিনি স্বয়ং বৃন্দাদূতী সাজিতেন। গোবিন্দের দূতীপনায় ও তাঁহার রচিত গানে সকলেই বিমোহিত হইত। এই যাত্রা-ব্যবসায়ে গোবিন্দ যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া শেষে কিঞ্চিৎ জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন। অনুমান ১২৮২ সালে গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যু হয়। তৎপরে বীরভূমনিবাসী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ভক্ত গায়ক গোবিন্দের অনুকরণে যাত্রার দল বাঁধিয়া ব্যবসায় করিতে থাকেন।

নীলকণ্ঠ—

পূর্ব্বে গোবিন্দ অধিকারীর দলে ছিলেন, পরে স্বয়ং দল প্রস্তুত করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্রাহ্মণ। নীলকণ্ঠ খঞ্জ ছিলেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলির শেষ পদে প্রায়ই গুরু গোবিন্দ অধিকারীর নাম প্রথমে উল্লেখ করিয়া পরে নিজ নামের ভণিতা দেওয়া আছে; এবং কোন কোন গানে নিজ খঞ্জত্বেরও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; যথা,—

"(শ্যামের) চরণ পাশে লেগেছে ফাঁস গোবিন্দদাস কণ্ঠখঞ্জে।"

"ওমা, অবিচার তোর আগাগোড়া।
দেশ-বেড়ান-ব্যবসা দিয়ে, কণ্ঠে কর্‌লি জন্মখোঁড়া॥" ইত্যাদি।

অনুপ্রাসবিচারে বঙ্গসঙ্গীতকারগণ-মধ্যে নীলকণ্ঠ অদ্বিতীয়। তাঁহার সঙ্গীতের রসভাবও প্রশংসনীয়, ভাষাও উচ্চ-অঙ্গের; তবে তাহাতে কখন কখন প্রসাদগুণের অভাব দেখা যায়। অপর পক্ষে, বাজ্‌নার বোলের সহিত

পদবিন্যাসের সমন্বয় নীলকণ্ঠের ন্যায় অন্য কোন যাত্রাওয়ালার গানে আছে কি না সন্দেহ ; যথা :—

(সুরট মল্লার ; একতাল)

"দ্বিরদ-গমন নীরদকাঁতি, ক্ষীরোদনন্দন শ্রীনখ-ভাঁতি,
শ্রীমুখপদ্মে পাঁতি পাঁতি মাতি মাতি মধুপ গুঞ্জে।
কটিধটীধৃতপীতবসন, দম্ভে দামিনীদাম দমন, ইত্যাদি।"

পাঁচালীকার রসিকচন্দ্রের ন্যায় নীলকণ্ঠও একজন সাধক ভক্ত। ইনি শেষ বয়সে কখন কখন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্তবৎ দিন যামিনী বিভোর হইয়া থাকিতেন। নীলকণ্ঠ ইদানীন্তন ব্যক্তি। তাঁহার গানগুলি বহুদিন হইতে বৈষ্ণবগণের ভিক্ষার সম্বল হইয়াছে। এই ভক্তচূড়ামণি, অল্পদিন হইল, মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সঙ্গীতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের আসন সর্ব্বোচ্চ। এক কালে এই সকল পদকর্ত্তার পদপ্রভাবে সমগ্র রাঢ়দেশবাসিগণের চিত্ত যেন সমভূম হইয়া গিয়াছিল। অনেক পরে পূর্ব্বদেশে একজন অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী পদকর্ত্তা প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার নাম—

মধুসূদন কিন্নর।

ইনি সাধারণতঃ মধুকান্ নামেই বিখ্যাত। বাং ১২২৫ খৃঃ অব্দে যশোর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত উলসিয়া গ্রামে ইঁহার জন্ম ; পিতার নাম তিলকচন্দ্র কিন্নর। মধুসূদনের রচিত পদাবলীর প্রচলিত নাম ঢপ্-সঙ্গীত। ইহা কীর্ত্তনও নহে যাত্রাও নহে, সম্পূর্ণ নূতনধরণের। যশোরের মাইকেল মধুসূদন যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবক, কিন্নর মধুসূদনও তেমনই একপ্রকার সুমধুর ধরণের নূতন সুরের উদ্ভাবক। কবিসমাজে মাইকেলের ন্যায় সঙ্গীতকার-সমাজে কিন্নর মধুসূদনকে অনেক সঙ্গীতবেত্তাই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া থাকেন।

এক সময়ে মধুকানের গান বহুসংখ্যক বঙ্গনরনারীর কণ্ঠহার স্বরূপ ছিল। ইঁহার সঙ্গীতের রাগরাগিণী তালমান, ভাবমাধুর্য্য, পদলালিত্য ও প্রসাদগুণ সকলই প্রশংসনীয়।

শুনা যায়, মধুসূদন বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। কিন্তু প্রতিভার

কি অসীম শক্তি ! সেই মূর্খ মধুসূদনের গানগুলিতে কি মহাপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে !

মধুসূদন বাল্যকালে ঢাকার ছোট খাঁ ও বড় খাঁ নামক প্রসিদ্ধ গায়কদ্বয়ের নিকট রাগ-রাগিণী শিক্ষা করেন, পরে যশোরের মাগুরা সব্ ডিভিশনের অধীন আঠারখাদা-গ্রামনিবাসী রাধামোহন বাউলের নিকট কীর্ত্তন অভ্যাস করেন। এই রাধামোহন বাউল যদিও একজন প্রতিভাশালী সুগায়ক এবং মধুসূদনের গুরু ছিলেন, তথাপি তাঁহার দাম্ভিকতা ও অপ্রিয়ভাষিতা দোষে তিনি তাদৃশ প্রতিপত্তি বা অর্থলাভ করিতে পারেন নাই। রাধামোহন বড়ই বিলাসপ্রিয় দাম্ভিক ও দুর্মুখ ছিলেন।

একবার কোন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের বাটিতে গান করিতে গিয়া তিনি আসোরে দল পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং বাসায় বসিয়া তাকিয়া ঠাস দিয়া গুড়গুড়ীতে সোণার একটি লম্বা নল লাগাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করিতেছেন ! আসোরে দল ও শ্রোতৃগণ সকলই উপস্থিত, অথচ অধিকারীর অভাবে গান আরম্ভের বিলম্ব হইতেছে, দেখিয়া জমিদার বাবুরা চটিয়া লাল ! তাঁহারা রাধামোহনের নিশ্চিন্তে ধূমপানের সংবাদ শুনিয়া একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, অধিকারী এখন নিশ্চিন্তে সোণার নলে ধূমপান করিতেছেন, শীঘ্র আসিয়া গান আরম্ভ করুন ; গান যদি ভাল হয় তবেই মঙ্গল, তাহা না হইলে ঐ সোণার নল আজ অধিকারীর পিঠে পড়িবে।

রাধামোহন কর্ম্মচারীর মুখে এই সাদর অভ্যর্থনা শুনিয়া সত্বর আসোরে আসিয়া গান আরম্ভ করিলেন। কয়েকটি মাত্র দোহারের সহকারিত্বে প্রায় ১০ ঘণ্টা কাল তানলয়সমন্বিত সুমধুর সঙ্গীতালাপে রাধামোহন শ্রোতৃমণ্ডলকে যেন অচেতন করিয়া রাখিলেন। তখন জমিদার কর্ত্তা স্বয়ং বলিলেন, "রাধামোহন, অদ্য এই অবধি ক্ষান্ত হও ; যদিও আমরা বড়ই পরিতৃপ্ত হইতেছি, কিন্তু তোমার বোধ হয় বড়ই কষ্ট হইতেছে। তোমার গানের মূল্য নাই ; আমি তোমাকে সামান্য অর্থ দিয়া এত কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও। বাউল হে, বড়ই চমৎকার গান শুনাইয়াছ।"

রাধামোহন উত্তর করিলেন,—"হুজুর, গান যে ভাল হইয়াছে এবং আপনারা যে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমার বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি অর্থ যাহা দিবেন তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট, আপনার আশীর্ব্বাদই আমার লাখটাকা ; কিন্তু হুজুর বিচারপতি, হুজুরের নিকট আমার একটি বিষয়ের বিচারপ্রার্থনা।

জমিদার।—কি বিচার প্রার্থনা কর বল। অবশ্যই আমি সাধ্যমত সুবিচার করিব।

রাধামোহন।—(বস্ত্রমধ্য হইতে সোণার নলটি বাহির করিয়া) আজ্ঞে, হুজুরের হুকুম ছিল যে, গান ভাল না হইলে এই নল আমার পিঠে পড়িবে; কিন্তু হুজুরই স্বীকার করিতেছেন, গান ভাল হইয়াছে; তবে এ নল এখন কাহার পিঠে পড়া উচিত?

সভাস্থ সর্ব্বলোক স্তম্ভিত! তৎকালে এই দুর্দ্ধর্ষ জমিদার মহাশয়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ছাগেবাঘে একত্র জলপান করিত, ইঁহাকে লোকে সাক্ষাৎ যমাবতার বলিয়া জ্ঞান করিত। রাধামোহনের বিষম বিচারপ্রার্থনা শুনিয়া সর্ব্বলোক সশঙ্ক হইয়া উঠিল, নাজানি আজ অধিকারীর ভাগ্যে বিচারফলটা কি রূপই ভয়ানক ফলে!

কিন্তু সুরসিক সদাশয় জমিদার মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—"বাউল হে, আমি না বুঝিয়া তোমার ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ অবমাননা-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম তাহাতে আমার যথার্থই অপরাধ হইয়াছে, আমি প্রকৃতই দণ্ডার্হ, এ নল আমারই পিঠে পড়া উচিত। কিন্তু সভামধ্যে তুমি যে জুতোটা মারিলে, ইহাতেই বোধ হয় আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, আর নল পিঠে পড়া অপ্রয়োজন।

রাধামোহন কৃতজ্ঞভাবে কর্ত্তার পদধূলি লইয়া করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

এই দুর্ব্বাসা-গুরুর শিষ্য মধুসূদন কিন্তু বিনয়ীর অগ্রগণ্য ছিলেন।

তাঁহার বিনয় ও ভগবদ্‌ভক্তি তদ্‌বিরচিত অধিকাংশ সঙ্গীতেই সুপ্রকাশ। মধুসূদনের সঙ্গীতগুলির শেষ পদে 'সূদন' বলিয়া ভণিতা দেওয়া আছে। আমরা নিম্নে মধুসূদনের দুইটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

(প্রভাসযজ্ঞে দ্বারী গোপীদিগকে দানধ্যান গঙ্গাস্নান করিতে বলায় গোপীগণের উক্তি।)

(বসন্তবাহার; ঢিমে তেতালা।)

(রাধার চরণ) গঙ্গাতে কি পায়? হায়;—
সুরধুনী জন্মে যে পায়, সে ধরে সেই পায়।
জানি গঙ্গা ভবের তরী, তার তরী সেই চরণতরী,
তুফানে পড়ে যার তরী, সে চরণ ধরলে তরী পায়।

(দ্বারি,) কি দিব আর দান, প্রাণদান দিয়েছি,
সে দান ফিরায়ে নিতে হেথা এসেছি ;—
(মোদের) দান ধ্যান পুরশ্চরণ, সকলই শ্রীরাধার চরণ ;
তাই ভেবে দাঁড়ায়ে স্থদন,
যদি চরণ পায় ॥

(যশোদাব নিকট গোপালের নিজ জন্মপরিচয়।)

(বিভাস ; ঢিমেতেতালা।)

শুন মা জনম-কথা।
সে ত নয় ক'বার কথা, যে দুঃখের কথা ;
*   *   *   *   *
জন্মি বটপত্র পরে ভাসিলাম জলে ;
কিছুকাল পরেতে মাগো আসিলাম কূলে ;—
*   *   *   *   *   *
তা' পরে এক রাজরাণীকে মা বলিয়েছিলাম সুখে,
তা' পরে মথুরায় আছেন দুঃখী এক মাতা।
স্থদন কয় মাতৃহীন ছেলে, যাকে পায় তাকে মা বলে,
(রাণি,) তোমাকে যে মা-বোল বলে, সে কেবল কথা ॥

একদা এক জমিদার বাবু মধুস্থদনকে জিজ্ঞাসা করেন,—'মধু, তোমার নাম মধুস্থদন, কিন্তু 'মধু' বাদ দিয়া শেষ পদে কেবল 'স্থদন' বলিয়া ভণিতা দেওয়া কেন ?

সুরসিক মধুস্থদন হাসিয়া সবিনয়ে উত্তর করিলেন,—হুজুর, গানগুলির প্রতিপদেই মধু, এজন্য শেষপদে কেবল স্থদন বলিয়াই ভণিতা দিয়াছি।

মধুস্থদনের রচনা সরল সুমধুর অথচ যথেষ্ট ভাবোদ্দীপক। শুনা যায়, তিনি প্রতিবর্ষে একটি করিয়া নূতন পালা রচনা করিতেন। প্রতিবর্ষে সরস্বতী পূজার দিনে বসিয়া তিনি বলিতেন, একজন লেখক লিখিতেন, এইরূপে সেই একদিনেই একটি পালা সম্পূর্ণ করিতেন। শক্তি বড় সহজ নহে !

সকল সঙ্গীতকারণই গৎ ভাঙ্গিয়া সুর গড়িয়াছেন, কিন্তু অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে মধুস্থদন অনেক রাগরাগিণীর মূল আলাপচারি তালসঙ্গত করিয়া সুর গড়িয়া

লইয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি মধ্যমান তালের যে নূতন সুরটি বাহির করিয়াছিলেন, উহার মাধুর্য্য অতুলনীয়।

মাইকেল মধুসূদন এবং কিন্নর মধুসূদন, যশোরের এই দুই মধুই বঙ্গের বড় খাঁটি মধু। এমন মধু আমরা আর পাইব কি না সন্দেহ।

অনুমান ৫৫ বৎসর বয়সে কিন্নর মধুসূদনের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

সে কালে ঢপকীর্ত্তনে যেমন মধুসূদন ওস্তাদ, তেমনই যাত্রায় ওস্তাদ লোকনাথ দাস (লোকা ধোপা)। লোকনাথ রচয়িতা নহেন বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট গায়ক। যাত্রার দলে সঙ্গীতপারদর্শী ব্যক্তি ইঁহার মত আর কোথাও কাহাকেও দেখা যায় নাই। ইদানীং মতিলাল রায়ের দলের যুড়ী রামকৃষ্ণ দাসের সঙ্গীত-পটুতাও বিস্ময়কর। প্রসঙ্গক্রমে আমরা অভয়াচরণ দাসের দলের বেহালাদার সূর্য্যকুমার দাসের বেহালা-বাদনে অদ্ভুত প্রতিভার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। সেরূপ বেহালা বাজনা আমরা আর বোধ হয় শুনিব না।

গোবিন্দ অধিকারী গোপ্‌লা উড়ে প্রভৃতির যখন পূর্ণ অভ্যুদয় সেই সময়ে ফরাশডাঙ্গায় মদন মাষ্টার নামে এক ব্যক্তি নূতন ধরণে যুড়ী ইত্যাদির প্রথা সৃষ্টি করিয়া একটি যাত্রার দল প্রস্তুত করেন। এই হইতেই যাত্রার দলে মাষ্টারি সুর মাষ্টারি কায়দা ইত্যাদির প্রচলন। মদন মাষ্টারের মৃত্যুর পর তাঁহার দল বৌমাষ্টারের দল বলিয়া পরিচিত ছিল।

মাষ্টারিধরণের যাত্রার দলগুলির মধ্যে মতিরায়ের যাত্রাই বাঙ্গালীর চিত্তগঠনে অনেক সহায়তা করিয়াছে। অবশ্য, যাঁহারা এ যুগে উচ্চশিক্ষাভিমানী রাজ-নৈতিক বা ধর্ম্মসংক্রান্ত সংস্কারাভিমানী, তাঁহারা নিজ নিজ চিত্তে বা চরিত্রে যাত্রার দল ইত্যাদির ছায়াপাত হওয়া সহসা অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু সমগ্র বঙ্গের অধিকাংশ সামাজিকের পক্ষে উহা অস্বীকার্য্য নহে। এবং বোধ করি উচ্চশিক্ষিতগণের চিত্তেও, যাত্রার দলের না হউক, থিয়েটারের দাগ অনেক লাগিয়াছে।

থিয়েটারে যেরূপ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যাত্রায় সেইরূপ স্বর্গীয়—

—মতিলাল রায়।

ইনি বারেন্দ্রশ্রেণিক ব্রাহ্মণ, জন্ম বাং ১২৪৯ সালের ২১ মাঘ তারিখে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতশালাগ্রামে; পিতার নাম মনোমোহন রায়। মতিলাল বাল্যকালে গ্রামস্থ পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন; পরে নবদ্বীপে মিশনরি স্কুলে

এবং বারাশতে এণ্ট্রান্স্ স্কুলে ইংরাজি শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে যথাক্রমে পুলিশের কেরাণীগিরি, স্কুলের শিক্ষকতা ও পোষ্টফিসের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন।

ঐ সময়ে তিনি স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত "প্রভাকর" পত্রিকায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর দোগাছিয়ানিবাসী হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে মতিলাল যাত্রার দলের উপযোগ্য করিয়া একখানি নাটক প্রণয়ন করেন; এবং উক্ত ব্যক্তির সহযোগিতায় একটি যাত্রার দল গঠিত করেন।

এই দল ভাঙ্গিয়া গেলে রায় মহাশয় নিজেই দল বাধিলেন। মতিরায়ের দলের সর্ব্বপ্রথম গান হয় নবদ্বীপে পোড়ামায়ের তলায়। এই প্রথমদিনের গান শুনিয়াই নবদ্বীপবাসী অধ্যাপকগণ ও অপরাপর শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই একবাক্যে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যাত্রার দলই রায়মহাশয়ের সৌভাগ্যের নিদান! তিনি যাত্রার দলের উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা জমিদারী ক্রয় করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ মতিলাল রায় যাত্রার দল করিয়া যুগপৎ অর্থ ও সুখ্যাতিলাভ যে পরিমাণে করিয়া গিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় আর কেহই করিতে পারেন নাই।

পালা-রচনায় তিনি ভাবুকতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার স্বীয়মুখে স্বরচিত বক্তৃতাগুলি প্রকৃতই অমৃতময় বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার "ভীষ্মের শরশয্যা" ও "কর্ণবধ" নামক প্রসিদ্ধ পালা দুইটিতে তিনি ভীষ্মের ও কর্ণের চরিত্রচিত্রাঙ্কণে বড়ই সুন্দর রং ফলাইয়াছেন। কিন্তু যাত্রাভিনয় দর্শন ব্যতীত কেবল পুস্তকপাঠে তাঁহার প্রতিভার তাদৃশ পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রাচীনকালে স্বর্গীয় লোচনদাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরিত্রাবলম্বনে চৈতন্যমঙ্গল নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সময় হইতে অনেক বৈষ্ণব কীর্ত্তনিয়া ব্যবসায়চ্ছলে ঐ চৈতন্যমঙ্গল গান করিয়া বেড়াইতেন। ইদানীং মতিরায় মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের সুমধুর সুপবিত্র চরিতাবলম্বনে "নিমাই সন্ন্যাস" নামক এক মনোহর পালা রচনা করিলেন। মতিলাল রায়ের পূর্ব্বে আর কেহ কখন যাত্রা বা থিয়েটারে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের অভিনয় করেন নাই। রায় মহাশয় তাঁহার এই নববিরচিত "নিমাইসন্ন্যাস" নবদ্বীপে অধ্যাপকমণ্ডলী ও সাধু বৈষ্ণবদল সমক্ষে অভিনীত করিলেন। শুনা যায় যে, সেই অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়া ও গান শুনিয়া, কোন কোন ভক্তিমতী ভদ্রমহিলা লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া অজ্ঞান উন্মত্তবৎ রায়মহাশয়ের সেই সঙ্কীর্ত্তন-দলমধ্যে যোগ দিতে উদ্যত হন।

অবশ্য, উক্ত মহোদয়াগণের সে চেষ্টা আত্মীয় স্বজনগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই হইতে নাকি অনেকের কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, রায় মহাশয় ঐ পালা আর প্রকাশ্যে সাধারণ সমক্ষে গান করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

এই মহাপুরুষ বাং ১৩১৫ সালে কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

ইদানীন্তন শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ আর যাত্রা কীর্ত্তন ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহেন। নাচ গান ইত্যাদির আনন্দানুভব করিতে হইলেই ইঁহারা থিয়েটারে গিয়া থাকেন, এবং সঙ্গের অপূর্ব্ব প্রভাবহেতু শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের উপর থিয়েটারের প্রভাবও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে। এই থিয়েটার-রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা স্বর্গীয়—

মহাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বাং ১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন তারিখে কলিকাতার অন্তর্গত বাগ্‌বাজার-বসুপাড়ায় গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। ইনি বাল্যকালে পাঠশালায় বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে শিখিয়া গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে (ওরিএণ্টালসেমিনরি) ও পরে হেয়ারস্কুলে ইংরাজি শিক্ষা করেন। গিরিশচন্দ্র এণ্ট্রান্স্ ক্লাস্ পর্য্যন্ত পড়িয়াই স্কুল ছাড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু পড়া ছাড়িলেন না। গৃহে বসিয়া ইনি যথোচিত অভিনিবেশ ও অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ ইংরাজি ও বাঙ্গালা সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র সবিশেষ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমতঃ কয়েকটি বন্ধুর সহকারিতায় বাগবাজারে একটি থিয়েটারের দল গঠিত করিয়া "সধবার একাদশী" নামক নাটকের অভিনয় করেন। তাহাতে তিনি স্বয়ং "নিমচাঁদ" সাজিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে এই থিয়েটারদল বাগবাজার হইতে যোড়া-সাঁকোতে উঠিয়া যায়। তখন ইহাতে টিকেট বিক্রয় আরম্ভ হইল, গিরিশচন্দ্রও ইহার সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

পরে বিডন্‌ষ্ট্রীটে গ্রেট্ ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে গিরিশচন্দ্র প্রথমতঃ অবৈতনিক ভাবে উহাতে যোগদান করেন, কিন্তু শেষে মাসিক একশত টাকা বেতনে উহার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তিনি শুভক্ষণে নাটক লিখিতে লেখনী ধারণ করেন, এবং জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত কলিকাতার নানা

থিয়েটারের সংস্রবে থাকিয়া কাল্পনিক, পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মমূলক অর্দ্ধশতাধিক নাটক প্রণয়ন করিয়া নাট্য জগতে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে গিরিশচন্দ্র একজন পসারী অভিনেতা ও নাটকরচয়িতা মাত্র। তাঁহার যেরূপ প্রসিদ্ধি, আদৌ তাঁহার অভিনয়ে বা রচনায় সেরূপ সৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না। কিন্তু শুভক্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন! সেই হইতে গিরিশের মধ্যে বাস্তবিকই যেন কি এক দৈবশক্তির অপূর্ব্ব অভিনয় আরম্ভ হয়। এই শক্তির আভাস ক্রমশঃ তাঁহার অভিনয়ে ও রচনায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সামান্য নাট্যব্যবসায়ী হইয়াও লোক-চক্ষে গিরিশ গুরুবৎ গৌরবান্বিত হইয়া উঠিলেন।

মতিলাল রায় যেমন প্রথমতঃ যাত্রায় নিমাইসন্ন্যাসের অভিনয় করেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষও সেইরূপ "চৈতন্যলীলা" নামক নাটক রচনা করিয়া থিয়েটারে অভিনয় করিলেন। এ অভিনয় ও ইহার ফল অতি অপূর্ব্ব হইল! বলিতে গেলে, এই হইতেই থিয়েটারের অভিনেতৃদলে ও শ্রোতৃমণ্ডলে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হইল। ইহার পূর্ব্বে থিয়েটার বলিলেই যেন ভদ্রলোকের মনে একটু ঘৃণার উদয় হইত, হইবারও হেতু যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র "চৈতন্যলীলা" "বিল্বমঙ্গল" ইত্যাদির রচনা ও অভিনয় অরম্ভ করিয়া তথাবিধ নরকায়িত রঙ্গমঞ্চগুলিকে যেন সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিতে লাগিলেন। সাধু মহাপুরুষগণও গিরিশের "চৈতন্যলীলা" দেখিতে আসিতেন।

বস্তুতঃ গুরুকৃপাই গিরিশের সারসম্বল, সর্ব্বসৌভাগ্য-নিদান! বহিশ্চরিত্রে গিরিশচন্দ্রকে দ্বিতীয় মাইকেল বলিয়াই বোধ হইত, কিন্তু আন্তরিক ভক্তিবিশ্বাসে তিনি অদ্বিতীয়! তিনি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন; পরমহংসদেবও তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। ইহাতে অপর জনৈক শিষ্য গুরুকে কহিলেন,—মহাশয়, আপনি গিরিশঘোষ ফোষের সহিত অতটা মিশামিশি না করিলেই ভাল হয়। উহারা থিয়েটারের লোক, ডাকসেটে মাতাল, অন্যান্য অসৎ সঙ্গেরও অভাব নাই; ও সব লোক আপনার নিকট হামেশা আসাযাওয়া করিলে আপনার উপর লোকের আর শ্রদ্ধাভক্তি থাকিবে না।

পরম দয়াল পরমহংসদেব উত্তর করিলেন,—ওরে, তা লোকে যাই বলুক্ যাই করুক্, গিরিশকে আস্‌তে বারণ কর্‌তে পারব না। ওর বড়ই ভক্তি,

বড়ই বিশ্বাস! ওর বিশ্বাসটা যেন বটগাছের গুঁড়ির মত, আমি দুই হাতে আঁক্‌ড়ে ধর্‌তে পারি না!

বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র স্বীয় দুর্জ্জয় বিশ্বাসবলে জোর জুলুম করিয়াই যেন গুরুকৃপা লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অসংখ্য উপাখ্যান আছে।

একবার গিরিশ পরমহংসদেব-সমীপে গিয়া প্রস্তাব করিলেন,—মহাশয়, সাধন ভজন ধ্যান ধারণা ও সব ত আর আমাদিয়ে ঘটে' উঠে না। এখন এমন একটা মোটামুটি সোজা কথা বলে' দিন দেখি, যাতে দুশ্চিন্তা কুশ্‌চিন্তাগুলো কেটেকুটে গিয়ে প্রাণটা সদাই আনন্দে ভর্‌পূর্‌ থাকে।

পরমহংসদেব হাসিয়া কহিলেন,—আরে পাগল, দুশ্চিন্তা কেটেগিয়ে প্রাণটা সদাই আনন্দে ভর্‌পূর্‌ থাকা, সেটা কি সোজাকথা—সহজে হয়?

গিরিশ।—সোজা কথা নয়? সহজে হয় না? তবে তুমি আছ কি কর্‌তে? তোমার কাছে আসারই বা দরকার কি?

পরমহংস।—(গম্ভীরভাবে) আচ্ছা, তবে তোরে একটা কথা বলি, সেইটা করিস্‌, তা'হলে হ'বে।

গি।—কি ঠাকুর, বল দেখি, শুনি আগে।

পর।—তুই সর্ব্বদা আমার নামটা স্মরণ করিস্‌ দেখি।

গি।—ও ঠাকুর, তা পার্‌লে ত হ'তই! আমাদিয়ে সে সব ঘটে' উঠ্‌বে না।

পর।—পার্‌বি না? আচ্ছা, তবে প্রত্যহ দশবার করে' স্মরণ করিস্‌। তা'পার্‌বি ত?

গি।—না ঠাকুর, তাও হয়ে উঠ্‌বে না। আমি কখন্‌ কোথায় কি ভাবে থাকি, তার নাই ঠিক!

পর।—আচ্ছা, দিনান্তে একবার?

গি।—উঁহু! ও সব নিয়ম কানুনের মধ্যে গিরিশচন্দ্র নয়!

পর।—(একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে এক কাজ কর্‌গে-যা! আজ থেকে আমার নামে বকল্‌মা দিয়ে রাখ্‌। তা পারবি ত?

গি।—হাঁ ঠাকুর, তা খুব পার্‌ব।

এই দিন হইতে পরমদয়াল গুরু পরমভক্ত শিষ্যের সর্ব্বভার স্বকরে গ্রহণ করিলেন। গিরিশচন্দ্র শ্রীগুরু-চরণে তাঁহার কি বৈষয়িক কি আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিষয় সমুৎসর্গ করিয়া সেই দিন হইতে নিশ্চিন্ত হইলেন।

একালে গিরিশের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই কৃপাকাহিনী প্রসঙ্গে সেকালের

সেই শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ কর্তৃক জগাইমাধাই-উদ্ধার-কাহিনী সহসাই মনে আসিয়া পড়েঃ—

নবদ্বীপে জগাই-মাধাইকে লইয়া নিতাইচৈতন্য জাহ্নবীগর্ভে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের জন্মজন্মান্তরকৃত পাপরাশিস্বরূপে ভ্রাতৃদ্বয়ের অঞ্জলিধৃত অভিমন্ত্রিত বারি স্বয়ং অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন!

সৌভাগ্যবান্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অভিনয় ও নাট্যরচনা ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অন্তকালে সাধুচিত দানাদি সৎকর্ম্মবিনিয়োগে—উহার অপূর্ব্ব সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধুপুত্রও পিতার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত। ইনি কৌমার ব্রতাবলম্বী স্বার্থত্যাগী সদাশয় ব্যক্তি।

নাট্যক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের আসন অদ্যাপি শূন্য রহিয়াছে। সে আসনে বসিবার উপযুক্ত ব্যক্তি অদ্যাপি বঙ্গমাতার অঙ্ক অলঙ্কৃত করেন নাই।

বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান বা তৎপূর্ব্বাবস্থা বর্ণন করিতে গেলে, মাত্র বাঙ্গালী হিন্দু ও ব্রাহ্মগণের পরিচয় দিলেই সে বর্ণনা সম্পূর্ণ হইল না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বঙ্গবাসী মুশলমানগণের পরিচয়ও প্রয়োজনীয়। কারণ, বঙ্গের মুশলমান সম্পর্কে হিন্দুসমাজে এবং হিন্দুসম্পর্কে মুশলমান সমাজে যে অনেক সময়ে অনেক পরি-বর্ত্তন ঘটিয়াছে, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এমন কি পঞ্চাশদ্ বর্ষ পূর্ব্বেও বাঙ্গালী হিন্দুমুশলমানে এতই সম্প্রীতি ছিল যে, দুর্গোৎসবের সময়ে দেবীমণ্ডপের সম্মুখে নাট্যশালায় বকুমিঞা দক্ষযজ্ঞের পালা গাইয়াছেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি সে কালের গোঁড়া হিন্দুগণও সাশ্রুনয়নে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছেন। এ কালের সংস্কারাভিমানী মহাশয়গণ অনেকে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক মুশলমান বাবুর্চ্চিগণের প্রস্তুত সুমিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে প্রস্তুত বটে, কিন্তু সে কালের সেই নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের ন্যায় মুশলমানগণের সহিত ইঁহাদের সেরূপ অমায়িক সুমিষ্ট সম্প্রীতিভাব কোথায়?

সেকালে অনেক হিন্দু মুশলমান-ফকীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন; আবার অনেক মুশলমানও সাধুহিন্দুগুরুর নিকট দীক্ষা শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। এমন অনেক গুরু ছিলেন, যাঁহাদিগের আচার বিচার বেশভূষা দেখিয়া, তাঁহারা হিন্দু কি মুশলমান তাহা অবধারণ করা যাইত না। হিন্দু ও মুশলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাদের শিষ্য হইত।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ বঙ্গে "বাউল"ধর্ম্মের বহুলপ্রচার করিয়া যান। এই ধর্ম্মশাসনেই এ দেশে হিন্দুমুশলমানে অনেকাংশে মিশামিশি হইয়াছিল।

প্রকারান্তরে ষট্‌চক্রসাধন দ্বারা ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া ভগবৎপ্রেমামৃত পানে ত্রিবিধ দুঃখের অতীত হওয়াই এই ধর্ম্মের সারমর্ম্ম। ঋষিপ্রণীত তন্ত্রাদিতে এ ধর্ম্ম-সাধনার পদ্ধতি প্রকৃষ্টরূপে বিবৃত আছে; এবং প্রাচীন কাল হইতেই গুহ্য ও গুরুগম্যভাবেই এ ধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত। শুনা যায় এবং অনুমানেও বোধ হয়, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাজনগণ এই ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পরে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দই এই ধর্ম্ম বঙ্গদেশে আপামর সাধারণে প্রচারিত হইবার সূত্রপাত করিয়া যান। তদবধি পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে ফ্রীম্যাসনের ন্যায় বাঙ্গালী-সমাজে বাউলধর্ম্মমতাবলম্বিগণের গুপ্ত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গেই এই সম্প্রদায়ের সমধিক প্রসার। হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসিগণও অনেকে এই ধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বদেশীয় ইদানীন্তন বাউল সম্প্রদায়ের আদিগুরু ছিলেন নবদ্বীপনিবাসী—

স্বর্গীয় কালিয়কান্ত গোস্বামী।

এই মহাপুরুষ যশোর জেলার কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যৌবনকালেই গৃহত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া ভেকাশ্রয় করেন। কালিয়কান্তের জীবন-বৃত্তান্ত অনেকাংশে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ন্যায়।

কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বাহাদুর সাতিশয় ধর্ম্মানুরাগী সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্ম মুশলমান যে কোন ধর্ম্মেরই সাধু ব্যক্তি দেখিলে তাঁহাকে তিনি যথোচিত সমাদর করিতেন। শুনা যায়, এই মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নবদ্বীপে একদিন নিশীথসময়ে সহসা দেখিতে পাইলেন, একটি মানবমূর্ত্তি অবলীলাক্রমে সলিলোপরি পাদচারণে গঙ্গাপার হইয়া আসিতেছেন। অনুসন্ধানে মহারাজ জানিতে পারিলেন, এই মহাপুরুষই পরমবৈষ্ণব কালিয়কান্ত গোস্বামী। তৎপরে শ্রীশচন্দ্র নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে ষোল বিঘা জমি বৈষ্ণবোত্তর দিয়া ঐ জমিতে কালিয়কান্তের আকড়াবাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। কালিয়কান্ত সততই প্রায় এ দেশ সে দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; এবং এই ভ্রমণ ব্যপদেশে নদিয়া যশোর ফরিদপুর পাবনা ঢাকা বরিশাল বর্দ্ধমান হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে বাউল-ধর্ম্ম প্রচারিত করেন। কালিয়কান্ত বড়ই তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, কপটাচার দুশ্চরিত্র বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। কালিয়কান্তের দেহান্ত হইলে তাঁহার প্রধান শিষ্য চণ্ডীচরণ ওরফে ন্যাংটা গোসাঞি পূর্ব্বাঞ্চলে বাউল

ধর্ম্মের গুরু হইয়াছিলেন। ইনিও ভেকাশ্রয়ী ব্রাহ্মণসন্তান। হিন্দু মুশলমান উভয়জাতীয় লোকই ইঁহার শিষ্য ছিল।

উক্ত বৈষ্ণবমহাত্মগণ ব্যতীত কতকগুলি ফকীরও বঙ্গে এই বাউলধর্ম্মের যাজন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে নদিয়া-কুষ্টিয়া অঞ্চলের—

লালন ফকীর—

একজন প্রধান সাধক, এবং বহুসংখ্যক হিন্দু মুশলমানের গুরু। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে একবার "ভারতী" নামক মাসিক পত্রিকায় এই মহাত্মার রচিত কয়েকটি সঙ্গীত ও ইঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। ফকীর বলিয়া লোকে তাঁহাকে "লালন সাহ" বলিত।

বাস্তবিক পক্ষে লালন সাহের প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত। আদৌ তিনি হিন্দু কি মুশলমান তাহারই মীমাংসা নাই। জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে লালন সে কথা হাসিয়া উড়াইতেন। জাতির সম্বন্ধে তিনি একটি গান রচনা করিয়া তাহার শেষে এই বলিয়া ভণিতা দিয়াছিলেন,—

"লালন কয়, জাত্ হাতে পেলে, পোড়া'তাম আগুন দিয়ে।"

ইহা হইতেই লালন সাহের জাতিবিচারজ্ঞানের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ কিন্তু এইরূপ যে, লালন আদৌ হিন্দু, কায়স্থকুলসম্ভূত। লালনের মৃত্যু হইলে হিন্দু মুশলমান উভয় জাতীয় শিষ্যগণ সমবেত হইয়া তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করেন ও মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ এবং ফয়তা-মহোৎসব করিয়াছিলেন। সাধুত্বের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! শূন্যগর্ভ সংস্কারপদ্ধতির শত-প্রবোধেও যাহা অসাধ্য, সাধুসংস্রবে তাহা স্বতঃই সুসিদ্ধ!

লালন সাহের রচিত পদ শুনিলেই বুঝা যায়, লালন যেমনই প্রতিভাশালী, তেমনই উচ্চশ্রেণীর সাধক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা নিম্নে একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

"(আমার) বাড়ীর কাছে আর্‌শি নগর, এক পর্‌শী বসত করে,
আমি একদিনও না দেখ্‌লাম রে তারে।
পর্‌শী যদি আমায় ছুঁ'তো, আমার যমযাতনা সকল যেতো দূরে;—
(আবার) সে আর লালন একৃখানে রয়, তবু লক্ষ যোজন ফাঁক্ রে॥"

এই পদে লালন "পর্‌শী" বা প্রতিবেশী শব্দে শ্রীভগবান্‌কেই অভিহিত

করিয়াছেন, এবং "আর্‌শিনগর" অর্থাৎ "দর্পণনগর" শব্দে দ্বিদলপদ্মস্থান ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আজ্ঞাচক্রেই জ্যোতিঃ ও রূপদর্শন হয় বলিয়া বাউলগণ উহাকে "রূপের ঘর" বলিয়া থাকেন।

বঙ্গে যে কত হিন্দু মুশলমান এই বাউলসম্প্রদায়ভুক্ত আছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক অনেকেই ইহার সংবাদ রাখেন না, যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাও শিক্ষাভিমানবশতঃ এই ধর্ম্মমতের নাম মাত্র শুনিয়াই ঘৃণা প্রকাশ করেন। কিন্তু বোধ করি এ বঙ্গে যতগুলি হিন্দুমুশলমান আজ উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের অপেক্ষা এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা কম নহে। এই ধর্ম্মমতের অনেকগুলি শাখাপ্রশাখাও আছে; এবং ইদানীং এমন কি সভ্য ও শিক্ষিত বঙ্গের কেন্দ্রস্থান এই কলিকাতা সহরের অনেক উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পরিবারের নরনারীগণ-মধ্যেও কেহ-কেহ সংগোপনে এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

আমাদের মুশলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে সরিয়তি, তবিয়তি, হকীগতি, ও মারফতি নামে যে চারিটি ধর্ম্মমত প্রচলিত, তন্মধ্যে মারফতি মতের সহিত উপরিউক্ত ধর্ম্মমতের অনেক অংশে সাদৃশ্য আছে। এই হেতু বঙ্গে বাউল ফকীর ও মারফতির ফকীর উভয়ে অভিন্ন ভাবাপন্ন। ইহাদের জাতিবিচার নাই, এবং ইহারা সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণের প্রতিই শ্রদ্ধাবান্। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে এইরূপ মারফতি বা বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত এক নিরক্ষর মুশলমান-কবি ছিলেন। ইহার নাম——

পাগ্‌লা কানাই।

ইনি এক সন্ন্যাসীর শিষ্য। কানাই প্রথমতঃ গুরুউপদেশানুসারে কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। এই জন্যই ইহার নাম রটিল— পাগ্‌লা কানাই। পথভ্রষ্ট না হওয়ায় কানাই ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং সাধনাফলে আত্মশক্তির বিকাশ হেতু অবশেষে ইহার অপূর্ব্ব প্রতিভাপ্রকাশ পাইল; কিন্তু কানাই নিরক্ষর! এই হেতু বাগ্‌দেবীও যেন কানাইর প্রতি একটু বিশিষ্টরূপ সদয়া হইলেন; কানাইর এরূপ অপূর্ব্ব শক্তি জন্মিল যে, আসোরে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি একসঙ্গে গান রচনা ও গাওনা করিতে সমর্থ হইতেন। পাগ্‌লো কানাইর কবিত্ব সাধনাভিজ্ঞতা তথা শিক্ষাভাব, এ তিনেরই পরিচয়স্বরূপ আমরা তাঁহার রচিত একটি গান

নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পূর্ব্বাঞ্চলের অশিক্ষিত মুশলমান মহলে "মোউতের ধুয়া" অর্থাৎ "মৃত্যুর গান" বলিয়া এই গানটির সবিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। শিক্ষিতগণের নিকটও এ গান সমাদরণীয়, সন্দেহ নাই ;—

"মরার আগেতে মর ;
শমনকে জব্দ কর ;—
যদি তাই করতে পার, ভবপারে যাবা, রে মন রসনা।
এই মোর্‌দা দেহ্ জেন্দা বশ থাক্‌তে কেন মরনা ?
মরার সময় ম'লে পরে কিছুই হবে না,
মরার ভাব জান না—আ আহা ;—
মরা কি এম্‌নি মজা, মরে' দেহ কর তাজা,
দেহ নয়, ফুলের সাজা, কর্‌লে পূজা, ভবপারের ভয় রবে না ;—
আর পারাপারের ভয় কি রে তার ? মার ডাঙ্কা কালের পর,
মোর্‌দা দেহ্ জেন্দা করে' যা'বা ভব-পার,
গুরু হবে কাণ্ডার—আ আহা।—
আমি মরে' দেখেছি, কত কাল বেঁচেও আছি,
মরার বসন পরেছি, দেখ্‌বি যদি, পাগ্‌লা কানাই কয়ে যায় ;—
আবার চোগ্ মুদিলে শলখ্ দেখি, মেল্‌লে আঁখি আঁধার হয়,
পাগ্‌লা কানাইর নাইক এবার মরণ বলে' ভয় ;
তোরা মর্‌বি কে আয় ॥"

কানাইর সমসময়ে সেই অঞ্চলেই আর একজন মুশলমান কবি প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার নাম,—

ইদু বিশ্বাস।

ইনি একটু বাংলা লেখাপড়া জানিতেন বলিয়া "বিশ্বাস" উপাধি পাইয়াছিলেন। ইদুর কবিত্ব প্রশংসনীয় হইলেও, কানাইর ন্যায় সাধকত্ব ছিল না। ইনি হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের বঙ্গানুবাদ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভাষাজ্ঞান তেমন ছিল না। তাঁহার রচিত গানে তাহার প্রমাণও পাওয়া যায় ; যথা,—

(ইছু বিশ্বাসের পিরীতির ধুয়া)

"রাম নাম জপে' বাল্মীক্ ভবে।—
রামদরশন শ্রীবিভীষণ লঙ্কায় চির জীবে,—
প্রেম সেবে, প্রেম সেবে, প্রেম সেবে ;—
পিরীত যেমন সুহৃৎ রতন অমূল্য ধন ভবে,
ও মন, আর কি এমন হ'বে,—এ এহে ;—
পিরীত যেমন অতুল্য, হায় তুল্য নাইক তার,
অমূল্য ধন, ধনঞ্জয় তার করেছেন যতন,—
ও যার রথের সারথি ব্রহ্মসনাতন ;
বিস্তর বিপদ্‌নিস্তার হয়েছিল সেই কারণ ;—
আর এক যোদ্ধাপতি,—
আর এক যোদ্ধাপতি, কুরুপতি কুরীতি দুর্য্যোধন,—
আছে বহুসেনা অগণনা, প্রেম জানে না সে জন ;—
দেখ গতি ! কুরুপতি, সংপ্রতি সে নিধন !
প্রেম কি ধন ! প্রেম কি ধন !! প্রেম কি ধন !!!—
দেখ, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যোদ্ধাপতি সব জন,
পার্থ-হাতে পতন !—
ইছু বিশ্বেস বলে ভাই, পিরীত বিনে সুহৃৎ নাই,
প্রেম, প্রেম কর গো সবে ॥"

ইছুর প্রতিভায় প্রেম কি পবিত্র শ্রী ধারণ করিয়াছে ! অশিক্ষিত চাষা মুশলমান হইয়া ইছু সেই কবি-খেউড়ের কালে এমন পবিত্র প্রেমের কথা কোথায় শিখিলেন ! আহা, প্রতিভার কি মহীয়সী শক্তি ! ইছু যথার্থই প্রেমিক বটে !

এই স্থানে আমরা প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক দুই জন মহানুভব মুসলমান গ্রন্থকারের নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইঁহাদের প্রথমের নাম শ্রীযুক্ত মীর মোশার্‌ রেফ্‌ হোসেন, দ্বিতীয়ের নাম মাননীয় সর্‌ সৈয়দ আমীর আলি। মীর সাহেব "বিষাদ সিন্ধু" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থ ও সৈয়দ সাহেব "স্পিরিট অব্‌ ইস্‌লাম্‌" নামক ইংরাজি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বারান্তরে এই দুই মহাত্মার জীবনী প্রকাশে

বাসনা রহিল। মাননীয় সৈয়দ সাহেবের ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের কটন্ প্রেস নামক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। সৈয়দ সাহেব ইংলণ্ডেশ্বরের প্রিভিকৌন্সিলের মেম্বর। ভারতবাসিগণমধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ সম্মানে সম্মানিত।

বঙ্গের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়, ক্বচিদ্ বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুই এক জনও উপরিউক্তরূপ ফকীরি মতে দীক্ষিত শিক্ষিত। ঘোষপাড়ার 'সতী মা' ঠাকুরাণীর মতও,—বাউল বা মারফতি মতের অনুরূপ না হইলেও,—একপ্রকার ফকীরি মত বলিতে হইবে। বঙ্গে বহুসংখ্যক নরনারী এই ঘোষপাড়ার মতাবলম্বী। এতদ্ব্যতীত কর্ত্তাভজা, গুরুসত্য প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার মত বঙ্গের অশিক্ষিত নরনারীসমাজে প্রচলিত আছে। এই সকল ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে নানাবিধ কদর্য্যপথে বিচরণ করিলেও, এবং তদ্ধেতু ঐ সকল ধর্ম্মমত শিক্ষিতসমাজের চক্ষে কখন কখন ঘৃণিত বলিয়া অবলোকিত হইলেও, ঐ সকল মতাবলম্বিগণের মধ্যে যে সাধু-সজ্জনের একবারেই অস্তিত্বাভাব, বা ঐ সকল ধর্ম্মমত যে বাঙ্গালীসমাজের কোন হিতসাধনে সমর্থ হয় নাই, এমন নহে।

এই সকল ধর্ম্মের সাধনপ্রণালী অধিকাংশই তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত, কিন্তু তাহা বলিয়া উহা কালীসাধনের প্রকারান্তর নহে। উহা অতীব গুহ্য ও কঠোর সংযমমূলক, এবং সর্ব্বথা গুরুগম্য। প্রমাণস্বরূপ স্বর্গীয় হরানন্দ গোস্বামীর শিষ্য যশোর-বুনাগাতি-নিবাসী স্বর্গীয় সাধক মথুরানাথ বসু মহাশয়ের বিরচিত একটি সাধনতত্ত্বমূলক বাউল সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"প্রেম পীরিতি কর্‌বি যদি সুজনার সঙ্গ ধর্।—
সুজনার সঙ্গ ধর্, অনুরাগের করণ যাজন কর্।
অনুরাগের করণ ভারি, হ'তে হবে নির্ব্বিকারী,
হাল্‌ছে বেহাল করোয়াধারী, (তবে) ঘুচ্‌বে মনের অন্ধকার॥
কর্‌তে হবে রসের খেলা, রসিক সনে রোজ দু'বেলা,
শুদ্ধরতি ও মন ভোলা, কাম-নদীর ঘোলায় খবরদার॥
গোসাঞি হরানন্দ বসে', রূপরসেতে আছে মিশে,
মথুর সে ধন পাবি কিসে, (তোর) ভজন নয়, ভোজনটি সার॥"

ঐ সকল ধর্ম্মমতে যে ইন্দ্রিয়দমন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, ইহা অনেক মহাজনের

পদাবলীতেই সপ্রমাণ। শান্তিপুর-নিবাসী বড় গেসোঞ্জির বিরচিত একটি পদে বর্ণিত আছে,—

"ও মন, তোমায় আমায় এ দু'জন,
চল যাই সাধের বৃন্দাবন।
একটা পয়সা নাই হাতে, যা'ব ত্রিহুতের পথে,
মহারাণীর শাসন ভারি ভয় কি রে তাতে;—
কেবল মদ্না কুকুর, হুঁকুর হুঁকুর, কাম্ড়ালে জ্বলে দ্বিগুণ!"
ইত্যাদি।

বঙ্গের শিক্ষিত জনসমাজমধ্যে, ফকীর বলিতে, ছিলেন কেবল ফিকিরচাঁদ অর্থাৎ স্বর্গীয়—

মহাত্মা হরিনাথ মজুমদার।

সাধারণতঃ ইনি "কাঙ্গাল হরিনাথ" বা "ফিকিরচাঁদ ফকীর" নামে প্রসিদ্ধ। বাং ১২৪০ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্ঠিয়া মহকুমার অধীন কুমারখালি গ্রামে হরিনাথের জন্ম। হরিনাথ শৈশবেই মাতৃপিতৃহীন, পিতৃব্যাশ্রয়ে প্রতিপালিত। অর্থাভাব হেতু তিনি বাল্যে রীতিমত বিদ্যার্জ্জনে অসমর্থ হইলেও পরে নিজ যত্নে ও পরিশ্রমে যথেষ্ট বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইনি 'প্রভাকর' নামক সংবাদ পত্রে কবিতাদি লিখিতেন, পরে কুমারখালী হইতে "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" নাম্নী একখানি পত্রিকা স্বয়ং প্রকাশিত করেন। এক সময়ে হরিনাথ নীলকুঠির কাহিনীপ্রচারে বড়ই সংসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। "বিজয়বসন্ত" নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাস গ্রন্থখানি এই হরিনাথ মজুমদার মহাশয়েরই লেখনীপ্রসূত। হরিনাথের প্রণীত "বিজয়া," "পরমার্থ-গাথা," "মাতৃমহিমা," "কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। এতদ্ভিন্ন হরিনাথ বহুসংখ্যক বাউল-সঙ্গীত রচনা করেন। ঐ সঙ্গীত-গুলির শেষ চরণে প্রায়ই "ফিকিরচাঁদ ফকীর" বলিয়া তিনি নিজ নামের ভণিতা দিয়াছেন। এই সকল সঙ্গীত বঙ্গে সুবিদিত, এবং ইহা হইতেই হরিনাথ ফিকিরচাঁদ ফকীর নামে প্রসিদ্ধ। জীবনের অন্তিম ভাগে "কাঙ্গাল" হরিনাথ যথার্থই ফকীর! ভগবৎপ্রেমে বিভোর খেল্কা-ধারী হরিনাথ গোপিযন্ত্র লইয়া নাচিয়া নাচিয়া যখন স্বরচিত গানগুলি গাইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিবা

মাত্রই তাঁহার আন্তরিক অমায়িক বৈরাগ্যভাবের উপলব্ধি করা যাইত। এই মহাত্মার প্রতিভাও প্রশংসনীয়। তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাউল সঙ্গীতটী এক সময়ে বঙ্গে আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বলোকের সুবিদিত ছিল,—

"বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে শ্মশানঘাটে যা'চ্ছ চলে ?
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, লট্‌বহরা, জাত্-বেহারার কাঁধে দুলে।
এত যে ঘরে পরে সবাই কাঁদে, ছেলেয় কাঁদে বাবা ব'লে,
কোথা সে সব মমতা ? কওনা কথা ; এখন কি তা' ভুলে গেলে ?
ঘুরে যে দিল্লীলাহোর ঢাকার সহর টাকা মোহর এনেছিলে,
খেতে না পয়সা সিকি, বল দেখি,—তার কিছু কি সঙ্গে নিলে॥" ইত্যাদি।

বাং ১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে "কাঙ্গাল" হরিনাথ ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

সেকালে যখন কবির গান, পাঁচালী, রামপ্রসাদী গান ইত্যাদির বড়ই প্রচলন, সেই সময়ে বঙ্গসমাজে ক্রমশঃ দুই একটি করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের বিরচিত ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত প্রচারিত হইতে লাগিল। এই গানগুলি তৎকালীন বঙ্গের বড়ই উপকার করিয়াছিল। গায়ক ও শ্রোতা সকলেই মহাত্মা রামমোহন রায়ের গানের প্রশংসা করিতেন এবং ঐগুলির ভাবগাম্ভীর্য্যে ও রচনা-মাধুর্য্যে বিমোহিত হইতেন। এই হইতেই বঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীতের সৃষ্টি, এই হইতেই ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রতি বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্রদ্ধাভক্তি।

কালক্রমে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের অপূর্ব্ব ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হইল ; বঙ্গের শিক্ষিতসমাজে ঐ সমস্ত সঙ্গীতই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ক্রমশঃ গোপ্‌লা উড়ে ও নিধুবাবুর গানগুলিকে ভদ্রসমাজ-বহিষ্কৃত করিল, এবং গানবাজনা যে কেবল বিলাসিতা বা পৈশাচিক প্রমোদের উপকরণ মাত্র, এ সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মাননীয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ওরফে চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাশয় যখন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর স্বরে ঐ সকল সঙ্গীত আলাপ করিতেন, সে সময়ে কলিকাতাস্থ বঙ্গসন্তানগণ, অনেকের ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনাস্থা থাকিলেও, কেবল গান শুনিবার নিমিত্ত ব্রহ্মমন্দিরে যাইতেন, পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবের উপাসনা শুনিতে শুনিতে, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত না হউন, ক্রমশঃ ভগবৎ-ভক্তির অধিকারী হইতেন।

ইদানীং বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে সর্ রবীন্দ্রনাথ, মিঃ ডি, এল, রায়, স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি মনীষিগণের বিরচিত সঙ্গীতাবলী সমধিক প্রচলিত। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি অধিকাংশই ধর্ম্মবিষয়ক এবং তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত শাস্ত্রে সর্ রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়, সন্দেহ নাই।

সর্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী স্বনামধন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠপুত্র। বাং ১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ ইঁহার শুভজন্ম। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু রবীন্দ্রনাথের সুমধুর সুরে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া শ্রোতৃমাত্রেই মুগ্ধ হইতেন। নবমবর্ষ বয়সে তিনি যখন কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার প্রতিভার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বালক রবীন্দ্রনাথের বিরচিত কবিতা দেখিয়া শিক্ষকগণ তাঁহাকে সবিশেষ প্রশংসা করিতেন। নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি পিতার সহিত প্রথমে বোলপুরে, পরে কিছুদিন ডালহৌসি পাহাড়ে অবস্থিতি করেন; তৎপরে মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কর্ম্মস্থল আমেদাবাদে গিয়া বাস করেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেন, এবং "ভারতী" পত্রিকায় বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে গিয়া লণ্ডন নগরস্থ ইউনিভার্সিটি কলেজে ইংরাজি সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

এই মহাত্মা আধুনিক বঙ্গীয় কবিসমাজে অগ্রগণ্য। ইঁহার রচিত কবিতাগুলি স্থানে স্থানে সরল সুমধুর ও উচ্চভাবসম্পন্ন। ইঁহার ভাষার গ্রাম্যতা, ছন্দের বিশৃঙ্খলতা ও ভাবের উদ্‌ভ্রান্ততা সর্ব্বজন-সমাদৃত না হইলেও, এই মহারথী বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্য-সমরে যেন একটা মহামাব উপস্থিত করিয়া নিজভুজবলে বহুজনপ্রদত্ত জয়পত্র লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ এবং নিজেও সুগায়ক, সঙ্গীতরচনাতেও ইঁহার সবিশেষ নৈপুণ্য। 'রবি ঠাকুরের' গান ও কবিতা বর্ত্তমান সময়ের একশ্রেণীর বঙ্গ যুবকদলের কণ্ঠহার স্বরূপ। ইনি সম্প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত 'নাইট্' উপাধি লাভ করিয়া "সর্ রবীন্দ্রনাথ টাগোর কে, টি," নামে সমাখ্যাত হইয়াছেন।

কলিকাতার ঠাকুর অর্থাৎ পীরআলি-বংশে প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর,

দর্পনারায়ণ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীত-বিশারদ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দানশীল কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, সর্ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহাত্মগণ পর্য্যায়ক্রমে নিজ নিজ গুণগৌরবে স্বদেশের গৌরব-বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সর্ রবীন্দ্রনাথই এবংশের সমুজ্জ্বল পঙ্কজ-রবি। পরন্তু সদাশয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবিজ্ঞ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহানুভবগণও উক্ত বংশের অলঙ্কার স্বরূপ। কিন্তু প্রতিভাবিষয়ে তুলনা করিলে উক্ত বংশের সাধু বংশধর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোধ করি রবীন্দ্রনাথের অসমকক্ষ নহেন। শ্রব্যকাব্য রচনায় বাঙ্গালীর মধ্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ এযুগে অনেকের বিচারে অদ্বিতীয়, দৃশ্য-কাব্য অর্থাৎ চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে তেমনই—অনেকের মতে কেন?—সর্ব্ববাদি-সম্মতভাবেই বাঙ্গালীর মধ্যে অদ্বিতীয়—

(বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।)

—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এ দেশে প্রাচীন চিত্রবিদ্যার অধঃপতনের পর গবর্ণমেণ্ট-স্থাপিত চিত্রবিদ্যালয়ই ইদানীং উক্ত বিদ্যার পুনরুন্নতিপথ পরিষ্কৃত করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইদানীন্তন চিত্রবিদ্যায় প্রাকৃতিক চিত্রভঙ্গি ও রাগমাধুর্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হইলেও ভারতীয় অপ্রাকৃত চিত্রভঙ্গির ও অলৌকিক ভাব মাধুর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। বঙ্গীয় আর্ট ষ্টুডিওর চিত্রগুলি অনেক বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও উক্ত বিষয়ে একেবারেই অঙ্গহীন। তাঁহাদের প্রাকৃত নবনারীমূর্ত্তি ও অপ্রাকৃত দেবদেবী মূর্ত্তির প্রভেদ কিছুই নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদের চিত্রিত পূজার্হ লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্ত্তিগুলি যে ঘৃণার্হ বারাঙ্গনা-মূর্ত্তি নহে, তাহা কেবল শঙ্খ পেচক পঙ্কজ বীণা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াই অনুমিত হয়। এই অভাব—এ দেশের এই দারুণ অভাব অসাধারণ প্রতিভাবান্ শ্রীমান্ অবনীন্দ্রনাথই সম্পূর্ণরূপে পরিপূরণ করিয়াছেন। তাঁহার দৈবশক্তি-পরিচালিত সুচারু কর-তুলিকায় যেরূপ গুণত্রয়-বিভাগাত্মিকা মূর্ত্তিসমূহ অঙ্কিত হইয়াছে, বহুদিন বঙ্গে বা সমগ্র ভারতখণ্ডে সেরূপ হয় নাই। বহুদিন ভারতবাসী এই সকল সুচারু সুপবিত্র দৃশ্য দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়-বিভাবিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভঙ্গি এ পর্য্যন্ত আমরা

স্বদেশ-বিদেশাঙ্কিত ইদানীন্তন কোন চিত্রেই দেখিতে পাই নাই। প্রাচীন কালের প্রস্তর-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি বা দুই একটি দেবমূর্ত্তি দর্শনেই মাত্র আমরা উহার আভাস বুঝিতে পারিতাম! এইবার অবনীন্দ্রনাথ আমাদিগকে উহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, ব্যাস বাল্মীকি বিরচিত কাব্যপাঠে মন যেমন যুগান্তরের গভীরতর স্তরে নিমগ্ন হইয়া যায়, অবনীন্দ্র নাথের অঙ্কিত সাত্ত্বিক মূর্ত্তি সকল দেখিলেও চিত্ত যেন সেইরূপ অতীতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়ে।

সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতুস্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ এই গগনেন্দ্রনাথেরই কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যকাল হইতেই অবনীন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ। ইনি সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যাদি সম্মত অনেক সুপবিত্র সুদৃশ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া সবিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং অনেক প্রদর্শনী হইতে পুরস্কার স্বরূপ অনেকগুলি সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যের ত্রিবান্দ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় রবিবর্ম্মাই এতদিন ইদানীন্তন ভারতের অদ্বিতীয় চিত্রশিল্পী বলিয়া সম্মানিত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি, অবনীন্দ্রনাথই প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্ব্বপ্রধান চিত্রকর। রবিবর্ম্মার চিত্রগুলি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক হইলেও উহা সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে পাশ্চাত্য-পদ্ধতি-সম্মত এবং দাক্ষিণাত্য-ভাব-সমন্বিত, প্রকৃত প্রাচ্য ভঙ্গি উহাতে অল্পই লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ আধুনিক চিত্রশিল্পে পাশ্চাত্যভঙ্গির এতই প্রাবল্য যে, অঙ্কিত নরনারী বা দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি প্রাচ্যের কি পাশ্চাত্যের অনুকরণ, তাহা মাত্র কেশ বেশাদির বিন্যাস দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

আধুনিক চিত্রকরগণ রূপবতী স্ত্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইলেই পাশ্চাত্য পদ্ধতিক্রমে উহার গ্রীবাদেশ দীর্ঘ, চরণদ্বয় গুরুতর ও সুদীর্ঘ, বাহুযুগল প্রায় আজানুলম্বিত, মধ্যমাঙ্গ অর্থাৎ কটি হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত দেহভাগ খর্ব্ব, কেশপাশ রুক্ষ ও বিশৃঙ্খল, ইত্যাদি ভাবে সৌন্দর্য্যের অঙ্কপাত করেন। ভারতধর্ম্ম ও ভারতীয় রুচি অনুসারে ঐরূপ আকৃতি যে অশিষ্টা হস্তিনী শঙ্খিনী জাতীয় প্রকৃতির পরিচায়ক, তাহা তাঁহারা জানেন না, বা জানিলেও মানেন না। যাঁহাদের মতে ইউরোপীয় নরনারীর দেহভঙ্গিই সৌন্দর্য্যের আদর্শ, তাঁহারা না হয় বলিতে পারেন যে, ঐরূপ চিত্রই মনোজ্ঞ, কিন্তু

ভারতীয় দেবদেবী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে গিয়া ঐ সকল ভাবভঙ্গি লাগাইলে ইউরোপীয়গণও দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন কি?

স্বর্গীয় মহাত্মা রবিবর্ম্মা অসাধারণ প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পী ছিলেন, তিনি স্বীয় প্রতিভায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, একথা শতবার স্বীকার্য্য, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার্য্য নহে যে, তিনি উপরিউক্ত বৈদেশিক ভাবমিশ্রণ-দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই। এই হেতুই সগৌরবে স্বীকার করিব, আমাদের বঙ্গগৌরব অবনীন্দ্রনাথ প্রশংসিত বর্ম্মা মহাশয়কেও পরাজিত করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র এক বিচিত্র ভাবসম্পন্ন। সে ভাব সম্পূর্ণ ভারতীয়, এমন কি ভারত ভিন্ন অন্য দেশে সে ভাবের ভাব বুঝা সাধারণের সুসাধ্য নহে। রবিবর্ম্মার বা আর্টষ্টুডিও প্রভৃতির চিত্রগুলি দেখিলে ইংলণ্ড ইটালীর চিত্রবিদ্যার কথাই সহসা মনে আসে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি দেখিলে ভারতের ঋষিবিদ্যা—যোগবিদ্যা—সিদ্ধদেহ প্রভৃতির কথাই সহসা মনে আসে।

অবনীন্দ্রনাথ কেবল চিত্রবিদ্যা-বিশারদ নহেন, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা। বঙ্গের অনেক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার রচিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ন্যায়বান্ গুণগ্রাহী মহানুভব ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অবনীন্দ্রনাথকে সরকারি চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়া আমাদের সম্যক্ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আমাদের সদাশয় বৈদেশিক শাসকসম্প্রদায় বা অপরাপর ইংরাজগণ আমাদের এই সকল বিদ্যার বিষয়ে যদিও যথেষ্ট উৎসাহ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বদেশীয় ধনবান্ গুণবান্ মহাজনগণ অনেকেই তদ্‌বিষয়ে আদৌ উদাসীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এস্থলে একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

এই কলিকাতা সহরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় এক জন প্রতিভান্বিত সুনিপুণ চিত্রকর। একদা এই ভদ্রলোক একখানি অতীব সুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া বিক্রয়ার্থ ধনবান্ ব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেন; সকলেই তাঁহার চিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন সত্য, কিন্তু কেহই উহা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিলেন না। সিংহ মহাশয় রৌদ্রমধ্যে পদব্রজে ভিক্ষুকের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিয়া অবসন্ন দেহে আমাদের নিকট আসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা তাঁহার সুপবিত্র শ্রীচৈতন্য চিত্রখানি দর্শন করিলাম। দেখিলাম সে এক অপূর্ব্ব

পদার্থ। কবিওয়ার্ড্সওয়ার্থ যেমন কোকিলকে বিহঙ্গমূর্ত্তি অথবা স্বরমাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন, বুঝিতে পাবেন নাই, প্রিয় বাবুর অঙ্কিত চিত্র-পটে যাহা দেখিলাম, তাহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি বলিব অথবা রসভাব ও প্রেমের প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তি বলিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, হতভাগ্য ভারতসন্তান—সিংহ মহাশয় সে দিন বিমর্ষচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কয়েক মাস পরে দৈবযোগে তাঁহার সহিত আর একবার সাক্ষাৎকার হওয়ায় উক্ত চিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রিয় বাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—

"মহাশয়, ঐ চিত্রখানি অঙ্কিত করিতে আমার যে সকল দ্রব্যাদি লাগিয়াছিল তাহার মূল্য ও আমার পারিশ্রমিক হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছিলাম, ঐ চিত্র এক শত টাকায়, ন্যূনপক্ষে পঁচাত্তর টাকায় বিক্রয় করিতে না পারিলে ক্ষতি হইবে। আপনাদের আশীর্ব্বাদে উহা এক শত টাকাতেই বিক্রয় করিয়াছি।"

সিংহ মহাশয়ের সহিত কথোপকথনে জানিতে পারিলাম, কোন এক জন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত সদাশয় ইংরাজ পুরুষ ঐ চিত্র ক্রয় করিয়াছেন। চিত্রকর যদিও পঁচাত্তর টাকাতেই বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি উক্ত ইংরাজ মহাত্মা তাঁহাকে এক শত টাকাই দিয়াছেন। আরও শুনিলাম ঐ সাহেব ঐ চিত্র আবার কলিকাতারই কোন একজন বিশিষ্ট উপাধিধারী বাঙ্গালী বড় লোকের নিকট পাঁচ শত টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন। বিচিত্র এই যে, ইতঃপূর্ব্বে প্রিয় বাবু ঐ চিত্র বিক্রয়ার্থ সেই বাঙ্গালী বড় লোকের দ্বারস্থ হইয়া পঁচাত্তর টাকা মূল্য প্রার্থনা করায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। ছি ছি, কি লজ্জার কথা! এই কি বাঙ্গালীর জাতীয়তা?

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমাজ ও ধর্ম্মকথা।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দকালের মধ্যে বাঙ্গালীসমাজ অনেক বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু গুণগ্রাহিতা বিষয়ে বাঙ্গালী এখনও বড়ই অধঃপতিত। যদি কোন গুণবান্ ব্যক্তি গ্রহবিপাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া কোন স্বজাতীয় ধনবানের শরণাগত হন, তবে অগ্রে তাঁহাকে ঐ বড় লোকের তোষামোদকারী ঘৃণিত মোসাহেবগণের অনুগ্রহ-প্রার্থী হইতে হইবে অথবা উঁহার সমকক্ষ নর্ম্মসখাদির সুপারেস্ সংগ্রহ করিতে হইবে, অথবা ঐ বড়লোক যে ব্যক্তিকে ভয় করিয়া চলেন, যাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে তাঁহার অনিষ্ট সম্ভাবনা হইতে পারে, এরূপ কোন বলীয়ান্ ব্যক্তির অনুরোধপত্র আনয়ন করিতে হইবে। অধিকাংশস্থলে গুণবানের গুণগ্রহণ বা সাহায্য-পুরস্কারপ্রদান এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, যথার্থ গুণবান্ ব্যক্তি এরূপ নিকৃষ্ট উপায়াবলম্বনে স্বার্থ উদ্ধার করিতে স্বভাবতঃই পরাঙ্মুখ, সুতরাং স্বজাতি-সমাজে তাঁহার সহানুভাবক সুবিরল। বড়লোক মহাশয়গণ অনেকস্থলেই প্রায় অযোগ্য পাত্রে অনুগ্রহ পুরস্কার বা সাহায্য দান করিয়াই কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে আর একটি পরভৃতসম্প্রদায় আছে; দারিদ্র্যদুর্দ্দশাপন্ন গুণবান্ ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে এই সম্প্রদায়ের উপাদেয় শীকার স্বরূপে পরিণত হন। এই সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ বিদ্যালয় বা সংবাদপত্র পরিচালন প্রভৃতি কোন না কোন ধনোপার্জ্জনের ঔর্ণনাভিক উপায় অবলম্বন করিয়া সতর্কে প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাঁহাদের তন্তুজালে উপযুক্ত শীকার পতিত হইবা মাত্র তাঁহারা তাহাকে জাল-জড়িত করিয়া স্বোদর-পূরণের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। বিপন্ন জ্ঞানবান্ গুণবান্ ব্যক্তি তাঁহাদের শরণাগত হইলে তাঁহারা তাঁহার প্রতি কৃত্রিম সদাশয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অপ্রাকৃত পরোপকার ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতে থাকেন, নির্জ্জীবকে অর্দ্ধোদরপূরক ভোজ্য প্রদানে কোন প্রকারে সজীব রাখিয়া, যাহাতে তিনি বাহ্য ব্যাপার বা নিজমূল্য সম্যক্ বুঝিতে না পারেন এরূপ ভাবে চক্ষু বাঁধিয়া ঘানিযন্ত্রে যুড়িয়া দেন। হতভাগ্য

নির্ধনের শ্রমলব্ধ অর্থের দ্বারা ঐ সকল পামর প্রতারক স্বীয় পত্নীপুত্রগণের বিলাসবাসনা পরিপূরণ করে। গ্রন্থের প্রণেতা অন্নবস্ত্রবিবর্জ্জিত—প্রকাশক পলান্নভোজী, সংবাদপত্রের সম্পাদক অস্থিচর্ম্মসার, স্বত্বাধিকারী লম্বোদর বৃষস্কন্ধ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মূর্খ ক্ষুধার্ত্ত ক্ষুদ্রাশয় ক্রীতদাসমাত্র, উপস্বত্বভোগী মহাশয়গণ জ্ঞানবান্ ঐশ্বর্য্যবান্ আনন্দময় মহাপুরুষ! খাদ্যখাদকের—বধ্য-ব্যাধের—শব-শকুনির সাধু সম্বন্ধ এই সকল পাল্যপালকের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান।

সমুদায় সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারী প্রভৃতিই যে আমাদের এই মন্তব্যের বিষয়ীভূত তাহা নহে। আমাদের গ্রন্থনায়ক স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের ন্যায় সদাশয় মহানুভব ব্যক্তিগণ যে নিজ নিজ বাণিজ্যব্যপদেশে অনেক গুণবান্ জ্ঞানবান্ বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধারকল্পে অনেক প্রকারে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে। আমরা সবিশেষ সংবাদ রাখি, এক্ষণে যাঁহারা বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের শিরোভূষণ এরূপ কোন কোন ব্যক্তি সংগোপনে শরৎবাবুর সহায়তালাভে দুর্দ্দিনে দারিদ্র-রাক্ষসের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়া সুদিনে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে দশের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। এ বিষয়ে শরৎবাবু স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমতুল্য না হইলেও সমপথাবলম্বী বলিয়া অবশ্যই শ্লাঘ্য। গুণবান্ ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া শরৎ বাবুর শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহার বিপদুদ্ধার-কল্পে স্বতঃপরতঃ সবিশেষ সাহায্য করিতেন। তৎকালে উক্ত ব্যক্তির দ্বারা স্বীয় ব্যবসায়োপযোগী কোনরূপ কার্য্য করাইবার প্রয়োজন হইলে প্রবঞ্চক ব্যবসায়িগণের ন্যায় বিনা বেতনে বা স্বল্প বেতনে মাত্র আশামুগ্ধ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করাইবার পরিবর্ত্তে শরৎ বাবু তাঁহাকে গুণ ও পরিশ্রমের অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করিতেন, এবং পাছে সে ব্যক্তি মনে করেন যে, বিপৎসময় বুঝিয়া তাঁহাকে বুঝি প্রবঞ্চিত বা অবজ্ঞাত করা হইল, এই ভয়ে সেই ব্যক্তির নিকট সততই সঙ্কুচিত ও বিনীত থাকিতেন। মহাত্মা শরৎকুমারের চরিত্রের এই সুমধুর ভাব, এই আশ্রিতের উপাসনা—দীনের অধীনতা, এই অলোক-সামান্য মহত্ত্বটুকু যথার্থই যেন সোণায় সোহাগা বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার পরিচিত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার এই চরিত্রমাধুর্য্য অনুভব করিয়াছেন। অবশ্যই স্বীকার করিব, ইহা শরৎকুমারের পৈতৃক গুণ। দীনহীন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ন্যায় আত্মশ্লাঘাহীন দীনের অধীন সাধু মহাজন এ যুগের শিক্ষিত বঙ্গে সুবিরল। তাঁহার চরিত্রের এক একটি ব্যাপার এক একখানি

সাধু কাব্য বিশেষ। তিনি নিজ ভৃত্যগণের সহিত ব্যবহারেও আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া অনেক সময়ে তাহাদের নিকট বালকের ন্যায় নিতান্ত ভীতলজ্জিতভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। এ দীনতা রামতনুর পবিত্রচরিত্রের অমূল্য সম্পৎ ছিল। সাধুপুত্র শরৎকুমারও সেই অতুল পিতৃসম্পদে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার পাইয়াছিলেন।

আজ যে গুণে শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম্ম দেশে বিদেশে বহুজনসমাদৃত, যে তত্ত্বের অনুবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রসেন ব্রাহ্মসমাজে নববিধান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিলেন, সেই যথার্থ সাম্যবাদের সুস্পষ্ট আভাস স্বর্গীয় রামতনুর পুণ্যজীবনে সবিশেষ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামতনু বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, একথা বলিলে এখন লোকে যাহা বুঝেন, বাস্তবিক তিনি তাহা ছিলেন না। তিনি একেশ্বরবাদী, সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিই তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল, ইহাই তাঁহার ব্রাহ্মত্বের পরিচায়ক লক্ষণ। তিনি জীবনে কখনও ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। কি ব্রাহ্ম, কি খৃষ্টিয়ান্, কি মুশলমান্, কি হিন্দু, যে কোন সম্প্রদায়ের সাধুভক্ত দেখিলেই তিনি তাঁহার পূজা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যে কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তির মুখে ভগবন্নাম-কীর্ত্তন শুনিলেই তিনি প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকেই পরমাত্মীয়জ্ঞানে প্রেমালিঙ্গন করিতেন। ইহাই কি ভক্ত রামতনুর অহিন্দুত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়? যদি হাঁড়ী ও হুঁকার গর্ভেই মাত্র হিন্দুত্বের সারতত্ত্ব নিহিত থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার্য্য, রামতনু বাবু ঘোর অহিন্দু; কারণ তামাক্ তিনি খাইতেন না, অন্নবিচার তিনি করিতেন না। তিনি ভক্তমাত্রেরই প্রদত্ত অন্ন যথার্থই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার এ আচারই কি যথার্থ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যভিচার?

একদিন বৈষ্ণবভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবেশসময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "প্রভো; আপনার ক্রমশঃ যেরূপ ভাবোদয় দেখিতেছি, তাহাতে এই ভঙ্গুর নরদেহ যে আর অধিক দিন এরূপ প্রবল ভগবদ্‌বিরহবেগ সহ্য করিতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু আপনি স্বধামপ্রাপ্ত হইলে আমরা কাহার আশ্রিত হইব, কাহাকেই বা বৈষ্ণব বলিয়া চিনিব, কাহার সঙ্গেই বা মিশিব?"

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে উত্তর করিলেন, "যাহার মুখে একবার মাত্র ভগবন্নাম শ্রবণ করিবে, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে, তাহাকেই আপন বলিয়া আলিঙ্গন করিবে।"

অতঃপর আবেশভঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব প্রকৃতিস্থ হইলে ভক্তগণ পুনর্ব্বার উক্তরূপ প্রশ্ন করায় মহাপ্রভু কহিলেন,—"যাঁহাকে দর্শন করিলে মুখে স্বতঃই ভগবন্নামের স্ফূর্ত্তি হইবে, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।"

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত এই উভয় পারিভাষিক বাক্যানুসারেই ত বিচার করিলে রামতনুবাবুকে আমরা পরম বৈষ্ণব বলিয়া পূজা করিতে পারি। যেহেতু রামতনুবাবুর প্রতিদিনের উচ্চারিত বাক্যাবলির অধিকাংশই ভগবন্নাম ও ভগবৎকথাসংবলিত। অতএব প্রথম পারিভাষিক সূত্রানুসারে তিনি পরম বৈষ্ণব। আবার যাঁহারা সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষকে দেখিয়াছেন বা তাঁহার সহিত দুই এক দণ্ড আলাপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন, রামতনুবাবুকে দেখিলে মহাপাষণ্ডেরও অন্তরে তদ্দণ্ডে কেবল ভগবৎকথা ব্যতীত অন্য কথালাপ করিতে ইচ্ছা হইত না। অতএব শেষোক্ত সূত্রানুসারেও তিনি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব।

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট একদিন ভক্তমণ্ডলীকে কহিয়াছিলেন,—"যাঁহারা কেবল আমাকে প্রভু প্রভু বলিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদিগকে পরিণামে আমি গ্রাহ্য করিব না, কিন্তু যাঁহারা জগৎপিতার আদেশপালন করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই আমি আমার বলিয়া গণ্য করিব।"

খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম যদি এইরূপই হয়, তবে ত রামতনু বাবু একজন সাধু খৃষ্টিয়ান্।

এইরূপে, অধিকাংশ প্রচলিত ধর্ম্মের মর্ম্মবিচারে দেখা যায়, সাধুপ্রবর স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ও তজ্জাতীয় ব্যক্তিগণ একপক্ষে হিন্দু মুশলমান বা ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান্ যে কোন অভিধানেই অভিহিত হইতে পারেন, অপরপক্ষে সমাজগণ্ডী মাপিয়া দেখিলে, তাঁহারা না হিন্দু, না মুসলমান, না ব্রাহ্ম, না খৃষ্টিয়ান্,— কোন গণ্ডীর মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ নহেন। পুরাণ ইতিহাস সহায়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিবে, যথার্থ অনুরাগী ভক্তের আবহমানকাল ইহাই নির্দ্দিষ্ট স্থান, এইরূপই তাঁহাদের প্রকৃষ্ট অভিধান। হিন্দুগণ যদি বলেন, রামতনু জাতিবিচার করিতেন না, অতএব তিনি আমাদের কেহ নহেন, বা ব্রাহ্মগণ যদি বলেন রামতনুবাবু দীক্ষিত হন নাই, অতএব তিনি ঠিক ব্রাহ্ম নহেন, তাহা হইলে রামতনুবাবুর কিছুমাত্র মর্য্যাদা নষ্ট হইবে না, বরং হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজই স্বীয় মূর্খতাফলে নিজমর্য্যাদা খর্ব্ব করিবেন,—উজ্জ্বল কোহিনুর হেলায় হারাইবেন।

রামতনু যাহাই হউন, আমরা বলিব তিনি যথার্থ ব্রাহ্ম, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ ;

আমরা বলিব, দেবেন্দ্রনাথ যদি মহর্ষি বা রাজর্ষি, দেবতুল্য রামতনু তবে যথার্থই দেবর্ষি।

এই দেবর্ষি-জীবনে যে সর্ব্বধর্ম্মসমতার আভাস প্রকাশ পাইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে তাহা সমুজ্জ্বল শ্রীধারণ করিয়াছে, নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে তাহার জয়গান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামমোহন রায় প্রমুখ ব্রাহ্মগণ, মুশলমান ফকিরগণ, বাউল বৈষ্ণবগণ, ঘোষপাড়ার স্বনামপ্রসিদ্ধ ঘোষ ঠাকুরগণ প্রভৃতি উদার-প্রকৃতিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণই আমাদের ইদানীন্তন সর্ব্বজনীন সাম্যভাবের প্রথম প্রবর্ত্তক। স্বর্গীয় মহাপুরুষ রামতনু লাহিড়ী মহাশয় যে এই সাম্যবাদি-দলের একজন অগ্রণী ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। চতুঃশতাধিক বর্ষপূর্ব্বে ভারতবর্ষে, পঞ্জাবে শ্রীগুরু নানক এবং বঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব এই সাম্যভাবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

বহুদিন পরে বঙ্গদেশে ঘোষপাড়া গ্রামে এক আকস্মিক ধর্ম্মমতের প্রচার আরম্ভ হইল। এই ধর্ম্মমত প্রধানতঃ অশিক্ষিত সমাজেই প্রতিপত্তি লাভ করিল বটে, কিন্তু ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও পূর্ব্বোক্ত ঘোষপাড়ার ঘোষঠাকুরগণের আর পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মপ্রভাব নাই, তথাপি কলিকাতার ন্যায় শিক্ষাসভ্যতার লীলাস্থলীতেও অনেক উচ্চবংশীয় শিক্ষিত পরিবারস্থ মহিলাগণও গোপনে উক্ত মতাবলম্বিনী। সুতরাং সভ্যশিক্ষিতগণ স্ব স্ব জ্ঞানৈশ্বর্য্যাভিমানে এই ধর্ম্মমতটিকে নগণ্য মনে করিলেও অগণ্য বঙ্গবাসী উত্তমাধম নরনারী এই মতের পক্ষপাতী হওয়ায় ইহা অবশ্যই বঙ্গসমাজের এক আকস্মিক অদ্‌ভুত সংস্কারসূত্র বলিয়া গণনীয়।

বস্তুতঃ এই কলিকাতাতেই এরূপ দৃশ্য বিরল নহে যে, পরিবারস্থ পুরুষগণ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়াই বন্ধুবান্ধবে চা বিস্কুট লইয়া বসিলেন, বেলা আটটা পর্য্যন্ত তাঁহাদের তদবলম্বনেই কালযাপন, অতঃপর সত্বর স্নানাহার সমাপনপূর্ব্বক আপিসে গমন, পরে দিবাবসানে সাড়ে ৫টা বা ৬টার সময়ে গৃহে প্রত্যাগমন, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগান্তে বন্ধুবান্ধব সহ বহির্গমন, মাদকাদি-সেবনে বীভৎস আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকিয়া রাত্রি ১০টা ১১টার সময়ে গৃহে আসিয়া ভোজনান্তে নিদ্রা, নিদ্রাভঙ্গেই পুনর্ব্বার প্রভাতমুখ দর্শন! এইরূপেই তাঁহারা মনুষ্যত্বের দায়িত্ব পরিশোধ করিতেছেন!

তাঁহাদের গৃহে তবে কি ধর্ম্ম নাই? তাহা নহে, অন্তঃপুরে গিয়া দেখুন,

গৃহিণী ও বধূগণ হয়ত মাংসাদি ভোজন করেন না, মিথ্যা প্রবঞ্চনা পরিহার করিয়া চলেন, স্নানান্তে একটি নির্জ্জন গৃহস্থিত সতীমায়ের আসনে গিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করেন, প্রতি শুক্রবারে তথায় পূজার্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। বর্ষান্তে গৃহিণী গোপনে ঘোষপাড়ায় গিয়া মানসিক পূজাদি দিয়া আসেন। আবার সুদূর পল্লীতেও নিরক্ষর চর্ম্মকার চণ্ডালাদির গৃহেও কখন কখন ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষপাড়ার প্রভাবে তাহারা বর্ব্বর হইয়াও সংযমশীল সাধু, ধর্ম্মজ্ঞ না হইয়াও বিশ্বাসী ভক্ত এবং দরিদ্র হইয়াও ভদ্র। পল্লীগ্রামের হাতুড়িয়া চিকিৎসকগণ যেমন কুটীরবাসী নিঃসম্বল কৃষকগণের জীবনরক্ষক, সেইরূপ ঘোষপাড়ার ঘোষ ঠাকুরগণও বঙ্গদেশের বহুতর অশিক্ষিত অধম পাপাচারীর পরম বন্ধু।

অতএব আমরা জ্ঞানাভিমানবশে ঘোষপাড়ার ধর্ম্মমতটিকে নগণ্য জ্ঞান করিতে কখনই পারি না। এই মতটীকে সাধারণতঃ লোকে সতীমায়ের মত বলিয়া থাকে। ইহার উৎপত্তি ও প্রসার বিষয়ে নিম্নলিখিতরূপ প্রবাদ প্রচারিত আছে :—

শতাধিক বর্ষ অতীত হইল, ঘোষপাড়ার ঘোষবংশে সতীনাম্নী একটি পতিব্রতা সাধ্বী রমণী ছিলেন। তাঁহার পতি গলিতকুষ্ঠ দুরদৃষ্ট দরিদ্রব্যক্তি, উত্থানশক্তি রহিত! সাধ্বীসতী উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনে কায়মনোবাক্যে মৃতকল্প পতির পরিচর্য্যা করিতেন, রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পতিপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার রোগযন্ত্রণা নিবারণের নিমিত্ত নানারূপ সেবাশুশ্রূষা করিতেন।

এই সময়ে ভাগীরথী ঘোষপাড়ার নিকটবর্ত্তিনী। গ্রামের কুলকামিনীগণ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে কুম্ভ লইয়া ভাগীরথী হইতেই জলাহরণ করিতেন। একদিন পূর্ব্বপ্রশংসিতা পতিব্রতা সতী প্রদোষসময়ে কুম্ভকক্ষে ভাগীরথী যাত্রা করিয়াছেন, পথিমধ্যে পল্লীবাসিনী নারীগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা বলিলেন, "আমরা জল লইয়া আসিলাম, এখন সন্ধ্যাকালে তুমি একাকিনী জল আনিতে যাইতেছ! তা যাও, দেখিও, কোথা হইতে একটা শব আসিয়া ঘাটকূলে লাগিয়াছে; তুমি একটু তফাৎ হইতে জল লইয়া আসিও।"

পতিব্রতার গৃহে পতিসেবার উপযোগী জলমাত্রও নাই, সুতরাং তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন ঘাটে যথার্থই একটি নরদেহ ভাসিতেছে। কুম্ভকক্ষে পতিপরায়ণা ধীরে ধীরে ঘাটে নামিলেন, সহসা শবের নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইল, সাধ্বী বুঝিলেন তখনও

সে ব্যক্তি জীবিত; কিন্তু তাহার দেহ কুষ্ঠব্যাধিতে ক্ষতবিক্ষত ও দুর্গন্ধময়। সে ক্ষীণস্বরে কহিল, "মা, আমি জল খাইতে আসিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছি, আমার শরীরের দুর্গন্ধে কেহই নিকটে আসিতেছে না। তুমি যদি দয়া করিয়া হাত ধরিয়া আমায় তুলিয়া দাও তবেই আমার প্রাণরক্ষা হয়।"

দয়াবতী সতী বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কোথায় যাইবেন?"

কুষ্ঠী।—আমি আর কোথায় যাইব? লোকালয়ে ঘৃণা করিয়া কেহ আমায় স্থান দেয় না। অগত্যা এই গঙ্গাতীরে বসিয়াই রাত্রিযাপন করিব।

সতী।—আপনি দয়া করিয়া আমার গৃহে চলুন। আমার স্বামীও এইরূপ রোগাক্রান্ত, আমি যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করিয়া থাকি; সুতরাং আমার আর ইহাতে ঘৃণা নাই। আপনি চলুন, আমি এক জনের যদি সেবা করিতে পারি, তবে দু'জনের সেবাও করিতে পারিব।"

অতঃপর সেই সাধুশীলা রমণী জলাহরণ পূর্ব্বক কুষ্ঠীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গৃহকর্ম্মাদি সমাধা করিয়া ভোজনান্তে উভয় কুষ্ঠীকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। নিশীথসময়ে সহসা দেখিলেন, তাঁহার সেই পর্ণকুটীরখানি আলোকময় হইয়া উঠিল, এবং সেই অভ্যাগত অতিথি রুগ্নদেহের পরিবর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময় দিব্যদেহ ধারণ করিয়া সতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"মা, তোমার অসামান্য পতিভক্তি দেখিয়া আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।"

সতী কহিলেন,—"বাবা, তুমি কে, কি অভিপ্রায়েই বা এইরূপ ছদ্মবেশে আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছ?"

অতিথি উত্তর করিলেন,—"মা, আমার নাম আউলিয়াচন্দ্র মহাপ্রভু, আমি তোমার হিতার্থেই এইরূপে এখানে আসিয়াছি।"

সতী।—আউলিয়াচন্দ্র মহাপ্রভু!—তিনি কে? আমি ত কখন তাঁহার নাম শুনি নাই!

অতিথি।—নবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নাম শুনিয়াছ কি?

সতী।—হাঁ, শুনিয়াছি, তিনি ত স্বয়ং ভগবান্!

অতিথি।—হাঁ, তিনিই আমি। মা, তুমি মনোমত বরপ্রার্থনা কর। আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।

সতী।—(সজল নয়নে) বাবা, এত দিনে যদি এ অভাগীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে এই বর প্রদান কর যে, আমার স্বামী অবিলম্বে রোগমুক্ত হইয়া দিব্যকান্তি লাভ করুন।

অতিথিরূপী ভগবান্ কহিলেন,—"তথাস্তু।"

অমনি সতী দেখিলেন, তাঁহার নিদ্রিত পতিদেবতা রোগমুক্ত হইয়া দিব্যকান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"মা, পুনর্ব্বার বর প্রার্থনা কর"। সতীমা বলিলেন,—"আমাদের এই দারিদ্রদুঃখ দূর হউক, অদ্য হইতে আমাদের প্রতি যেন কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়।"

শ্রীভ।—তথাস্তু। পুনরায় বর প্রার্থনা কর।

সতী।—আমার বংশে যেন চিরদিন আপনার দয়া থাকে।

শ্রীভ।—তথাস্তু। আমার গায়ে যে কাঁথাখানি দিয়াছিলে, ঐ কাঁথাখানি তোমার বাড়ীর ডালিমগাছটিতে ঝুলাইয়া রাখিও; যে কোন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ডালিমতলার ধূলি গায়ে মাখিলে রোগমুক্ত হইবে। আজ হইতে তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে, এবং যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই সফল হইবে। যে তোমার শরণাপন্ন হইবে, আমি তাহার প্রতি সদয় হইব।

এতাবৎ কহিয়া শ্রীভগবান্ অন্তর্ধান করিলেন। তদবধি সতীমায়ের সর্ব্বাপৎ-শান্তি হইল! তাঁহার স্বামীর আরোগ্য ও দিব্যকান্তিলাভ দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হইয়া একবাক্যে সবাই সতীমাকে "ধন্য ধন্য!" কহিতে লাগিল। দেশদেশান্তর হইতে অন্ধ আতুর খঞ্জ বধির বিপন্ন ব্যক্তিগণ দলে দলে আসিয়া ডালিমতলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শ্রীশ্রীআউলিয়াচন্দ্র মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীসতীমায়ের নাম সর্ব্বত্র জাহির হইয়া পড়িল। ক্রমে সতীমায়ের সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল।

আউলিয়াচন্দ্র বা "আউলচাঁদ" এই নামটি সম্বন্ধে আর একটি ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। উহা নিম্নে লিখিত হইল।

নদিয়া জেলায় উলাগ্রামে মহাদেব দাস নামক একজন বারুজীবী শূদ্র বাস করিতেন। মহাদেব এক দিন পানের বরজের মধ্যে গিয়া সহসা একটি অষ্টম-বর্ষীয় রূপবান্ বালককে দেখিতে পান। বালক তাহার নিজ পরিচয় কিছুই কহিতে পারিল না। মহাদেব বালকটিকে বাটীতে লইয়া আসিলেন। মহাদেবের পত্নী বালকটিকে পাইয়া পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং বালকের অপরূপ মুখজ্যোতিঃ দেখিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক তাহার নাম রাখিলেন পূর্ণচন্দ্র।

পূর্ণচন্দ্র বহুদিন মহাদেবের বাটীতেই কাটাইলেন। মহাদেবের পত্নী তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন সত্য, কিন্তু মহাদেব স্বয়ং তাঁহাকে নানা উপলক্ষ্যে সততই তাড়না করিতেন। কালক্রমে মহাদেবের পত্নী পরলোকে গমন করিলেন। তখন তাড়নাভয়ে পূর্ণচন্দ্র মহাদেবের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া হরিহর নামক এক বিষ্ণুভক্তের গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এইখানে আসিয়া তিনি বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

হরিহর পূর্ণচন্দ্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র কোন মতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না।

এই ইতিহাসানুসারে, পূর্ণচন্দ্র বাঙ্গলা ১২৩৭ সালে ফুলিয়া গ্রামে সাধুবৈষ্ণব শ্রীযুক্ত বলরাম দাসের নিকট আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণের সময়ে গুরু শিষ্যের নাম পূর্ণচন্দ্রের পরিবর্ত্তে আউলিয়াচন্দ্র বা আউলচাঁদ রাখিলেন। পারস্য ভাষায় আউলিয়া বা আউল শব্দের অর্থ অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি।

দীক্ষার পরে আউলচাঁদ গুরু বলরাম দাসের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন। তথা হইতে গুরু ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু শিষ্য আউলচাঁদ বহুদিন ধরিয়া ভারতের বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, পরে বজরা গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার সুমধুর ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া এবং অমানুষিক প্রভাব দেখিয়া অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। প্রবাদ আছে, আউলচাঁদের কৃপায় অন্ধে দৃষ্টিশক্তি এবং বধিরে শ্রবণশক্তি পাইত।

বাঙ্গলাদেশে কর্ত্তাভজা নামে যে সম্প্রদায় আছে, আউলচাঁদই উহার প্রবর্ত্তক। তাঁহার ২২জন প্রধান শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে রামশরণ পাল, খেলারাম মাল, বেচুঘোষ, হটু ঘোষ, কৃষ্ণ দাস, বিষ্ণুদাস, শ্যামচাঁদ, পাঁচু মুচি প্রভৃতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পূর্ব্বোক্ত ঘোষপাড়ার ঘোষঠাকুরেরা যে উল্লিখিত বেচুঘোষ বা হটুঘোষের বংশধর, এ কথা প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বেচুঘোষ বা হটুঘোষের পূর্ব্বেই যে সতীমায়ের আবির্ভাব, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আউলচাঁদ তাঁহার শিষ্যদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময়ে মন্ত্রদান করিয়া দশটি উপদেশ প্রতিপালন করিতে বলিতেন। সে দশটি উপদেশ এই :—

১। একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিবে। কদাপি অন্য দেবতার বা অন্য ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিবে না।

২। মন্ত্রদাতা গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান করিবে না। প্রত্যহ তাঁহাকে প্রত্যক্ষে বা মানসে প্রদক্ষিণ করিবে।

৩। আত্মপরিত্রাণের একমাত্র উপায় স্বরূপ সতত হরিনাম জপ করিবে, এবং সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

৪। সর্ব্বস্থানেই সৎকথা ও স্বধর্ম্মের আলোচনা করিবে।

৫। কায়মনোবাক্যে অতিথি সৎকার করিবে।

৬। ভোজনের পূর্ব্বে তুলশীতলার মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া দেহ পবিত্র করিবে।

৭। প্রতিদিন প্রভাতে প্রদোষে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে।

৮। সকল জাতিরই অন্নগ্রহণ করিবে, কিন্তু কদাপি আমিষান্ন ভক্ষণ করিবে না।

৯। নিজ সাধন-রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

১০। সর্ব্বদা সত্য আচরণ করিবে, এবং গুরু সত্য, বিপদ্ মিথ্যা, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে।

এই সম্প্রদায়ের মতামত ও আচার ব্যবহার অনেক অংশেই সতীমায়ের সম্প্রদায়ের মতামত ও আচার ব্যবহারের অনুরূপ। এই উভয় সম্প্রদায়েরই গুরুগণের নাম "মহাশয়" এবং শিষ্যগণের নাম "বরাতি"।

আউলচাঁদ ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে সন্ধ্যাসময়ে বোয়ালিয়া নামক গ্রামে মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বোয়ালিয়া গ্রামে তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাস যখন মৃতপ্রায়, সেই সময়ে আউলচাঁদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। অতঃপর গুরুশিষ্য উভয়েই হরিনাম করিতে করিতে এবং হরিধ্বনি শুনিতে শুনিতে সেই স্থানেই দেহত্যাগ করেন।

ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের লীলাসংবরণের পূর্ব্বেই তাঁহার ধর্ম্মমত বঙ্গদেশে বহুবিস্তৃত হইয়া পড়ে। সতীমায়ের ধর্ম্মপ্রভাব ও অমানুষিক শক্তি সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ মহীয়সী সাধ্বী রমণীকে বাস্তবিকই দেবানুগৃহীত এবং দিব্যৈশ্বর্য্যশালিনী বলিয়াই প্রতীতি জন্মে।

কি আউলচাঁদ কি সতীমা উভয়েরই ধর্ম্মশাসনে আমরা যে সকল আদেশ উপদেশের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাতে এই দুইটি ধর্ম্মমতের কোনটিই যে আধুনিক শিক্ষিত সভ্যসমাজে প্রচলিত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ধর্ম্মমতগুলির অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট বা নিন্দনীয় নহে, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি।

সতীমায়ের দেহত্যাগের পর তাঁহার উপযুক্ত বংশধর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ

মহাশয়ও সবিশেষ ধর্ম্মপ্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। ঈশ্বরঘোষের অমানুষিক শক্তি ও দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অবগত ছিলেন।

একদা উক্ত ঘোষঠাকুর মহাশয় চৌকির উপর বসিয়া আছেন, ক্ষৌরকার তাঁহার ক্ষৌরকর্ম্ম করিতেছে, এমন সময়ে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"আরে, রাখ্ রাখ্ রাখ্! একটু সবুর কর্।"

ক্ষৌরকার সসম্ভ্রমে ক্ষৌরকর্ম্ম বন্ধ করিল। ঘোষঠাকুর মহাশয় ইষ্টকালয়ের যে স্তম্ভটি হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, মুদ্রিত নয়নেই উভয় হস্তদ্বারা বলপূর্ব্বক সেই স্তম্ভটিতে ধাক্কা দিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণকাল পরেই "যা! নামিয়া গিয়াছে!" বলিয়া পুনর্ব্বার স্থিরভাবে ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতে লাগিলেন। ক্ষৌরকার স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"কর্ত্তা মহাশয়, ওরূপ করিলেন কেন?"

ঘোষকর্ত্তা উত্তর করিলেন,—"ওরে! বড় বিপদ ঘটিয়াছিল! ওমুক মহাজনের অনেক টাকাব মাল-বোঝাই কিস্তি পদ্মানদীতে চোরাবালিতে পড়িয়া মারা যাইতেছিল। মহাজন ও মাঝিমাল্লা অনেক চেষ্টা করিয়াও নৌকা উদ্ধার করিতে না পারিয়া, অবশেষে মায়ের নামে মানত করিয়া কেবল "দোহাই সতীমা! রক্ষা কর!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। তাই ধাক্কা দিয়া নৌকাখানা নামাইয়া দিলাম। কা'কেও বলিস্ না।"

এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে, আবার এক দিন ক্ষৌরকার কর্ত্তার নিকট ক্ষৌরকর্ম্মে নিযুক্ত, এমন সময়ে কয়েকটি লোক আসিয়া কর্ত্তার সম্মুখে প্রণামি-স্বরূপ কতকগুলি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল এবং উপঢৌকন স্বরূপ নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিল। কর্ত্তার সহিত তাহাদের যে কথোপকথন হইল, তাহাতে ক্ষৌরকার বুঝিতে পারিল যে ঐ ব্যক্তিগণই পূর্ব্বোক্ত মহাজনি নৌকার মালিক, মানত শোধ করিবার নিমিত্তই ঐ অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছে।

ঘোষপাড়ার মতাবলম্বিগণের মধ্যে অদ্যাপি এই সাধন-মতের উক্তপ্রকার নানাবিধ মাহাত্ম্যকাহিনী শুনা যায়। সে যাহাই হউক, উক্ত মতাবলম্বী যথার্থ সাধকগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কাহারও কাহারও কোন কোন বিষয়ে বিশিষ্ট অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় যে অদ্যাবধিও পাওয়া যায় একথা অস্বীকার করা যায় না; এবং সতীমায়ের প্রসাদে যে এ বঙ্গে অসংখ্য নরনারী আধিভৌতিক আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক কোন না কোন প্রকার শ্রেয়োলাভ

করিয়াছেন, এ কথাও এ দেশের রহস্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে এই সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ সঙ্কোচ বই প্রসার দেখা যাইতেছে না।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গসমাজের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ, বিচারে না হউন, আচারে ব্যবহারে ব্রাহ্মভাবাপন্ন; মধ্যম শ্রেণীস্থগণের অনেকাংশই বৈষ্ণব মতাবলম্বী ও শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত, অল্পাংশ শক্তিউপসাক, এবং নিম্নশ্রেণিক প্রায় সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত বা সতীমায়ের ভক্ত। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী বাঙ্গালীগণের মধ্যে ইদানীং আর পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পর দ্বেষ হিংসার প্রবলতা নাই। ভগবান্‌কে যিনি যে ভাবে ভজনা করেন তাহাই সত্য, এইরূপ একটা অপূর্ব্ব বিশ্বাস যেন সকলেরই অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। এ বিশ্বাসের সুসংবাদ এ বঙ্গে প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেব তৎপরেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, উক্ত মহাত্মদ্বয় এ বিশ্বাসের প্রথম প্রচারক মাত্র—আদিম প্রবর্ত্তক নহেন; ইহার প্রবর্ত্তক উদারনীতিক পাশ্চাত্য শিক্ষা। যদিও ইংরাজের ধর্ম্ম এ বিশ্বাসের বিরোধী, তথাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপিত শিক্ষাবিধানে ইহার বীজ অলক্ষ্যে অন্তর্নিহিত আছে।

আমরা পূর্ব্বে যে বঙ্গসমাজের শ্রেণীত্রয়ের উল্লেখ করিলাম, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উহার দ্বারা বঙ্গের হিন্দু সমাজেরই শ্রেণীত্রয় লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে বঙ্গসমাজ বলিতে বঙ্গের হিন্দু মুশলমান ব্রাহ্মখৃষ্টিয়ান এই চতুর্ব্বিধ সমাজের সমষ্টি নির্দ্দিষ্ট করাই যুক্তিসঙ্গত, এবং বঙ্গসমাজের যে কোন অবস্থা বর্ণন করিতে হইলে তৎপ্রসঙ্গে হিন্দুগণের ন্যায় মুশলমান ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান বাঙ্গালীগণের অবস্থা বর্ণন করাও অযৌক্তিক নহে, বরং তাহা না করাই অসমদর্শিতা ও একদেশদর্শিতার কর্ম্ম।

বর্ত্তমানকালের বাঙ্গালী হিন্দুগণ যেরূপ অমায়িকভাবে বাঙ্গালী ব্রাহ্ম মুশলমান ও খৃষ্টিয়ানগণকে গ্রহণ করিতে পারেন, মুশলমান ব্রাহ্ম বা খৃষ্টিয়ানগণ সাধারণতঃ হিন্দুগণকে সেরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। অন্নপানীয় গ্রহণ করিলেই অমায়িক ভাবে গ্রহণ করা হয় না। অপিচ অন্নাদি গ্রহণ ব্যতীতও যে কোন ব্যক্তি অপরকে অনায়াসেই অমায়িকভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। আধিভৌতিক ক্ষেত্রে যিনি যতই ভিন্নভাবাবলম্বী হউন না কেন, আধ্যাত্মিক জগতে সকলেরই সমঅধিকার,—যত্র জীব তত্র শিব,—এই ভক্তিবিশ্বাসই অমায়িকতার আদিনিদান, অন্নগ্রহণ বা অগ্রহণ অবান্তর লৌকিকাচার মাত্র। মুশলমান ব্রাহ্ম

ও খৃষ্টিয়ান বাঙ্গালীগণ সাধারণতঃ স্বস্ব ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত অপর সকলকে সহজেই সেরূপ ভক্তিবিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করিতে পারেন না, করিয়া থাকেন না; আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুগণ সেরূপ সহজেই করিতে পারেন, এবং করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ঐরূপ বিশ্বাসহেতু হিন্দুগণের ধর্ম্ম ও জাতীয়তার বন্ধন যেন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মুশলমান ও খৃষ্টিয়ানগণের সে বন্ধন অদ্যাপি সুদৃঢ় রহিয়াছে। খৃষ্টিয়ান খৃষ্টিয়ানকে বা মুশলমান মুশলমানকে যেরূপ সমাদর করিতে জানেন, হিন্দু হিন্দুকে সেরূপ সমাদর করিতে জানেন না। সর্ব্বজনীন ভাবের স্ফুরণ হেতু হিন্দুর এই উন্নতি বা অধঃপাত; উন্নতি—উদারতার ও সমদর্শিতার, উন্নতি—বিশ্বপ্রেমিকতার; অধঃপাত—স্বজাতিপ্রেমিকতার।

আমাদের বাঙ্গালী মুশলমান ভ্রাতৃগণ এক বিষয়ে বাঙ্গালী হিন্দু ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান সকল অপেক্ষাই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, সে বিষয় তাঁহাদের স্বধর্ম্মে আন্তরিক আস্থা। আমাদের হিন্দু ও ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের মধ্যে সাধারণতঃ ভ্রষ্টতার মাত্রা যত অধিক তাহার তুলনায় মুশলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে উহা অনেক অল্প। হাইকোর্ট জজ হইতে বাজারের মজুর মুটে পর্য্যন্ত সাধারণতঃ সকল মুশলমানই যেরূপ সমানে স্বধর্ম্মবিশ্বাসী, আমরা আর সকলে তেমন নহি।

হিন্দু ব্রাহ্মণ একজন যতদিন দীনহীন অবস্থায় পাচকতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, ততদিন বরং তাঁহার যজ্ঞসূত্রটি পরিষ্কৃত রাখেন, স্নানান্তে দু'দশবার গায়ত্রীও পাঠ করেন, ললাটে চন্দনাদির তিলক ধারণ করেন; কিন্তু যদি তিনি কোন উপায়ে ধনবান্ বা উচ্চপদস্থ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে, প্রায়ই দেখা যায়, তাঁহার পূর্ব্বাচারের অনেক বিপর্য্যয় ঘটে; কিন্তু দারিদ্রপীড়িত মুশলমান—যিনি কোন দিনই নেমাজ রোজা করেন নাই বা করিবার অবসর পান নাই, তিনি যদি কখন কিঞ্চিৎ বিত্ত বা কোন উচ্চপদ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তখন নিয়মিত নেমাজ রোজা প্রভৃতি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বতঃই প্রবৃত্ত হন। হিন্দুসমাজে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই যেন হীনতা ও অসভ্যতার লক্ষণ এবং ভ্রষ্টতাই শিষ্টতার পরিচায়ক, মুশলমানসমাজে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানবর্জ্জনই হীনতা ও অসভ্যতার লক্ষণ এবং আনুষ্ঠানিকতাই মহত্ত্বের পরিচায়ক। এ বিষয়ে হিন্দুগণ হয় অনাস্থাবান্ নয় ভীরু, মুশলমানগণ যেমনই আস্থাবান্ তেমনই সৎসাহসী।

এই কলিকাতা সহরে মুশলমান সমাজের যে পরিমাণ লোক প্রতিদিন পাঁচওক্ত ভক্তি-সহকারে নেমাজ করেন ও প্রতিবর্ষে মাসৈককাল ব্যাপিয়া

প্রতিদিন কঠোর জীবিকা-শ্রম স্বীকার করিয়াও উদয়াস্তকাল উপবাসক্লেশ সহ্য করেন, সে অনুপাতে হিন্দু, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টিয়ান, কোন সমাজের সে পরিমাণ বাঙ্গালী স্ব স্ব নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনা উপাসনা বা অপরাপর অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে সেরূপ নিষ্ঠাপ্রদর্শন—সেরূপ ক্লেশস্বীকার করেন কি না সন্দেহ।

মুশলমানগণের মধ্যে অনেকে স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ সুরাপান কুষীদগ্রহণাদি মহাপাপাচরণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু হিন্দু প্রভৃতি সামাজিকগণের মধ্যে কেহ কেহ যেরূপ কপটতার সহিত নিজ নিজ ধর্ম্মবিরুদ্ধ নানাবিধ মহাপাতকানুষ্ঠান করিয়া থাকেন মুশলমানগণের মধ্যে পাপাচরণের সেরূপ প্রচ্ছাদক কপটাচার ততটা নাই।

হিন্দুধর্ম্ম বহুপুরাতন ধর্ম্ম বলিয়া ইদানীং ইহার অপভ্রংশমাত্রা অনেক অধিক। ঋষিগণের শাস্ত্র ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার, এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অধিক যে, 'হিন্দু' এই নামটিও যেমন শাস্ত্রবহির্ভূত স্বয়মুৎপন্ন উদ্‌ভট্ শব্দ, বর্ত্তমান আচরিত প্রচারিত হিন্দুধর্ম্মটিও সেইরূপই একটি উদ্‌ভট্ ধর্ম্মমাত্র বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ ঋষিগণের সনাতন ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান ব্যাবহারিক হিন্দুধর্ম্মের প্রভেদমাত্রা যেরূপ, উহার সহিত ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান বা মুশলমান ধর্ম্মের প্রভেদমাত্রা তদপেক্ষা বড় অধিক বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সামাজিক হিন্দুধর্ম্মটিকে 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিয়া ব্যাখ্যা করা আর বাগবাজারের খালটিকে গঙ্গা বলিয়া ব্যাখ্যা করা একরূপই কথা। তবে মুশলমান বা খৃষ্টিয়ান সামাজিকগণের বর্ত্তমান আচার ব্যবহারও যে সর্ব্বাংশেই প্রভু যীশুখৃষ্টের উপদিষ্ট বা হজরৎমুহম্মদের আদিষ্ট পবিত্র ধর্ম্মশাসনের সম্পূর্ণ অনুমোদিত, এ কথাও স্বীকার করা যায় না।

সাধারণতঃ ধর্ম্মমাত্রই তিন প্রকারের,—শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম, সামাজিক বা ব্যাবহারিক ধর্ম্ম এবং সাধনধর্ম্ম। শাস্ত্রের ব্যবস্থা হইতে সমাজের ব্যবস্থা অনেকস্থলে অনেকাংশে ভিন্নরূপ, আবার বিশিষ্ট সাধকের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধক শাস্ত্র বা সমাজের ধার তত ধারেন না। গুরুআদেশ দেবাদেশ বা বিবেক-আদেশই তাঁহার শিরোধার্য্য। যখন যে সম্প্রদায়ে এইরূপ বিশিষ্ট সাধকসংখ্যা যত অধিক থাকে, তখন ততই সেই সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বঙ্গের বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান, কোন সম্প্রদায়েই আর সেরূপ বিশিষ্ট সাধকসংখ্যা অধিক দেখা যায় না; এজন্য বর্ত্তমান বঙ্গে কোন ধর্ম্মেরই আর তাদৃশ উজ্জ্বল শ্রী লক্ষিত হইতেছে না।

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্ম্মের শ্রী ফিরাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম যদিও এখন দেশবিদেশব্যাপী হইয়াছে, যদিও তাঁহার ভক্তসম্প্রদায় নানাবিধ লোকহিতানুষ্ঠান দ্বারা শিক্ষিত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের ধর্ম্মশ্রী উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর হইতেছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্ম বহুজনব্যাপী বা ধনিজনসম্মান্য হইলেই যে উজ্জ্বল-শ্রীধারণ করে, তাহা নহে; বরং আলোক যেমন যতই দূর-প্রসারিত হয় ততই ক্ষীণ হইয়া আসে, সেইরূপ ধর্ম্মও যতই বহুকাল বা বহুজনব্যাপী হইয়া পড়ে ততই তাহার জ্যোতিঃ হ্রাস হইয়া আসে। সাধনাই ধর্ম্মের সঞ্জীবন, বিশিষ্ট সাধকাভাবে কোন ধর্ম্মই বিশিষ্ট সজীব শ্রীধারণ করিতে পারে না। ঐশ্বর্য্য বা প্রতিপত্তিলাভ ধর্ম্মের ফলভোগ মাত্র, উদ্দীপক নহে। খৃষ্টিয়ানগণ বর্ত্তমানকালে ভূমণ্ডলে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া কি স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টধর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে উজ্জ্বলতর শ্রীধারণ করিয়াছে? বর্ত্তমান ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদারূঢ় ও জ্ঞানবান্ গুণবান্ হইয়াছেন বলিয়া কি স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর প্রভা বিস্তার করিতেছে? বরং স্বীকার করিতে পারি যে, এই সকল ধর্ম্মসমাজ পূর্ব্বানুষ্ঠিত প্রগাঢ় সাধনানুরূপ সুফলভোগ করিতেছে। উক্তরূপ ফলভোগের উন্মত্ততা হেতু বর্ত্তমানে যদি বাস্তবিকই সাধনশৈথিল্য ঘটিয়া থাকে, তবে তাহারও ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী।

সাধনশৈথিল্যের ফলভোগ হিন্দুগণ সবিশেষ করিয়াছেন। সংপ্রতি ক্রমশঃ আবার তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সাধনপথে দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহা বলিয়া এ কথা স্বীকার্য্য নহে যে, গৈরিকধারী গৃহত্যাগী হিন্দু মাত্রেই বিশিষ্ট সাধক। বরং আমাদিগের বিশ্বাস, ঐরূপ গৃহত্যাগিগণের অপেক্ষা গৃহাশ্রমিগণের মধ্যে অনেকের সাধনমাত্রা সমধিক।

আজকাল দলবদ্ধ হইয়া মৃদঙ্গ করতাল বাদ্য সহকারে সংকীর্ত্তনপ্রথা হিন্দু ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়েও প্রচলিত হইয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এ প্রথা হিন্দুগণের মধ্যে যে মাত্রায় প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহার চতুর্গুণ, এবং অনেকেই আন্তরিক ভক্তিবিশ্বাসপূর্ব্বকই এ সাধনে যোগদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দপ্রভুই এ সাধনার প্রধান প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁহাদিগকে "সঙ্কীর্ত্তন-পিতরৌ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। হিন্দুসমাজে শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য ও বৈষ্ণব সকলেই অবাধে হরিসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান

করিয়া থাকেন। তবে, যাঁহারা উহার সবিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহারা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব ও শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত।

বঙ্গের বর্ত্তমান যুগে হিন্দুগণের মধ্যে শক্তি উপাসকের সংখ্যাও কম নহে। গৈরিক বা রক্তবস্ত্রধারী দীর্ঘকেশ সিন্দূরশোভিতললাট ত্রিশূলহস্ত শাক্ত বাঙ্গালী অনেক দেখা যায়। ইঁহারা সকলেই যে বিশিষ্ট সাধক তাহা নহে, আবার কেহই যে সাধনপথে উন্নতিলাভ করেন নাই তাহাও নহে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে মহাপাত্রে অর্থাৎ নর-কপালে সুরাপান এবং মহাশঙ্খের অর্থাৎ নরকঙ্কালের মালা ধারণ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী শাক্তগণের মধ্যে আজ কাল পূর্ণাভিষেকের প্রথাটি বড়ই প্রচলিত। এক গুরুর নিকট যাঁহার মন্ত্রদীক্ষা হইয়াছে, আর এক গুরু তাঁহাকে পূর্ণাভিষেকচ্ছলে স্বীয় শিষ্যত্বে দীক্ষিত করিতে সহজেই পারেন; একারণ অনেক গুরুই পূর্ণাভিষেকপ্রথার প্রশ্রয়দাতা। ফলতঃ আধুনিক বঙ্গীয় শাক্তমণ্ডলে পূর্ণাভিষিক্তের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু প্রকৃত সাধকসংখ্যা অনেক কম।

বঙ্গের ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত। চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহাদের নিত্যপাঠ্য। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতই সাধুভক্ত, কিন্তু অনেকেই অল্পাধিক মাত্রায় ধর্ম্মাভিমানী, মনে মনে যেন আপনাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া মীমাংসা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষিত বঙ্গের পশ্চিম খণ্ডের বিষ্ণুভক্তগণ অনেকেই জটিয়াবাবা অর্থাৎ স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অনুবর্ত্তী। আবার পূর্ব্ববঙ্গের বিষ্ণুভক্তগণ অনেকেই 'জগদ্‌বন্ধু' প্রভুর ভক্ত ও উপাসক। জটিয়া-বাবা এ যুগে শিক্ষিতবঙ্গের একজন প্রধান পথপ্রদর্শক। আবার জগদ্‌বন্ধু-প্রভুও পূর্ব্ববঙ্গীয় অনেক শিক্ষিতাশিক্ষিত বৈষ্ণবভক্তের প্রধান উপাস্য। অতএব উক্ত মহাত্মদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-

মহাশয় সন ১২৫১ সালে শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আনন্দকৃষ্ণ গোস্বামী। বিজয়কৃষ্ণ শৈশবকালেই পিতৃহীন। তিনি বাল্যকালে স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়া পরে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি সাঁতরাগাছিতে চৌধুরী মহাশয়গণের

বাটীতে থাকিয়া প্রত্যহ কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। কিছুদিন পরে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উপবীত পরিত্যাগ করিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান পরিচালক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত গোস্বামী মহশয়ের সবিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র কুচবিহারের মহারাজের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেওয়ায় গোস্বামী মহাশয় কেশববাবুর সমাজ পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী প্রভৃতির সহযোগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামক একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ চিরদিনই উদারনীতিক ও স্বাধীন-প্রকৃতিক; সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য ছিল। একারণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ অধিককাল স্থায়ী হইল না। তিনি একাকী উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে গয়াধামে এক সাধু মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেন। এই যোগীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া গোস্বামী মহাশয় ক্রমশঃ কৃষ্ণভক্ত মহাবৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। তিনি কিয়দ্দিন কাশীধামে থাকিয়া ইষ্টসাধনা করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবংশের কুলতিলক জটাজুটধারী পরম ভাগবত বিজয়কৃষ্ণ শেষ বয়সে সাধুমণ্ডলে "জটিয়াবাবা" নামে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেন। এদেশে বহুসংখ্যক শিক্ষিত বঙ্গযুবক বিজয়কৃষ্ণের লাবণ্যময় সৌম্যমূর্ত্তি, অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম ও শান্তশীতল স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইদানীং বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে কীর্ত্তনাদি বৈষ্ণবাচারের যে বহুপ্রচলন দেখা যায়, পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও তাহার একজন প্রধান প্রবর্ত্তক।

প্রাচীন বয়সে গোস্বামী মহাশয় পুরীধামে গিয়া অবস্থিতি করেন। শুনা যায় এই সময়ে বড় একটি কৌতুকজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। পুরীক্ষেত্রে বানরের উপদ্রবহেতু তথাকার মিউনিসিপালিটি তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রে সাহেবের অনুমত্যনুসারে বানরবধের আদেশ প্রচারিত করেন। ইহাতে পুরীর ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ সবিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু সে আপত্তি নিষ্ফল হইল। তখন জটিয়াবাবা হিন্দুসমাজের মর্ম্মাঘাতকারী এই বানরবধ ব্যাপারের বিরুদ্ধে কলিকাতায় সম্রাট্‌প্রতিনিধির নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। লাটসাহেব উহার প্রত্যুত্তরে অবিলম্বে বানরবধ রহিত করিবার আদেশ দিলেন। অব্যবহিত পরেই একদিন পুরীক্ষেত্রচারী বহুসংখ্যক বানর দলবদ্ধ হইয়া জটিয়াবাবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত! তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে কদলী প্রভৃতি কোন না কোন প্রকার উপঢৌকন দ্রব্য! তাহারা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ঐ দ্রব্যগুলি বাবার সম্মুখে

রাখিয়া সকলে সারি সারি হাতযোড় করিয়া বসিয়া রহিল। জটিয়াবাবা অমায়িক প্রেমভরে তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সমাদর প্রদর্শন করিলেন। পরক্ষণেই তাহারা প্রসন্নমনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। জটিয়াবাবা সম্বন্ধে এইরূপ নানাবিধ অলৌকিক উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়।

গোস্বামী মহাশয়ের বিশিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করেন যে, এখনও নিয়মিত উপাসনা কীর্ত্তনাদিকালে বা স্বপ্নাবস্থায় তাঁহারা কখন কখন তাঁহাদের গুরুদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাব শ্রীমুখের আদেশোপদেশ বাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পুরীধামে মাসাধিক বর্ষকাল অবস্থিতি করিয়া ৬৪ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পুণ্যদেহ উক্ত পুণ্যধামেই ভক্তগণ কর্ত্তৃক মহাসমারোহে সমাহিত হইয়াছিল। পুরী-যাত্রিকগণের মধ্যে ইদানীং অনেকেই জগন্নাথদর্শন যেমন কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন, জটিয়াবাবার সমাধি দর্শনও সেইরূপ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন।

জটিয়াবাবা যে বর্ত্তমান বঙ্গের একজন বিশিষ্ট যুগনায়ক, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গে আরএক জন অপূর্ব্ব যুগনায়কের আবির্ভাব অবগত হওয়া যায়। বৈষ্ণব ভক্তসমাজে অনেকে এই মহাত্মাকে অবতাব বলিয়া স্বীকাব করেন। ইঁহাব চরিত্র বড়ই রহস্যময় এবং বাহ্যাড়ম্ববর্জ্জিত। ইনি লোকচক্ষুব অন্তরালে কি যে এক মহাসাধনে সমাহিত আছেন তাহা অন্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন। এই মহাত্মার নাম—

প্রভু-জগদ্বন্ধু।

ইনি বারেন্দ্রশ্রেণিক ব্রাহ্মণ, জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ, নিবাস ফরিদপুরে। ইনি বাল্যকালে কিয়দ্দিন ইংবাজি স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া পরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞসাধনে নিরত হন। ইনি অকৃতদার চিরকুমার, মূর্ত্তি অলৌকিক লাবণ্যময়।

পাবনায় "বুড়ো শিব" নামে এক পাগ্‌লা ফকির ছিলেন। শুনা যায় জগদ্বন্ধু কখন কখন নিশীথ সময়ে সেই পাগ্‌লা ফকিরের নিকট যাতায়াত করিতেন। প্রবাদ আছে, এই বুড়ো শিবের বিশিষ্টরূপ দৈবশক্তি ছিল।

বুড়োশিব নাকি অবশেষে একটি নরহত্যা হেতু অপরাধী সাব্যস্ত হন। পুলিশ আসিয়া বুড়োশিবের বাসকুটীর বেষ্টন করিল এবং দেখিতে পাইল, ফকীর কুটীর মধ্যে শয়ন করিয়া পা নাড়িতেছেন, কিন্তু কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা নাকি তথায় আর জনপ্রাণীরও দর্শন পাইল না। সেই হইতেই আর কেহ কোথাও বুড়োশিবের সন্ধান পায় নাই।

প্রভু জগদ্‌বন্ধু এই বুড়োশিবের শিষ্য হউন আর নাই হউন, তিনি যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি এবং কঠোর সংযমী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহার প্রথম অভ্যুদয় কালে প্রেমানন্দ ভারতী নামক একজন কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মণ যুবক ইঁহার অনুচারিত্ব অবলম্বন করেন। কিছুদিন পরে ভারতী মহাশয় জগদ্‌বন্ধুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থান পর্য্যটনের পর আমেরিকার কলিফর্ণিয়া নামক স্থানে গিয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রম নামে একটি বৈষ্ণবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং "বাবা ভারতী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কলিফর্ণিয়া বাসকালে বাবা ভারতী তাঁহার "লাইট্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক পত্রে যে সকল সারগর্ভ ইংরাজি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কি ভাষা-গৌরবে, কি ভাবমাধুর্য্যে, কি ওজস্বিতাপ্রভাবে ঐ প্রবন্ধগুলি কোন অংশেই বিবেকানন্দ-প্রবন্ধাবলী অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় নহে। ভারতী মহাশয় যখন পুনরায় ভারতে ফিরিলেন, তখন কিন্তু দেখা গেল, তিনি যেমন পাশ্চাত্যে প্রাচ্যালোক বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন, তেমনই আবার স্বয়ং পাশ্চাত্য মন্ত্রের উপাসক হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

এই পাশ্চাত্যসংক্রামকতার আভাস আমরা বিবেকানন্দ প্রভৃতির চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলেও স্পষ্ট দেখিতে পাই।

যাহা হউক, ভারতে আসিয়া ভারতী মহাশয় কলিকাতা বৌবাজারে একটি বাটী ভাড়া করিয়া একখানি দৈনিক ইংরাজি সংবাদ পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ঐ পত্র প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার বাহির হইতে লাগিল। বাবা ভারতী—পিতৃদায়ের অপেক্ষাও গুরুতর—এই পত্রদায়ে পড়িয়া গললগ্নবাসে কত ধনবানের দ্বারস্থ হইয়া মহদ্‌ভিক্ষার প্রত্যাশী হইলেন! এইরূপ পাশ্চাত্যবাতিক-তাড়িত হইয়া বাবাজী মহাশয় অনেকস্থানে অনেক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন। কাল কিন্তু ছাড়িল না, অকালেই তাঁহাকে কবলিত করিয়া স্বীয় অপরাজেয় প্রতাপ প্রতিপন্ন করিল। মোটের উপর আমরা বুঝিলাম, জগদ্‌বন্ধুর বন্ধুত্ব-পরিহার পূর্ব্বক স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে যাওয়াই বাবাজির অধঃপতনের নিদান।

প্রভু জগদ্বন্ধু কিন্তু সেই কাল হইতে এই কাল পর্য্যন্ত স্বপথে সমান অগ্রসর হইতেছেন।

যেখানে প্রশংসা সেইখানেই নিন্দা কিছু না কিছু হইয়াই থাকে। কোন কোন ব্যক্তির মুখে জগদ্বন্ধুর নিন্দাবাদও শুনা গিয়াছে। কিন্তু তিনি, এখন দেখিতেছি, স্বীয় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে নিন্দাস্তুতির অতীত স্থান অধিকার করিতে যাইতেছেন। যাঁহারা প্রভু জগদ্বন্ধুর বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা এক্ষণে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে এই মহাপুরুষের রহস্যময় চরিত্র সাধারণের সুদুর্ব্বোধ্য।

গত চতুর্দ্দশ বর্ষকাল ব্যাপিয়া তিনি ফরিদপুরে একটি নিভৃত স্থানে একখানি সুরক্ষিত গৃহে নিঃসঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন। এই গৃহে একটি মাত্র দ্বার, তাহাও দিবারাত্র রুদ্ধ, কেবল মধ্যাহ্ন সময়ে একবার মাত্র উন্মুক্ত হয়। ভক্তগণ সেই সুযোগে একখানি ভোজ্যপাত্র গৃহে প্রবিষ্ট করিয়া দেন; যখন পাত্রখানি বহিষ্কৃত হয়, তখন কোন দিন দেখা যায়, প্রভু তাহার সামান্য মাত্র অংশ, কোন দিন বা অধিকাংশই গ্রহণ করিয়াছেন, কোন দিন বা যেমন ভোজ্য ঠিক তেমনই আছে! সে গৃহে প্রবেশাধিকার কাহারও নাই। আজ চৌদ্দ বৎসর প্রভু জগদ্বন্ধুব মূর্ত্তি মানবচক্ষুর অগোচর। কে জানে প্রভু কোন্ ভাবে কি অসাধ্য সাধনে—কি অলৌকিক লীলারসে নিমগ্ন রহিয়াছেন!

পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিতাশিক্ষিত ভদ্রাভদ্র অনেক লোকে প্রভু জগদ্বন্ধুকে তাঁহাদেব পরিত্রাণকর্ত্তা প্রধান উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দশেব উপাস্য প্রভুকে আমরাও 'প্রভু' অভিধানে অভিহিত কবিলাম। কেহ উপহাস করেন করুন, তথাপি আমরা মহতের মর্য্যাদালঙ্ঘন ও তদ্ধেতু সম্প্রদায় বিশেষেব মর্ম্মাঘাত করিতে সাহসী নহি।

প্রভু জগদ্বন্ধুর বিরচিত বহুসংখ্যক সংগীত বহুস্থানে বহুলোক কর্ত্তৃক মৃদঙ্গ-করতালবাদ্য সহ গীত হইয়া থাকে। এই সংগীতগুলি বড়ই সুললিত সুমধুর ও পরিস্ফুট ভাবোদ্দীপক। বিশিষ্ট অনুভাবক ব্যতীত এরূপ পদাবলী রচনা অন্যের অসাধ্য।

বহুলোকে প্রভু জগদ্বন্ধুর এই বহুবর্ষব্যাপী মহারহস্যাবাস-ব্রতের মহোদযাপন দর্শনের নিমিত্ত সমুৎসুক; তদ্গতপ্রাণ ভক্তগণ ত তজ্জন্য একান্তই অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। এ রহস্য অবশ্যই বিস্ময়কর বটে। ধন্য প্রভু জগদ্বন্ধু!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গের নব্য ও প্রাচীন স্বাস্থ্য।

বাঙ্গালীর সমাজে ইদানীং স্বাস্থ্য উন্নতির নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টাচরিত্র চলিতেছে বটে, তৎফলে কোন কোন বাঙ্গালী যুবক অসীম বলশালিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া বঙ্গের সাধরণ স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা এখন যে মন্দ, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। মুশলমানরাজত্বের অবসান ও ইংরাজ-রাজত্বের সূচনা—সেই সঙ্কট সময়ে যখন ঠগীবর্গী প্রভৃতির উপদ্রবে দেশবাসিগণ বারমাস ব্যতিব্যস্ত, সেই সময়ে গৃহবাসী নির্বোধ বাঙ্গালীর দৈহিক শক্তিসামর্থ্যের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, আজ শিক্ষিত সুবোধ বঙ্গসন্তানগণের দেহে সে শক্তিসামর্থ্য আর নাই। বাঙ্গালীর ধারণাশক্তি, পরিপাকশক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা-শক্তি ইত্যাদি সকল শক্তিরই মাত্রা তখন যেরূপ এখন আর সেরূপ নাই। তখন অনেক বাঙ্গালী-দস্যু লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া ১০।১২ ক্রোশ দূরে গিয়া ডাকাতি করিয়া আবার রাত্রির মধ্যেই স্বস্থানে স্বীয় শয্যা অধিকার করিতে পারিত। আবার একাকী ঐরূপ দশবিশ জন দস্যুর মহড়া লইতে পারে, এরূপ ভদ্রগৃহস্থসন্তানও তখন অনেক ছিলেন। লাঠি সড়্‌কি টেঁটা তরোয়াব, তীরধনু, গুলিবাঁশ, রায়বাশ, বাঘবাঁশ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে বাঙ্গালী তখন সুদক্ষ। তখনকার বাঙ্গালী যুবকগণের ভোজনশক্তি ও পরিপাকশক্তিও যেমন, ক্ষুৎসহিষ্ণুতাও তেমনই ছিল। অম্ল, অজীর্ণতা, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ তখন সহস্রেকের মধ্যে এক জনেরও হইত কি না সন্দেহ। পারদ বা উপদংশ জনিত অশেষ উপসর্গ তখন বাঙ্গালীর শরীরে অল্পই অনুভূত হইত; ম্যালেরিয়ার নাম ত একেবারেই অজ্ঞাত! তখন বাঙ্গালী অসভ্য বর্ব্বর; কেন না, যে বাঙ্গালী আজ উকীল বারিষ্টার মুন্‌সেফ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন মনে করিতেছেন, সেই বাঙ্গালীর তদানীন্তন পিতামহ প্রপিতামহগণ মাঠে মাঠে গোরু চরাইতেন, কেহ বা স্বহস্তে হলচালন করিতেন, কদর্য্যাবরণে মাত্র লজ্জা নিবারণ করিতেন। আমাদের পিতামহী প্রপিতামহীগণ চরখায় কাট্‌না কাটিতেন, নারিকেলপত্র হইতে শতমুখীর শালাকানির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয়

করিতেন। পুরুষগণ এখনকার মত সকলেই চাকরী করিতেন না সত্য, স্ত্রীগণও বই কেতাব পশম রেশম লইয়া কাল কাটাইতেন না সত্য, কিন্তু তথাপি তৎকালীন স্ত্রীপুরুষগণ মুহূর্ত্তকালও আলস্যে অতিবাহিত করিতেন না। চাসআবাদ, গোপালন, গৃহাদিসংস্করণ দেবাতিথিসেবন ইত্যাদি কর্ম্মে তাঁহারা সকলেই সর্ব্বদা শশব্যস্ত। তাঁহারা সে সময়ে বারমাস যেরূপ স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতেন, আমরা এ সময়ে তাহার অণুমাত্রও অনুভব করিতে পারি না।

এ সময়ে আমরা ত্রিসন্ধ্যা চা কফি বা সভ্যমাত্রায় সুরাপান করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র কৃত্রিম স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া থাকি, সে সময়ে তাঁহারা অরোগিতার অকৃত্রিম স্ফূর্ত্তি অহোরাত্র পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেন। তখন রোগীর সংখ্যা স্বল্প থাকায় ব্যবসায়ী চিকিৎসকের সংখ্যাও অত্যল্প মাত্র ছিল; কিন্তু তাহা বলিয়া ঔষধের সংখ্যা আমাদের দেশে কোন দিনই কম নহে। আজ এই কলিকাতার এক একটি ঔষধালয়ে যত প্রকার ঔষধ আছে, তখন এই বাঙ্গালার এক এক খণ্ড ভূমিতে এক একটি ঝোড়ে জঙ্গলে ঔষধ সংখ্যা তদপেক্ষা কম ছিল না; এখনও তাহাই আছে, কিন্তু তখনকার গৃহস্থ গৃহিণীরা তাহার সন্ধান জানিতেন, এখনকার চিকিৎসকেরাও সে সন্ধান সকলে পান নাই। তখনকার প্রাচীনা গৃহিণীগণের এক একটি পুঁটুলী—এখনকার ডিস্‌পেন্‌সেরীর এক একটি আলমায়রার সমতুল্য।

সে যুগের বঙ্গে ব্যবসায়ী চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল বটে, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রতিভাসম্পন্ন চিকিৎসকের একেবারে অসদ্ভাব ছিল না। ইদানীং যেমন ক্রমশঃ বাঙ্গালার সে স্বাস্থ্যসুখ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, তেমনই বিচক্ষণ ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট এ দেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসার করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্‌যোগে চিকিৎসাবিদ্যালয় ও অনেক দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক বঙ্গসন্তান ইউরোপীয় শাস্ত্রমতে সুদক্ষ চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বকালের ডাক্তারি মতের বাঙ্গালী চিকিৎসকগণের মধ্যে ডাক্তার গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী ও ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্ব্বাগ্রগণ্য।

ক্রমে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালী সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু আবার স্থানে স্থানে বৈদ্যবংশে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের চর্চ্চাও যথেষ্ট-পরিমাণেই চলিতে লাগিল।

এই সময়ে ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে—যশোর জেলার অন্তর্গত আঠারখাদা গ্রামে

বৈদ্যবংশে এক অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের অদ্বিতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ও অসাধারণ পণ্ডিত—

স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ—

মহাশয়ের নাম এ দেশে চির-প্রসিদ্ধ। আমরা ইতঃপূর্ব্বে স্বনাম-প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার মধুসূদন কিন্নরের শিক্ষক সঙ্গীতবিশারদ স্বর্গীয় রাধামোহন বাউলের নামোল্লেখ করিয়াছি। শুনা যায় উক্ত আঠারখাদা গ্রামে কবিরাজ গঙ্গাধর ও রাধামোহন বাউল একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ঐ গ্রামে ঐ দিনে ব্রাহ্মণবংশে আর একটি মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁহার নাম মনোহর চক্রবর্ত্তী। উত্তরকালে গঙ্গাধর সংস্কৃত বিদ্যায়, রাধামোহন সঙ্গীতবিদ্যায় এবং মনোহর মল্লবিদ্যায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনগণের মুখে শুনা গিয়াছে, যশোর—নলডাঙ্গার রাজবাটীতে একদা একটি দানসাগর-শ্রাদ্ধের আয়োজন হয়। দানোৎসর্গের সময়ে সহসা দানের নিমিত্ত সংগৃহীত সুবৃহৎ মাতঙ্গটি প্রমত্ত ভাবে লৌহনিগড় ছিন্ন করিয়া দানক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। রক্ষিগণ আতঙ্কে পলায়ন করিল, পুরোহিত ও যজমান অবাক্ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন। উৎসর্গের সময় উপস্থিত, কিন্তু প্রাণ উৎসর্গ স্বীকার করিয়া কে তখন সে কালান্তকের সমীপবর্ত্তী হইবে! সেই সময়ে সভাতলে মনোহর সমুপস্থিত ছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজাবাহাদুরের অনুমতি লইয়া একাকী নিরস্ত্রভাবেই সেই দুরন্ত মত্তদন্তীর সম্মুখীন হইলেন। হস্তী মনোহরকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া আক্রমণোদ্যত হইল। মনোহর বীরদর্পে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—খবরদার! খাড়া রহ! পশুগণ স্বভাবতঃই শাসকের আকৃতি প্রকৃতি ও স্বরভঙ্গিতেই তাহার সামর্থ্য অনুমান করিতে পারে। মনোহরের নির্ভীকমূর্ত্তি দেখিয়া ও বীরোচিত বাগ্‌গর্জ্জন শুনিয়া গজরাজ ক্রোধ ও ত্রাসের সংমিলনসূচক কম্পান্বিতকায়ে একস্থানেই দণ্ডায়মান রহিল। মনোহর অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়া তাহার শুণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ কক্ষতলে চাপিয়া ধরিয়া অগ্রে অগ্রে আসিতে লাগিলেন, হস্তী উপযুক্ত শাসকের হস্তে পড়িয়া অনাপত্তিতে অনুসরণ পূর্ব্বক দানক্ষেত্রে উপস্থিত! তখন তাহাকে পুনর্ব্বার সুদৃঢ় নিগড়াবদ্ধ করিয়া উৎসর্গ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল।

আশানন্দ ঢেঁকীর ন্যায় এই মনোহর চক্রবর্ত্তীরও শারীরিক সামর্থ্যের উক্তরূপ অনেক অদ্‌ভুত উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়।

মনোহর, রাধামোহন ও গঙ্গাধর, এই তিন জনের মধ্যে কি গুণগৌরবে কি যশোগৌরবে, গঙ্গাধরই গরিষ্ঠ।

গঙ্গাধরের পিতার নাম কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায়। গঙ্গাধর বাল্যকালেই ব্যাকরণ, অভিধান, অলঙ্কার, সাহিত্য প্রভৃতির পাঠ সাঙ্গ করিয়া অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি প্রত্যহ দশ পৃষ্ঠা করিয়া পাঠ লইতেন, এবং উহা অভ্যাস করিয়া পুনর্ব্বার নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিতেন। ইহা ব্যতীত তাঁহাকে প্রত্যহ অধ্যাপকের নিয়োগক্রমে অন্যান্য ছাত্রগণের অধ্যাপনাকার্য্যও করিতে হইত। এই সময়ে গঙ্গাধর ব্যোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

পাঠ শেষ করিয়া তিনি প্রথমতঃ কলিকাতা রাজধানীতে আগমন করেন, কিন্তু তৎকালে কলিকাতায় ডাক্তারি চিকিৎসার সবিশেষ সমাদর ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অনাদর দেখিয়া প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে গিয়া সৈদাবাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধরের বয়স তখন ২১ বৎসর মাত্র। এই অল্পবয়সেই তিনি প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও অধ্যাপকগণের সহিত বাদানুবাদ পূর্ব্বক স্বীয় মত সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন এবং অনেক উৎকট রোগের শান্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশঃসৌরভে বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে তিনি অদ্বিতীয় চিকিৎসক ও অসামান্য অধ্যাপক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন।

তিনি বাল্যকালে মুগ্ধবোধের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত এক্ষণে, বোপদেব মুগ্ধবোধের যে অংশ শেষ করিয়া যান নাই, সেই অংশ শেষ করিয়া, সমগ্র মুগ্ধবোধের আর একখানি টীকা প্রণয়ন করিলেন। তাঁহার কৃত উভয় টীকাই তাঁহার অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচায়ক।

এই সময়ে তিনি "লোকালোকপুরুষীয়" ও "দুর্গবধ" নামক দুইখানি সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন।

চরকসংহিতার চক্রদত্তকৃত যে টীকা আছে, তাহা অসম্পূর্ণ; এজন্য সমস্ত চরকের বিষদ ব্যাখ্যা করিয়া মহাপণ্ডিত গঙ্গাধর "জল্পকল্পতরু" নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়া যান। এই টীকাই গঙ্গাধরের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা, দুইখানি সংস্কৃত পদ্যব্যাকরণ, "হর্ষোদয়" নামক চিত্রকাব্য, শ্রীমদ্ভাগবত-বিচার, "প্রাচ্যপ্রভা" নামক অলঙ্কার শাস্ত্র প্রভৃতি বহু সংস্কৃত

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গঙ্গাধর নিজ অগাধ পাণ্ডিত্যের সমুচিত সদ্‌ব্যবহার ও অসীম যশোলাভ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহের বিধি প্রচার করিয়া দেশব্যাপী মহা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, পণ্ডিতবর গঙ্গাধর সেই সময়ে "বিধবাবিবাহ-প্রতিষেধ," "বহুবিবাহ-রাহিত্য" প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থগুলিতেও তাঁহার গভীর গবেষণা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, নিজেও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে সেইরূপ সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। অন্যান্য সুনিয়ম ভিন্ন তাঁহার একটি বিশিষ্ট নিয়ম এই ছিল যে, তিনি যে গৃহে বসিয়া সর্ব্বদা লেখাপড়া করিতেন, সেই গৃহে সর্ব্বদাই একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিত। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ৮৭ বৎসর বয়সে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনাদ্বারা এবং স্বীয় নাড়ীপরীক্ষা দ্বারা পূর্ব্বেই মৃত্যুর দিন জানিতে পারিয়াছিলেন। উহার পূর্ব্বদিনে আত্মীয় বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন,—"আমি কল্য কেবল গঙ্গোদক পান করিয়া থাকিব, কারণ কল্য ৩৩ দণ্ডের পর আমার নিশ্চিতই মৃত্যু হইবে।" প্রকৃতপক্ষেও তাহাই হইল।

গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের ন্যায় সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ প্রতিভাশালী চিকিৎসক বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। সম্রাট্ আকবর সাহ সম্বন্ধে যেমন প্রবাদ আছে,—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা," সেইরূপ গঙ্গাধর সম্বন্ধেও পণ্ডিতসমাজে অদ্যাবধি প্রবাদ রহিয়াছে,—"গঙ্গাধরো বা গঙ্গাধরো বা", অর্থাৎ কবিরাজ গঙ্গাধর স্বয়ং গঙ্গাধর (মহাদেব) বলিলেই হয়।

গঙ্গাধর ২১ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যেরূপ অপ্রসার দেখিয়াছিলেন, এখন আর সেরূপ নাই। তাঁহার উপযুক্ত ছাত্র স্বর্গীয়—

মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন-

কবিরাজ মহাশয় এই কলিকাতা সহরে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় ও তৎসহ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া দেশীয় সমাজে তথা রাজপুরুষমণ্ডলে বিশিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন।

দ্বারকানাথ ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অনেকেই অশেষ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুধীসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও রাজবৈদ্য অভিরামকবীন্দ্র মহাশয় দ্বারকানাথের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ। "রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা স্বর্গীয় গোপালকর মহাশয় দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। কলিকাতা কুমারটুলী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন দ্বারকানাথের পিতামহের ছাত্র।

দ্বারকানাথ বাল্যকালে বিক্রমপুরের টোলে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া পণ্ডিতপ্রবর গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট দর্শন শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করেন। পাঠ সাঙ্গ করিয়া ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় ও অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই কি শাস্ত্র-অধ্যাপনা কি রোগ-চিকিৎসা উভয় বিষয়েই ইঁহার সুযশঃ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

১৯০১ খৃঃ অব্দে মিবারের যুবরাজ পীড়িত হইলে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কবিরাজ দ্বারকানাথ তথায় গমন করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার চিকিৎসার সফলতা দেখিয়া ও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৯০৬ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদান করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-সমাজে দ্বারকানাথই সর্ব্বপ্রথমে এই উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কবিরাজ বিজয়রত্নসেনও গবর্ণমেণ্টের নিকট এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক দ্বারকানাথ চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যূন ৫০০০ ছাত্রকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সকল ছাত্রের মধ্যে অনেকে কৃতবিদ্য হইয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চিকিৎসা ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

১৯০৯ খৃঃ অব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়, উদরী রোগাক্রান্ত হইয়া, কলিকাতা নগরীতেই দেহত্যাগ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন এম, এ, অনেক দিন হইতে সবিশেষ দক্ষতার সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইতেছেন।

কবিরাজ দ্বারকানাথ কেবল যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, গুরু গঙ্গাধরের ন্যায় শিষ্য দ্বারকানাথও ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ন্যায়

ও উপনিষদে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অনেক ছাত্রকেই অন্নদান পূর্ব্বক বিদ্যাদান করিতেন।

এখন কলিকাতা সহরে শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কবিরাজ প্রভৃতি সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ বহুদর্শী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন, দেশীয় বিদেশীয় বড় বড় ডাক্তারও অনেক আছেন, পল্লীগ্রামেও ডাক্তার কবিরাজের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, তথাপি বাঙ্গলা দেশের স্বাস্থ্য দিন দিন এতই মন্দীভূত যে, পল্লীগ্রামগুলি ত ক্রমশঃই শ্মশানশ্রী ধারণ করিতেছে। রোগযন্ত্রণায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া লোকসব গৃহদ্বার ভূসম্পত্তি সামাজিক প্রসার প্রতিপত্তি ও আত্মীয় স্বজনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া পল্লীবাস ছাড়িয়া কলিকাতা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। ফলতঃ বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া-পীড়িত পল্লীগুলি ক্রমশঃ উজাড় জঙ্গলময়, এবং স্বাস্থ্যকর সহরগুলিও ক্রমশঃ লোকাধিক্য হেতু অস্বাস্থ্যকর হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী জ্ঞান-বিজ্ঞান গরিমায় যতই বক্ষঃ স্ফীত করুন না কেন, প্লীহাযকৃৎ প্রভৃতিতে ক্রমশঃ তাঁহাদের উদর যে ততোধিক স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, তৎপ্রতি দৃক্‌পাত নাই। জ্ঞানগুরুগণ সহরে বসিয়া কলের জল-হাওয়া সেবন পূর্ব্বক ভাবিতেছেন, বাঙ্গলা স্বর্গধামে পরিণত, বাঙ্গালী আমরা বুঝি দেবতা হইয়া গেলাম! কিন্তু, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যিনি কোন বঙ্গপল্লীর সীমান্ত-প্রান্তরে গিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি আজ একবার তথায় গিয়া দেখুন, কি শোচনীয় দৃশ্য! শস্যক্ষেত্রগুলি আর সেরূপ সমুর্ব্বর নাই, জলাশয়গুলিতে সামান্য মাত্র জল, তাহাও পঙ্কিল পূতিগন্ধময়, প্রান্তরে প্রাচীনবৃক্ষ বলিতে একটিও নাই, নবীনবৃক্ষ অনেক হইয়াছে, বটে, কিন্তু তাহাদের ফলপুষ্প-সম্পৎ তাদৃশ কিছুই নাই। দেখিবেন, সেই মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, কৃষকের সংখ্যা কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প; যে গুলি আছে, তাহারা দেহধারী মানব কি কঙ্কালমূর্ত্তি পিশাচ-তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পূর্ব্বকালের কৃষকদল যেমন গান গাইতে গাইতে কত আনন্দোৎসাহে কতই স্ফূর্ত্তির সহিত স্বকার্য্যে নিরত থাকিত, এখনকার কৃষকগণ আর সেরূপ নাই; হল চালন করিতেছে সত্য, কিন্তু একান্তই প্রাণের দায়ে উদরান্নের দায়ে না করিলে নয়, তাই করিতেছে; কেহ হয়ত লাঙ্গল ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁপিতেছে, হাঁপাইতেছে, ঢক্ ঢক্ জল খাইতেছে, তাহার জ্বর আসিয়াছে! চাষের সম্বল গোধনগুলিরই বা কি দুর্দ্দশা! অস্বাস্থ্য এযুগে কেবল মানুষেরই নহে, পরীক্ষায় দেখা যায়, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা

তৃণগুল্ম সরিৎসরোবর, প্রায় সকলই অসুস্থ! তবে আর এ চরাচরব্যাপী করাল রোগের ঔষধ কোথায়! অগত্যা হতাশ প্রাণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে হইবে,—ইহা কালের ধর্ম্ম, "কালো হি বলবত্তরঃ!"

বঙ্গপল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখুন, সমতলভূমি স্বল্পই আছে, খানা গর্ত্ত ডোবা ইত্যাদির অভাব নাই। এই সকল খানা গর্ত্তের অধিকাংশই ইষ্টক বা মৃত্তিকাভিত্তি নির্ম্মাণোপলক্ষ্যে নির্ম্মিত। পল্লীমধ্যে নব নব ইষ্টকালয় অনেক হইয়াছে, কিন্তু লোকালয় অতি অল্প; কারণ, অধিকাংশ গৃহেই তালাবদ্ধ! গৃহস্থগণ অস্বাস্থ্যদায়ে বা উদরদায়ে বিদেশবাসী। যে গৃহস্থপরিবারে কেহই চাকরী করেন না অথবা যাঁহাদের স্বাস্থ্যলাভার্থ বিদেশগমনের সামর্থ্য নাই, সেইরূপ দু'চারি ঘর নিঃসম্বল গৃহস্থই গ্রামের জীবনরক্ষা করিতেছেন। প্রান্ত-সীমায় কৃষককুলের বসতি, তাহাদের যেমনই অস্বাস্থ্য তেমনই অন্নাভাব। ম্যালেরিয়া প্রভৃতির ন্যায়, শূন্যোদরে দুরূহ শ্রমস্বীকারও ইহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের একটি প্রধান কারণ।

বর্ত্তমান যুগে বঙ্গের বহুতর পল্লীরই এইরূপ দুর্দ্দশা। সহরগুলিতে বহুসংখ্যক লোকের বাস, সুতরাং সুস্থ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া সহরের স্বাস্থ্য সন্তোষদায়ক বলা যায় না। বাঙ্গলার মধ্যে রাজধানী কলিকাতা সহরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের বসতি, স্বাস্থ্য এস্থানের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। এখানে স্বাস্থ্যরক্ষার্থ অর্থব্যয়ও অনেক অধিক; হইলে কি হয়, আমরা প্রাচীন বঙ্গের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ শুনিয়াছি, বাল্যকালেও যেরূপ দেখিয়াছি, সে স্বাস্থ্যে আর কলিকাতার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যে প্রভেদ অনেক। পরিষ্কৃত কাচপাত্রে আর অমার্জ্জিত কাংস্যপাত্রে যত প্রভেদ, বর্ত্তমান বঙ্গের সহরীয় স্বাস্থ্যে আর প্রাচীন বঙ্গের সাধারণ স্বাস্থ্যে ততই প্রভেদ। একটি স্বভাবতঃই ভঙ্গপ্রবণ, অপরটি স্বচ্ছন্দে শতঘাতসহিষ্ণু। একটি সমুজ্জ্বল হইলেও মৃৎ-সার মাত্র, অপরটি অনুজ্জ্বল হইলেও তৈজস।

দামোদরের বাঁধ, স্রোতস্বতী নদীগুলিতে সেতুবন্ধন দ্বারা স্রোতোনিরোধ, রেলপথ নির্ম্মাণ হেতু সর্ব্বত্র জলপ্রসারের প্রতিবন্ধ, বাষ্পপোত ও অন্যান্য বাষ্পযন্ত্র চালনার্থ অহোরাত্র পাথুরিয়া কয়লার ধূমনিঃসরণ, এই সকলই বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান হেতু বলিয়া কেহ কেহ অবধারণ করেন। এ মন্তব্য সমীচীন কি না, তাহা সবিশেষ বিচার্য্য বটে। সমগ্র দেশের পক্ষে যেরূপই হউক, সহরে পাথুরিয়া কয়লার ধূম যে বড়ই অপকারক ও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে,

একথা অস্বীকার্য্য নহে। আবার, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে যখন কোন মিল্ (mill) প্রভৃতি যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন সেখানকার বৃক্ষগুলি যেরূপ সতেজ সুফলপ্রদ ছিল, মিল্ বসিবার পর প্রত্যহ পাথুরিয়া কয়লার ধূম লাগিয়া ক্রমশঃ সেই সকল বৃক্ষ এখন হতশ্রীক ও ফলহীন হইয়াছে। মানবশরীর ও সমগ্র বায়ুমণ্ডল পাথুরিয়া কয়লার ধূমে দূষিত হয় কি না, তাহা বৈজ্ঞানিকগণের বিবেচ্য।

আর একটি বিষয় সবিশেষ বিচার্য্য এই যে, ভূতলোত্থিত ধূমরাশিতে মেঘোৎপত্তির কোনরূপ সহায়তা হয় কি না। যদি তাহা হয়, তবে ইদানীং প্রচুরপরিমাণ পাথুরিয়া কয়লার ধূমে তদ্বিষয়ের বিশিষ্ট সাহায্যই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই, এবং বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যে এ ভারতে রাশি রাশি যজ্ঞধূমেও তদ্বিষয়ের বিশিষ্ট সহায়তা হইত তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সকল হব্যাহুত হোমাগ্নি-সমুত্থিত ধূমজালের সারাংশ-সংমিশ্রিত মেঘমালা ও এই সকল পাথুরিয়া কয়লার ধূমসার-সংমিশ্রিত মেঘমালা, এ উভয়ই কি সমধর্ম্মাক্রান্ত? উভয়বিধ মেঘোৎপন্ন বৃষ্টিজলই কি পৃথিবীর পক্ষে সমকল্যাণপ্রদ? ধূমে ও মেঘে যদি কোন সম্বন্ধই না থাকে, তবে "যজ্ঞাদ্‌ভবতি পর্য্যন্যঃ পর্য্যন্যাদন্নসম্ভবঃ" এই শাস্ত্রীয় বচনটির যৌক্তিকতা কি একবারেই অস্বীকার্য্য?

বাষ্পীয় শকটগতিতে ভূতলের চতুষ্পার্শ্বে ও অধোভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত একটি কম্পন উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ইদানীং সভ্যজগৎ রেলরোড্-জালে যেরূপ সমাচ্ছন্ন, এবং ঐ সকল পথে শকটাবলী যেরূপ অহোরাত্র অবিরাম ধাবিত, তাহাতে সমগ্র ধরাতল যে অবিরল অহোরাত্র অধীর কম্পান্বিত, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। এ কম্পন যে একবারেই নিষ্ফল, ইহাতে যে শুভাশুভ কোন ফলই সম্ভবে না, এ কথা কি যুক্তিসঙ্গত? এ কম্পনে ভূগর্ভে বহুদূর পর্য্যন্ত যে বসুমতীর অঙ্গগ্রন্থি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে, এ কথা কি একান্তই পরিহাসযোগ্য? ইহাতে যে পৃথিবীর উর্ব্বরতার বা জীবপোষণশক্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না, এবং ভূগর্ভাঙ্গ গ্রন্থিচ্যুত হওয়ায় প্রলয়ের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে না, একথা বৈজ্ঞানিকগণ কি অবাধে স্বীকার করেন?

যাঁহারা পূর্ব্বজাত কুসংস্কারের বশীভূত নহেন, যাঁহারা কোন বিষয় শুনিবা মাত্র হাসিয়া উড়াইয়া দেন না, সেই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে আমরা এ বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। আমরা সংস্কারের দাস, সত্য সংস্কার-বিরুদ্ধ হইলে তাহার উপলব্ধি করিতেও সহজে ইচ্ছুক নহি; উপলব্ধি করিলেও

তদনুযায়ী আচরণ একেবারেই আমাদের ক্ষমতাতীত। যাঁহারা প্রতিকুসুমোপরত মধু-লোলুপ মধুপের ন্যায় প্রতিবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে সমুৎসুক, যাঁহারা সত্যের অনুসরণে সনাতন সংস্কার, শতসহস্র স্বার্থ, এমন কি স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত নহেন, সেই যথার্থ বীরধর্ম্মা ইংরাজগণকেই আমরা এ সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আমরা বুঝিনা, যাঁহাদের বুঝিবার বুঝাইবার শক্তি আছে, তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন, বুঝাইয়া দিন।

যদি রেলরোড্‌জালে জলাগমনির্গম প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় স্বাস্থ্য ও শস্যোৎপত্তির যথার্থই বিঘ্ন ঘটে, যদি পাথুরিয়া কয়লার ধূম যথার্থই অশুভদায়ক হয়, তবে স্তম্ভোপরি রেলরোড্‌ নির্ম্মাণে এবং বৈদ্যুতবলে বাষ্পযন্ত্রাদির পরিচালনে বা অন্য কোনরূপ সমীচীন কৌশল উদ্‌ভাবনে বৈজ্ঞানিকগণ নিরস্ত থাকেন কেন? ইহাতে কেবল বঙ্গের বা ভারতের নহে, সমগ্র সভ্য জগতের শুভাশুভই সম্পৃক্ত।

অনেকে বলেন, ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে হিমপ্রধান ইংলণ্ডাদি দেশ-প্রচলিত আচার ব্যবহার একান্তই স্বাস্থ্য-বিরোধী এবং ঐরূপ আচার ব্যবহারই বর্ত্তমানে বঙ্গবাসিগণের তথা সমগ্র ভারতবাসিগণের স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম হেতু। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, ঐরূপ আচরণহেতু পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজেরই স্বাস্থ্যভঙ্গ সম্ভবপর, অশিক্ষিত শ্রমজীবিসমাজের তথা স্ত্রীসমাজের স্বাস্থ্যভঙ্গ সম্বন্ধে উক্তরূপ হেতুবাদ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। শিক্ষিতগণ অর্থাৎ বিচারক, উকিল, আফিসার, ডাক্তার, শিক্ষক ও ছাত্রগণ, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য।

ইংলণ্ডে পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে মানবশরীর সাধারণতঃ শীতে জড়ীভূত থাকে, একারণ মধ্যাহ্নকালই—অর্থাৎ বেলা ১০টা হইতে ৪টা বা ৫টা পর্য্যন্ত—মানুষের প্রধান কর্ম্মকাল। ঐ সময়েও ঐ দেশবাসিগণকে শীতবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সমাবৃত করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হয়। কিন্তু তদনুকরণে ভারতের মীনমেষীয় মারাত্মক মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-তাপে বিচারক আপাদমস্তক সমস্ত শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া গলদ্‌-ঘর্ম্মে ব্যাবহারিক মহাসমস্যার সমাধান করিতেছেন, মসীজীবিগণ ঐ রূপ ভাবে অবিরাম লেখনীচালন করিতেছেন, অধ্যাপক উচ্চৈঃস্বরে শাস্ত্রসমস্যার জাটিল্য ভেদ করিতেছেন, ছাত্রগণ অণ্ডোদ্‌ভেদোত্থিত হংসশাবকের ন্যায় বস্ত্রাবরণের মধ্য হইতে মুখগুলি মাত্র বাহির করিয়া শিক্ষকের শিক্ষাবাণী শুনিতেছে,—সকলেই গ্রীষ্মতাপে প্রপীড়িত, খস্‌খসে মুহুর্মুহুঃ জলসেক হইতেছে, পাখার বিরাম নাই, তথাপি আরাম নাই! সকলেই অস্থির ওষ্ঠাগতপ্রাণ, প্রতিঘণ্টায় পাঁচ-

বার করিয়া জলপান করিতেছেন;—এ অভিনয় অভিজ্ঞতার চরম পরিচয়,—সভ্যতার চূড়ান্ত প্রহসন, স্বাস্থ্যের সুন্দর ব্যবস্থা!

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ এই চারি মাস ভিন্ন বৎসরের অন্য আট মাস কাল ঐরূপ আচরণ এদেশে সবিশেষ অনিষ্টকর এবং অম্ল বহুমূত্র হৃদ্‌রোগ শিরোরোগ সংন্যাস সর্দ্দিগর্ম্মি প্রভৃতি রোগোৎপত্তির অন্যতম হেতু হইতে পারে কি না, এ বিষয় স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিতমণ্ডলীর সবিশেষ বিচারযোগ্য নহে কি? এদেশে এসকল আচরণ যদি যথার্থই মারাত্মক, আজ না হয় ইহাগত ইংরাজগণ পূর্ব্বপুরুষীয় ধাতুগুণে উহার কুফল তাদৃশ অনুভব করিতেছেন না, কিন্তু কালক্রমে যে এ অত্যাচার তাঁহাদেরও নিকট স্বাস্থ্যনাশক বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, এই সকল পাশ্চাত্য আচারব্যবহার প্রাচ্যগণের স্বাস্থ্যভঙ্গের সহায়ক হেতুমাত্র ভিন্ন আদি নিদান কখনই নহে। পল্লীবাসিনী স্ত্রীগণ বা কৃষকগণ পাশ্চাত্য প্রথার কোন ধারই ধারেন না, কিন্তু তাঁহাদেরও স্বাস্থ্য যখন দিন দিন দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন জানিতে হইবে ইহার মূলে অন্য কোন বলবৎ বিশিষ্ট কারণ আছে।

বঙ্গে তথা সমগ্র ভারতে আজ কাল উপদংশবিষ ও পারদবিষের পরিণাম-ফলে অধিকাংশ লোকের স্বাস্থ্যবিকার ঘটিয়াছে, এবং কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, দৃষ্টিদোষ, অকালবার্দ্ধক্য প্রভৃতিতে জনসমাজ উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। আমরা স্বখাত-সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি, পাশ্চাত্যের দোষ দিলে কি হইবে?

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই এবং বঙ্গদেশেও স্বাস্থ্য ও শস্যোৎপত্তির উন্নতি-সাধন কল্পে বিচক্ষণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিতেছেন সত্য, কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ কোন চেষ্টাই যথেষ্ট ফলবতী হইতেছে না। বঙ্গের স্বাস্থ্যসংস্কার না হইলে, বাঙ্গালীর বিদ্যাবুদ্ধি সকলই বিফল।

বঙ্গের বর্ত্তমান জলকষ্ট অর্থাভাব ও ঋণদায়।

গঙ্গা যমুনা জলাঙ্গী পদ্মা গড়ুই ইচ্ছামতী মধুমতী প্রভৃতি প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বিনীগণের প্রসাদে আমাদের বঙ্গমাতা প্রাচীন কাল হইতেই সুজলা সুফলা নানাশস্যশ্যামলা। এ আমাদের সোণার বাঙ্গলা বটে, কিন্তু কই, চিরদিন ত সমান গেল না! আজ বঙ্গে জলকষ্ট অন্নকষ্টের কথা পুনঃ পুনঃই শুনিতে পাই! আমাদের জীবন—বঙ্গের সে অন্নজল কে হরণ করিল?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা অনেকে হয় ত মনে মনে "যত কিছু পাপং, নরোত্তমে চাপং" করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাই, সর্ব্বাপরাধ সর্ব্বংসহ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শিরে আরোপ করিয়া নিজেরা বঙ্গমাতার নিরীহ নিরপরাধ শান্ত শিষ্ট সুসন্তান সাজিতে চাই। অনাবিষ্ট বালক প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া যেমন নিজ বিদ্যাহীনতা ও মূর্খত্বের নিমিত্ত মাত্র মাতাপিতার প্রতি দোষারোপ করিয়া সুপুত্রত্বের পরিচয় প্রদান করে, আমরাও সেই রূপ সর্ব্ববিষয়েই মাত্র গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিয়া আপাততঃ অব্যাহতি পাইতে চাই। ইহাতে আর্ত্তির বৃদ্ধি ভিন্ন উপশমপ্রত্যাশা অতি অল্প।

অবশ্য, যে কারণেই হউক, এক্ষণে নদী সকল পূর্ব্বাপেক্ষা জলশূন্য, বৃক্ষাদি ফলশূন্য এবং ভূমি শস্যশূন্য হইয়াছে, একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু তদ্ধেতু আমরা আজ যে পরিমাণে ক্লেশভাগী হইয়াছি, চেষ্টা করিলে বোধ হয় সে ক্লেশের অনেক লাঘব হইতে পারিত, এবং এখনও হইতে পারে।

বঙ্গের প্রতিগ্রামের গৃহস্থগণ বার্ষিক বারইয়ারি, বার মাসের বিলাসিতা ও মোকদ্দমা মামলার ব্যয় কমাইলে বোধ করি চারি পাঁচ বৎসর অন্তরই সকলে মিলিয়া এক একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠার ব্যয় সঙ্কুলান অনায়াসে করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সংযম সুবিবেক বা সে ঐকমত্য আমাদের আদৌ নাই। যখন বাঙ্গালীর ধর্ম্মশাস্ত্রে আস্থা ছিল, জলাশয়প্রতিষ্ঠা অশ্বমেধযজ্ঞতুল্য পরলোকে মহাফলপ্রদ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তখন প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহস্থ-কর্ত্তা বা কর্ত্রী খাইয়া না খাইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে জলহীন স্থানে এক একটি জলাশয়প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেন।

এক্ষণে আমরা শিক্ষালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, শাস্ত্রের সেই ফলশ্রুতি—অশ্বমেধযজ্ঞ বা পরকালে সুফল—সে সকল কথার যোল আনাই মিথ্যা, আসল কথা, যাহাতে দেশে জলকষ্ট উপস্থিত না হয়, উহা তাহারই কৌশল মাত্র,—ইহকালেরই সুখশান্তির ব্যবস্থা; মূর্খলোককে প্রলোভিত করিবার নিমিত্তই মাত্র শাস্ত্রে পরকালের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। এখন আমরা ত আর পিতৃপিতামহগণের ন্যায় মূর্খ নই; কাজেই ও সকল কথা মানিব কেন?

দুঃখের বিষয়, পরকালের কথায় আমরা পণ্ডিত সাজিয়া বসিয়াছি সত্য, কিন্তু কই, ইহকালের শান্তিসুখ ব্যবস্থাতেও ত আমাদের দৃষ্টি নাই, উদ্যোগ নাই। ও কূল ছাড়িয়াছি, এ কূলও ধরিতে পারি নাই, দুকূল হারাইয়া আমরা এখন অকূলে পড়িয়া মারা যাইতেছি।

জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি সদনুষ্ঠানবিষয়ে আমাদের অর্থাভাবই প্রধান বাধা, একথা সত্য, কিন্তু এরূপ দেশব্যাপী অর্থাভাবের কারণ কি একবারেই দুর্ব্বোধ্য না অপ্রতিকার্য্য ? সত্য, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রাদি দ্রব্যজাত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মহার্ঘ হইয়াছে, কিন্তু তদনুপাতে আমাদের উপার্জ্জন বা শ্রমমূল্যও ত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে যে সংসারের বাৎসরিক ভোজ্য নিজ আবাদের জমি হইতে সংগৃহীত হইত, এবং পাঁচ জনের মধ্যে এক জন মাত্র পুরুষ চাকরী অথবা ব্যবসায় অবলম্বনে প্রতিবৎসর তিন শত টাকা মাত্র সংসার-খরচ দিতেন, সে সংসারে পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সচ্ছন্দে সম্পন্ন হইয়া যথাসম্ভব দেবসেবা, অতিথিসেবা, গোসেবা, শ্রাদ্ধাদি পিতৃসেবা, লৌকিকতা, সামাজিকতা প্রভৃতি সকলই চলিয়াছে, এবং কর্ত্তা বা গৃহিণীর মরণান্তে যৎকিঞ্চিৎ স্থাপ্যধনও পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে সংসারে আর নিজ আবাদি জমি নাই, থাকিলেও তাহার উৎপন্ন শস্যে সংবৎসরের অন্নসংস্থান হয় না সত্য, কিন্তু পূর্ব্বে যে সংসারে এক জন উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ বৎসরে ৩০০৲ তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন, এক্ষণে সে সংসারে অন্যূন তিন জন পুরুষ, প্রত্যেকে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা করিয়া, সাকল্যে প্রতিবর্ষে ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন; উপার্জ্জকগণের এবং তাঁহাদের স্ব স্ব পত্নীপুত্রগণের গ্রাসাচ্ছাদন পূর্ব্বাপেক্ষা বিলাসিতার সহিতই চলিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবাতিথি বা পিতৃপুরুষাদির প্রত্যাশা আর সেরূপ নাই। সে সোণার সংসার ছার-খার হইয়া গিয়াছে। যে যাহার পত্নী পুত্রাদি লইয়া কর্ম্মস্থানে অস্থায়ী গৃহাবাস পত্তন করিয়াছেন। দুই একটি নিরুপায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা মাত্র উপার্জ্জকগণের কৃপোপ-জীবী হইয়া বাড়ীতে পড়িয়া রহিয়াছেন। সে বাড়ী হয় ত জীর্ণ ও জঙ্গলময় হইয়া ক্রমশঃ বাসের অযোগ্য হইয়া অসিতেছে। অস্থায়ী বাস বলিয়া কর্ম্মস্থানে কেহ কৌলিক সংসারধর্ম্ম-রীতি প্রতিপালন করেন না, বাড়ীতেই বা সে সব আর কে করিবে? সুতরাং এ যুগের মত সে সকল পাঠ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে বিলাসিতার মাত্রা প্রবল বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং অতিমাত্র বিলাসি-তাচরণ ক্রমশঃ কর্ত্তব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার শাসনে আমরা সদাই ব্যতিব্যস্ত, সদাই অর্থাভাবগ্রস্ত। যাঁহারা পৈতৃক পল্লীভবনেই বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও বিলাসিতা-রাক্ষসী আক্রমণ করিতে ক্রটী করে নাই। তদ্‌ভিন্ন, ম্যালেরিয়ার ন্যায় মামলামোকদ্দমাও তাঁহাদের একটি বিষম রোগ রূপে পরিণত হইয়াছে। অনেক গৃহস্থ মামলামোকদ্দমা-

রোগে উৎসন্ন হইতেছেন। তদুপরি কি পল্লীবাসী কি সহরবাসী, সকল গৃহস্থের সংসারেই অস্বাস্থ্য হেতু চিকিৎসা ও পথ্যব্যয়ও অনেক বাড়িয়াছে। এই সকল কারণে বর্ত্তমান বঙ্গে কি ধনী কি নির্ধন, অনুপাতানুসারে প্রায় সকলেরই সমান অর্থাভাব। জলাশয়প্রতিষ্ঠাদি সদনুষ্ঠান আর কে করিবে?

উক্তরূপ বিলাসিতাজনিত অর্থাভাববশতঃ ক্রমশঃ দেশে ঋণপাপ প্রবেশ করিয়াছে। দেশের অধিকাংশ গৃহস্থই এখন ঋণদায়গ্রস্ত। পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই, বিচিত্র প্রাসাদমালা-পরিশোভিত কলিকাতা নগরীর অট্টালিকাগুলিও অনেকই ঋণের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঋণ বঙ্গবাসীর অঙ্গাভরণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই ঋণরোগে পল্লীগ্রামের কৃষককুল উৎসাদিত হইতে বসিয়াছে। তাহাদের দুরবস্থা দেখিলে প্রকৃতই চক্ষে জল আসে। গৃহের চালে খড় নাই, গৃহিণীর পরিধানে লজ্জারক্ষোপযুক্ত বস্ত্র নাই, উদরে শ্রমশক্তিপ্রদ অন্ন নাই, মস্তকে তৈল নাই, রোগে ঔষধ নাই, গোধনের আহার্য্য নাই, এইরূপ অবস্থাতেই সংবৎসরকাল প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কৃষক সাধনের ধন ধান্যগুলি যেমন গৃহে আনয়ন করিল, অমনি প্রথমতঃ জমিদারের তহশীলদার আসিয়া খাজনার তাগাদা করিলেন, গরিব প্রজা তৎক্ষণাৎ গৃহাগত ধান্যের এক চতুর্থাংশ বিক্রয় করিয়া মনিবের বকেয়া শোধ করিল, হাতে পায়ে ধরিয়া হালখাজনা বাকি রাখিয়া দিল। তৎপরে আসিলেন গ্রাম্য মহাজন। কৃষকের পিতা একবার তাঁহার নিকট হইতে ২০৲ বিশটাকা কর্জ্জ লইয়া একটি গোধন কিনিয়াছিলেন; মহাজন মহাশয় সুদের অন্দরে মাত্র ৬০৲ ষাটটি টাকা পাইয়াছিলেন, অবশিষ্ট বেবাক টাকা বাকি রাখিয়া বিশ্বাসঘাতক বদমায়েস্ বৃদ্ধ কৃষক মহাজনের ভরা ডুবাইয়া মরিয়াগিয়াছে, দয়াময় মহাজন মহাশয় নিজ মাহাত্ম্যগুণে অবশিষ্ট টাকার বাবদ,—করেন কি,—কৃষকপুত্রকে বজায় রাখিবার জন্য নিজেই ক্ষতিস্বীকার করিয়া অনেক টাকা ছাড়িয়া দিয়া মাত্র আর ৬০৲ ষাটটি টাকার একখানি কিস্তিবন্দী লিখাইয়া লইয়াছেন। আজ কৃষকের গৃহে ধান্য আসিয়াছে শুনিয়া তিনি বার্ষিক কিস্তির টাকার জন্য তাগাদা করিতে আসিয়াছেন। কৃষক বেচারা পিতৃঋণ পরিশোধার্থে পুনরায় কিয়দংশ ধান্য বিক্রয় করিয়া কিস্তির টাকা বুঝিয়া দিল।

তৎপরদিন আসিলেন ধান্যের মহাজন। গত বৎসর অজন্মা হেতু কৃষক তাঁহার নিকট হইতে ধান কর্জ্জ করিয়া খাইয়াছিল, এবৎসর সুদে আসলে তাহাকে

দেড়া দিতে হইবে। মহাজন মহাশয় গরিবের মা-বাপ, তিনি অবশিষ্ট ধান্যগুলি মাপিয়া লইয়া গেলেন ; যাইবার সময়ে অতি মিষ্ট কথায় কহিলেন,—"দেখ করিম্ ভাই, তোমাকে যে আমি কি নজরে দেখেছি, তা' মাথার উপর যিনি তিনিই জানেন। দোহাই ধর্ম্মের, এই বন্ধনতলায় দাঁড়িয়ে বল্‌চি, তোরে আমি মা'র পেটের ভাইয়ের মত দেখি। আমার গোলায় ধান থাক্‌তে তোর ছেলে পিলে উপোস্ কর্‌বে না। যেদিন ঘরে না থাক্‌বে, গোলায় গিয়ে ধান মেপে এন, এ ত তোমার আপন ঘরের কথা। এবার যা' বাকি থাক্‌ল, আস্‌চে বারে সব এক সঙ্গে দিও ; না পার ফিরে বৎসরে দিও ; তোমার সঙ্গে ত আর আমার ভিন্ন ভাব নাই। দেখ করিম ভাই, কাল্ একবার আমার একটু কাজ করে দিতে হবে ; বেশী কিছু নয়, সকালে দু'বাপ নেটা একবার যেও, আবার বাড়ীতে এসে খাওয়া দাওয়া করে হুঁকাটা নিয়ে তামাক খেতে খেতে বিকালে একপাক যেও, তাহ'লেই হয়ে যাবে।"

করিম্ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল,—"মেজকত্তা, আজ ধানের বস্তা টেনে টেনে আমার শরীলটে বড় জরাবোধ হয়েছে, কাল্ কাজ কর্‌তে পার্‌ব না, দু'দিন পরে গিয়ে যা'হয় করে দিয়ে আস্‌ব।"

করিমের স্ত্রী দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, মেজকর্ত্তার মন-ভুলান মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়া সরলা সাগ্রহে কহিলেন,—"ওমা সে কি ! মেজকত্তা তোমারে এত ভাল বাসে, তার কথা তুমি ঠেলো না। কাল আছিম্‌কে সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে মেজকত্তার ব্যাগারটুকু দিয়ে এস। আহা, মেজকত্তার গুণের ধার আর শোধ দিতে পার্‌বো না। যাও মেজকত্তা, ওরা বোঝে না ; আমি কাল্ পাঠিয়ে দেব।"

মেজকর্ত্তা।—তাইত বৌ, করিম্ ভাই আমার বুঝেও অবুঝ, তাইতে ত আমার সঙ্গে বনে না।

বৌ।—যাও মেজকত্তা, তুমি মনে কিছু কর' না, আমি কাল্ পাঠিয়ে দেব। (গৃহমধ্য হইতে একটি লাউ আনিয়া) ধর, এই আমার গাছের প্রথম লাউটা, মেজকত্তা, তুমি খেও।

মহাজন মহাশয়ের ধানের গাড়ী ইতঃপূর্ব্বেই করিমের বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছে, এক্ষণে স্বয়ং লাউটি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"বৌ, ঐ জন্যেই ত তোদের জন্য মরি ; তা, ঐ যে গোয়ালের পেছনে বড় বড় মানকচু হয়েছে, ওর গোটা দুই কচু আমাকে খাওয়া'স্।"

এতাবৎ কহিয়া মেজকর্ত্তা চলিয়া গেলেন। করিমের ঘরে ধান্য বলিতে আর একটিও রহিল না। পরদিন মহাজনের বাড়ীতে পিতাপুত্রে বিনা মজুরিতে খাটিতে হইবে, কিন্তু খাইবেন কি তাহার সংস্থান নাই। একবার ভাবিলেন, মেজকর্ত্তার বাটী হইতে কল্যাই কিছু ধান কর্জ্জ করিয়া আনিবেন, কিন্তু সহসা স্মরণ হইল, কাল্ ত "লক্ষ্মীবার," মহাজন গোলায় হাত দিবেন না।

করিম বৎসরের শ্রমফল গৃহে আনিয়া এখন শূন্যগৃহে বসিয়া অবাক্ হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে মুদ্গর হস্তে যমদূত আসিয়া উপস্থিত,—সে কাবুলি মহাজন! অভাগা করিম গত বর্ষে শ্রাবণ মাসে একদা অজস্র ধারার দিনে সপরিবারে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া সায়ংকালে সহসা সেই কাবুলিকে উপস্থিত পাইয়া প্রতি টাকায় ৵০ দুই আনা হার মাসিক সুদে দুইটি টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল, ধান হইলে পরিশোধ দিবার কথা ছিল। সেই ধান আজ হইয়াছে, কাবুলীও আসিয়াছে, করিম পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিল।

কাবুলী প্রথমে টাকা চাহিল, না দিতে পারায় করিম্কে অশ্লীলবাক্যে ভৎর্সনা করিল, অবশেষে একবার লাঠি লইয়া মারিতে উদ্যত হয়, আর বার হালের গরু ধরিয়া টানাটানি করে! উপায়হীন অভাগা কৃষক এখন হইতে প্রতিটাকায় ।০ চারি আনা সুদ দিবে স্বীকার পূর্ব্বক কিছুদিনের অবকাশ লইয়া আপাততঃ অব্যাহতি পাইল।

হতভাগ্য কৃষক-পরিবারে ধান্যসংগ্রহের শুভদিনেই উপবাস ঘটিল। অতঃপর তৃতীয় দিবসে জমিদার-কাছারীর পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত! কৃষক তাঁহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা কবিল। পেয়াদাসাহেব কহিলেন, আগে আমার রোজগণ্ডা বুঝিয়া দাও, পরে কাছারীতে চল। নায়েব মহাশয় তলব করিয়াছেন।

অনেক স্তুতিমিনতিতে প্রসন্ন হইয়া পেয়াদাসাহেব এক টাকাব পরিবর্ত্তে ॥০ আট আনা রোজ লইতে সম্মত হইলেন। করিম উপায়ান্তর অভাবে দুইটি মুরগী বিক্রয় করিয়া ঐ আট আনা দিয়া পেয়াদার সহিত কাছারীতে হাজির হইল।

নায়েব মহাশয় কহিলেন,—এস করিম, তোমরা সরকারি প্রজা, আজ তোমাদের বড় সৌভাগ্য! প্রজা আর পুত্র সমান। তোমাকে উপযুক্ত পুত্র জ্ঞানেই আজ তোমার জমিদার তোমার নিকট তাঁহার একটি সাধের দ্রব্য চাহিয়াছেন।

করিম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল,—আজ্ঞে, আমি তাঁকে দিতে পারি, এমন কি জিনিষ আমার আছে?

নায়েব।—জিনিষ বড় বেশী কিছু নয়। দুইটা ছাপাখানার কল, দু'টা বন্দুক, একটা নূতন রকমের ঘড়ী আর ৩ খানা হাওয়াগাড়ী। মনে কর, আজ যদি তোমার বুড়া বাপ বেঁচে থাকতেন, আর তোমার কাছে যদি কোন একটা জিনিষ চাইতেন, তুমি কায়ক্লেশে অবশ্যই তা' আহ্লাদপূর্ব্বকই দিতে।

করিম অস্পন্দভাবে হাঁ করিয়া এক দৃষ্টিতে নায়েব মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নায়েব কহিলেন, একা তুমি কি আর বিশ হাজার টাকা দেবে? জমিদারীর সব প্রজাকে হারাহারি স্বরাত্ দিতে হ'বে। তুমি ৩২৲ টাকার জমা রাখ, তোমাকে বত্রিশ আনা দুই টাকা দিতে হ'বে।

করিম ফোঁস্ করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, হাঁ বুঁজিল, চক্ষে পলখ্ পড়িল। সে শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—আজ্ঞে, তা' দেব। তিনি আমাদের মা-বাপ, চেয়েছেন যখন তখন অবশ্যই দিতে হ'বে।

নায়েব।—হাঁ; বুঝেছ ত? দিতেই হ'বে, তা' ইচ্ছায়ই দেও, আর যে ভাবেই দেও। দিলেই মঙ্গল।

করিম।—আজ্ঞে, সেলাম্! যাই এখন চেষ্টা দেখি গিয়ে।

নায়েব।—যাবে কোথা? দুটী টাকা দিয়া যাও। (হাসিয়া) করিম, একি তামাসা ভাব্‌ছ?

করিম।—হুজুর আমি ত সঙ্গে আনি নাই।

নায়েব।—মনিবের সেরূপ হুকুম নাই, টাকা দিয়া উঠিয়া যাও। জোব্বর খাঁ, টাকা আদায় করিয়া লও।

পেয়াদা সাহেব জোব্বর খাঁ করিমের হাত ধরিয়া অন্যদিকে উঠাইয়া লইয়া গেল, এবং ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—নায়েব মহাশয়, আপনার নজর একটাকা দিতে চাইছে, ছেড়ে দিলে বাড়ী থেকে এনে দেয়।

নায়েব।—(গম্ভীরভাবে) তুমি ঐ তিন টাকার জামিন হ'তে পার ত ছেড়ে দাও।

"আজ্ঞে, তা' হ'লাম" বলিয়া জোব্বর খাঁ করিমকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ীতে আনিল। করিম ৩ খানা থালা একটি ঘটী ও একটি বদনা বাঁধা দিয়া ৩।০ তিন টাকা চারি আনা পাইল। পুনর্ব্বার কাছারীতে গিয়া দুইটাকা

জমিদারের, একটাকা নায়েবের ও জামিন হওয়ার জন্য চারি আনা পেয়াদা সাহেবের পৃথক্ পৃথক্ দিয়া নিস্তার লাভ করিল।

নায়েব মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—করিম্, বাবা, চাকুরি না কুকুরি, করা কি, পেটের দায়, না করিলে নয়। সেই যে, জান ত, স্বদেশী হুজুগে মেতে হুজুর হুকুম দিয়েছিলেন, বাজারে বিলাতী জিনিষ যারা বেচ্‌বে তাদের জরিমানা কর, মারপিট কর, ঘর পোড়াও, মালপত্র পোড়াও। আমরা ত বাপু হুকুম-বরদার, যা' হুকুম তাই কর্‌লাম; এখন নাকি উপরওয়ালা মহা খাপ্পা; হুজুর এখন কি দিয়ে কি ঢাক্‌বেন, তার আর উপায় পাচ্ছেন না। একদম বিলাতে বিশ হাজার টাকার বিলাতী জিনিষের ফরমাশ্ পাঠান হয়েছে। মরণ কেবল তোমার আর আমার। তোমাদেরও এ টাকা দেওয়া কষ্ট, আমাদেরও গরিব মেরে এ টাকা আদায় করা কষ্ট। করা কি! বলেছি ত বাপু, চাকুরি না কুকুরি; কি কর্‌বো পেটের দায়, না কর্‌লে নয়।

করিম্ বেচারা নায়েবের মিষ্ট কথায় বুঝিয়া গেল, জমিদার বড়লোক, ঐরূপ খামখেয়ালীই হইয়া থাকে, কিন্তু উপরওয়ালা ইংরাজবাহাদুর সম্ভবতঃ বড় বদ্‌লোক, কেন না তিনি হয়ত স্বদেশী জিনিষের ক্রয়বিক্রয় ভাল বাসেন না; কেবল বড় ভাললোক এই নায়েব মহাশয়; তবে তিনি যা' কিছু অভদ্রতা করেন, তাহা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মার্জ্জনীয়, কেন না, চাকুরী না কুকুরী, কি করিবেন, পেটের দায়, না করিলে নয়।

ঋণদায়-গ্রস্ত দীনাবস্থ কৃষক প্রতিমাসে দুইদিন করিয়া মহাজনের বাটীতে গিয়া ধান কর্জ্জ করিয়া আনিতে লাগিল, এবং অর্দ্ধাশনে থাকিয়া অভাবজনিত শতকষ্ট সহ্য করিয়া পুনর্ব্বার চাষআবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু ফল সমভাব, অভাব ও ঋণ তাহার সঙ্গের সাথী।

আবার, মধ্যবিত্ত ও জমিদারের দশাও সন্তোষদায়ক নহে। অলসতা বিলাসিতা লৌকিকতা ও কন্যাদায় তাঁহাদিগের অর্থাভাব ও ঋণদায়ের প্রধান কারণ। জমিদারগণের দানও এখন হয় বিলাসিতা না হয় মহাদায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাবিধ বিলাসিতা ও বাধ্যতার বশে তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে ঋণদায়গ্রস্ত হইতে হয়।

সংপ্রতি বঙ্গদেশে কি জমিদার কি মধ্যবিত্ত কি কৃষক তিন শ্রেণীর মধ্যেই ঋণদায়শূন্য লোকের সংখ্যা সমধিক নহে। জমিদারগণের মধ্যে বিলাসিতা ও লৌকিকতা রোগ এতই প্রবল যে, ঐ রোগে অনেকের কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত, তথাপি

প্রতীকারচেষ্টা নাই। পিতা ১৫ হাজার টাকা মুনাফাবিশিষ্ট জমিদারীর মালেক ছিলেন। তাঁহার দেহান্তে তিনটি পুত্র উত্তরাধিকারী হইয়া প্রত্যেকে ৫ হাজার টাকার জমিদারী পাইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পিতা একাকী ১৫ হাজারের অধিপতি হইয়া যেরূপ বিলাসিতা লৌকিকতা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, পুত্রত্রয় প্রত্যেকে ৫ হাজারের অধিপতি হইয়াও সর্ব্ববিষয়েই পৈতৃক মাত্রা বজায় রাখিলেন। কেবল তাহাই নহে, পৈতৃক সময়ে যে মাত্রার বিলাসিতা বা লৌকিকতায় যে পরিমাণে অর্থব্যয় হইত, পুত্রের সময়ে সে মাত্রা রক্ষা করিতে তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক অর্থের প্রয়োজন; সুতরাং পুত্রগণের পক্ষে ঋণদায় অপরিহার্য্য। এইরূপ আয়ব্যয় হিসাব করিয়া পূর্ব্বপুরুষানুষ্ঠিত বিলাসিতা বা লৌকিকতার মাত্রা কমাইয়া দেওয়া যে পরিমাণে সংসাহস-সাপেক্ষ, অনেক ভীরু জমিদার-পুত্রগণের দুর্ব্বল হৃদয়ে সে পবিমাণ সংসাহসের অস্তিত্ব দেখা যায় না। বর্ত্তমান বাঙ্গালী জমিদারগণ সাহেব সাজিতে সাহেবি খানা খাইতে, সাহেব-বিবির সঙ্গে নাচিতে খেলিতে শিখিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বোক্তরূপ অভ্যাসের দাসত্বনিবন্ধন অবস্থাতিরিক্ত ব্যয়শীলতা, ও ঋণদায়বদ্ধতার বিষয় বিচার করিলে, তাঁহাবা আহারবিহার বেশবিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে সাহেবের সমকক্ষ হইলেও কর্ত্তব্যবিচাববিষয়ে সাহেবগণের অপেক্ষা যে অনেক অধম, ভাবিয়া দেখিলে তাহা আপনারাই অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

আবার ঐ সকল অবিমৃষ্যকারী বাঙ্গালী জমিদারই বঙ্গের পল্লীসমাজের অধিনায়ক ও আদর্শস্থল। ইঁহারা প্রভুত্বপ্রিয়তা বিলাসিতা ও লৌকিকতাবশে দায়গ্রস্ত হইয়া অর্থের নিমিত্ত অবশেষে নানারূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া নিরীহ নিঃসম্বল প্রজাগণকে ধনেপ্রাণে নিপীড়িত করিতে থাকেন। উক্তরূপ অবৈধাচরণ হেতু রাজদ্বারে যাহাতে দণ্ডিত হইতে না হয় এই ভয়ে ইঁহাদিগকে সদাই ভীত ও সতর্ক থাকিতে হয়, সে জন্যও অনেক সময়ে অনেকরূপ কৌশল অবলম্বন বা অপরাধ প্রকাশ পাইলে তাহার খণ্ডন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে রাশি রাশি অর্থের অপব্যয় ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ঋণদায় অবশ্যম্ভাবী।

পল্লীসমাজে সামাজিক শাসনদণ্ডও হয় ত এইরূপ জমিদারের হস্তেই ন্যস্ত। ইঁহারা সমাজরক্ষাব্যপদেশে আপনাদের অর্থাভাব পূরণের নিমিত্ত নিঃস্ব নিরপরাধ সামাজিকগণের উপর অত্যাচার করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হন না। ইঁহারা স্বয়ং স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আহারবিহারে সতত নিরত, কিন্তু জমিদারির মধ্যে কেহ বুঝিয়াই হউক না বুঝিয়াই হউক দৈবাৎ একদিন উক্তরূপ

কোন অবিহিত আচরণ করিলে তাহাকে আর্থিক, তদভাবে কায়িক দণ্ডে বিলক্ষণ দণ্ডিত করিতে ত্রুটী করেন না; ধর্ম্মরক্ষার্থ নহে, সে কেবল প্রভুত্ব ও স্বার্থরক্ষার্থই শাস্ত্রসঙ্গত সুকৌশল। স্তাবকগণও সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ প্রকৃতির হুজুরগণকে দুষ্টের শাসক শিষ্টের পোষক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শতমুখে জয়ধ্বনি করিতে থাকে। নিরীহ নিপীড়িত ব্যক্তি এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই অসহায় হইয়া অবাঙ্মুখে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন। দুরন্ত দুর্ব্বৃত্ত জমিদারের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় লওয়া অসম্ভব; কারণ কে তাঁহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ দিবে? প্রমাণাভাবে তাঁহাকেই হয় ত পুনর্ব্বার মিথ্যাভিযোগঅপরাধে লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

অবশ্য, বর্ত্তমান বঙ্গের জমিদারমাত্রেই যে উক্তরূপ অর্থগৃধ্নু ও অত্যাচারী একথা অস্বীকার্য্য; ন্যায়পরায়ণ দয়ালু সদাশয় জমিদার বঙ্গে এখনও অনেক বর্ত্তমান। বড় বড় জমিদারগণ সকলেই প্রায় প্রজার প্রতি বৈধাচরণই করিয়া থাকেন। কেবল পল্লীগ্রামের তথাভিহিত হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতাদিগের মধ্যেই অনুসন্ধান করিলে কখন কখন উক্তরূপ যথেচ্ছাচারিতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা যথেষ্ট ভূসম্পত্তিমান্ বা প্রচুর ধনাধিকারী না হইলেও প্রভুত্ব প্রতাপ হেতু সাধারণতঃ জমিদার নামেও অভিহিত, এবং পল্লীসমাজের মঙ্গলামঙ্গল সাধনে বড় বড় জমিদারগণ অপেক্ষা ইহাদিগেরই ক্ষমতা সমধিক। ইহারা সদ্‌ব্যয়শীল সুবিবেচক হইলে পল্লীসমাজের সুখসচ্ছন্দতা যে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উক্তরূপ জমিদারগণ সাধারণতঃ সকলেই প্রায় ঋণদায়গ্রস্ত হইয়া পড়ায় তাঁহারা ক্রমশঃ নানারূপে মধ্যবর্ত্তী ও কৃষক প্রজাগণের নিকট হইতে অর্থশোষণের কৌশল উদ্‌ভাবন করিতে থাকেন। করবৃদ্ধি, ভিক্ষা, মাথট, বাজে আদায় ইত্যাদি বহুবিধ কৌশলেও যখন অভাবমোচন হয় না, তখন ঐ সকল জমিদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সমর্থ লোকগুলিকে হস্তগত রাখিয়া অপর সাধারণের উপর সামাজিক-প্রভুত্ব প্রচারপূর্ব্বক যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করেন। এমন কি সমাজ মধ্যে দুই পাঁচ জন দুষ্টলোক জমিদার পক্ষ হইতে নিয়োজিত হইয়া মধ্যে মধ্যে কোন না কোন ব্যক্তির নামে দোষারোপ পূর্ব্বক জমিদারের হুজুরে সেকায়ৎ করিতে থাকে এবং ঐ দোষ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনানুরূপ ষড়যন্ত্রাদি করিতেও ত্রুটি রাখে না। বলা বাহুল্য যে, সমাজপতি জমিদার মহাশয় এ বিষয়ে বেশ আইন বাঁচাইয়া স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ করিয়া লন। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট

নির্ব্বাক্। সমাজপতি মহাশয় অবাধে কোন একজন সামাজিককে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সমাজমধ্যে হয়ত এরূপ ঘোষণা করিলেন, যাহাতে উক্ত ব্যক্তির স্বজাতিমধ্যে নিমন্ত্রণ ও পুত্রকন্যার বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল, এমন কি ক্ষৌরকার ও রজক আর সে ব্যক্তির বাড়ীতে কার্য্য করিতে সম্মত নহে। জনন-মরণে সে ব্যক্তি অপরের সহায়তায় বঞ্চিত। এ অবস্থায় হয় তাহাকে সপরিবারে দেশত্যাগ করিতে হইবে, না হয় যে কোন উপায়েই হউক সমাজপতির প্রসাদ লাভ করিতে হইবে। দেশত্যাগ অসাধ্য জানিয়া অগত্যা সে গোয়েন্দাগণের দ্বারা উক্ত প্রসাদ-প্রার্থনা জানাইল। বিশিষ্টরূপ বলিভোগ না দিলে সে প্রসাদ দুর্লভ। সুতরাং তাহারই ব্যবস্থা হইল। তখন জমিদার মহাশয় নামমাত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ ও বিচার করিয়া দোষীকে পুনর্ব্বার নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। গরিবের গ্রহবৈগুণ্য খণ্ডন হইল, জমিদার মহাশয়েরও যৎকিঞ্চিৎ অভাবপূরণ ও প্রভুত্বপ্রসার হইল। ফলতঃ জমিদারের অর্থাভাব ও ঋণদায় ক্রমশঃ গরিব প্রজারও অর্থক্ষয় ও ঋণদায় সংঘটন করিতে লাগিল।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে কন্যাদায়ও ঋণদায়ের একটি প্রধান হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা দেশে হিন্দুগণের বিবাহে কন্যাকর্ত্তা পণগ্রহণ করিতেন, কেবল কুলীন ব্রাহ্মণপাত্রই কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে পণ প্রাপ্ত হইতেন। সে পণেরও ঊর্দ্ধ মাত্রা ছিল ১৬৲ ষোলটি টাকা মাত্র। কিন্তু এক্ষণে কি কুলীন কি বংশজ, কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, এমন কি, কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়েরই কন্যাকর্ত্তা অযথোচিত পণদান পূর্ব্বক বরপাত্রকে মেষগবাদি পশুবৎ ক্রয় করিয়া লইতে বাধ্য; নচেৎ তাঁহার কন্যাকে চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বন করিতে অথবা কুলকলঙ্কিনী হইতে হইবে। অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিতসম্প্রদায়েই এ প্রথার প্রাবল্য সমধিক। বর্ত্তমান বঙ্গে জনকগণের গৃহে কন্যাসন্তানের সংখ্যাও স্বল্প নহে, সুতরাং কন্যাদায় যে সহজেই গৃহস্থের ঋণদায়ের প্রবর্ত্তক হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। এই কন্যাদায়সূত্রে সংপ্রতি অনেক স্থানে অনেক রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটিতেছে, সংবাদপত্রে এবং সভাসমিতিতে পণপ্রথা-নিরোধের নিমিত্ত নানাবিধ প্রস্তাবনা চলিতেছে, তথাপি এ প্রথার প্রবলতা কমিতেছে না।

হিন্দুগণ মুখে সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিতেছেন; কিন্তু আচরণে পূর্ব্বোক্তরূপ নানাবিধ বার্ব্বরিকতার পরিচয় দিয়া শিষ্টসমাজে ঘৃণিত হইতেছেন। তাঁহাদের এই সকল কল্পিত সনাতন ধর্ম্মাচার বা অত্যাচার-মাত্রা সম্প্রতি এতই বৃদ্ধি

পাইয়াছে যে, যদিও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বীয় প্রতিশ্রুতিবশতঃ প্রজালোকের ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতি বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক, তথাপি অত্যাচার-প্রপীড়িতগণের রক্ষাহেতু বাধ্য হইয়া অচিরেই প্রতীকার বিধান না করিলে নিরীহ নিপীড়িতগণের পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। হিন্দুসমাজ মুখে গবর্ণমেণ্টকে উদাসীন থাকিতে বলিলেও কার্য্যতঃ পুনঃ পুনঃই হস্তক্ষেপ করিতে আহ্বান করিতেছেন। নানা কারণবশতঃই গবর্ণমেণ্ট যে এখনও সে আহ্বানে জাগিতেছেন না, তাহা হিন্দুসমাজের পক্ষে দুর্ভাগ্যসূচক না হইলেও কখনই সৌভাগ্যসূচক নহে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীনত্ব বিচারে ইহার মলিনত্ব বরং মার্জ্জনীয়, কিন্তু অচির-প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাজনীতিও যে পূর্ব্বোক্তরূপ পণপ্রথাদি দোষে দূষিত হইতেছে, ইহা নিতান্তই বিস্ময়বিষাদজনক। এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণ যেরূপ তর্ক উত্থাপিত করিয়া আপনাদিগের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারেন, হিন্দুগণও সেইরূপ তর্ক দ্বারা তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু উভয় সমাজের তর্কই নিষ্ফল। তাঁহারা পণগ্রহণ স্বীকার করুন, বা নাই করুন, নিজেরা অনেকে স্ব স্ব পুত্রগণের বিবাহোপলক্ষ্যে বস্ত্রালঙ্কারাদি ব্যপদেশে কন্যাকর্ত্তামহাশয়গণকে যে বিষম দণ্ডগ্রস্ত করিয়া থাকেন এ কথা অস্বীকার্য্য নহে।

উপরিউক্ত হেতুসমবায়ে বঙ্গদেশে অর্থাভাব ও ঋণদায় সর্ব্বত্রব্যাপী। ইহাতে যে আমাদের জাতিগত চরিত্রের অপকর্ষ সাধন করিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। শ্ববৃত্তি, অর্থাভাব ও ঋণদায় এই ত্রিদোষাক্রান্ত হইয়া বাঙ্গালী জাতির ধাতু সাধারণতঃ ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। এই দোষত্রয়বর্জ্জিত সুস্থ সতেজ অবস্থা বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই পতিত হইয়াও আপনাকে উন্নত বলিয়া স্পর্দ্ধাপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এরূপ স্পর্দ্ধা অধঃপতনেরই পরিচায়ক।

বঙ্গের বর্ত্তমান নৈতিকতা।

বাঙ্গালী আমরা আজকাল পরদোষ ও নিজগুণ দর্শনে বড়ই চক্ষুষ্মান্ হইয়াছি। আমরা শিক্ষিত সুসভ্য সাহসী, ইত্যাদিরূপ আত্মগুণ বিচার করিয়া কৃতার্থম্মন্য হই সত্য, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি কি যে, আমরা যথার্থই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও বিশ্বাসপাত্র? ভাই বাঙ্গালী, তুমি তোমার জাতীয় প্রতিনিধি স্বরূপে বলিতে পার কি যে, তোমায় বিশ্বাস করিয়া আমার মৃত্যুসময়ে

আমার অবীরা যুবতী পত্নী ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভারার্পণ তোমার উপরে করিয়া যাইতে পারি? বলিতে পার কি যে, আমি নিঃসন্দেহে স্বীয় অর্থদ্বারা আমার পুত্রাদির নিমিত্ত তোমার নামে একটি সম্পত্তি কিনিয়া রাখিতে পারি? বলিতে পার কি যে, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও এই গ্রন্থনায়ক শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের পিতা মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী ব্যতীত তোমার জাতিতে তোমার বিশ্বাসযোগ্য পাত্র আর তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিলেন? নিঃসন্দেহে নাম বলিয়া দিতে পার কি, যাহার নিকট আমি দশদিনের জন্য দশসহস্র মুদ্রা গোপনে গচ্ছিত রাখিতে পারি?

তুমি বলিবে, "শুধু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কেন? সকল জাতির মধ্যেই সেরূপ মহাত্মার সংখ্যা অতি কম"; কিন্তু তদুত্তরে আমরা হয় বলিব,—"না, কোন কোন জাতির মধ্যে সেরূপ লোক এখনও অনেক আছেন," না হয় বলিব, "সকল জাতির মধ্যেই এখন সেরূপ লোকের সংখ্যা স্বল্প বলিয়াই আজ পৃথিবীতে নানাবিধ দুর্দ্দৈব, বিবিধ উৎপাত উপস্থিত; পুণ্যের মাত্রা সাধুত্বের মাত্রা স্বল্প বলিয়াই পৃথিবীতে শান্তির মাত্রা সুখস্বচ্ছন্দতার মাত্রাও স্বল্প; এবং পাপের মাত্রা, আততায়িতার মাত্রা, লোভের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই পৃথিবীতে অশান্তির মাত্রা, উৎপাতউপদ্রব-মাত্রা, শোণিতপাত-মাত্রা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

সে যাহা হউক, অপরের সহিত তুলনার প্রয়োজন নাই, আমরা বাঙ্গালী বর্ত্তমান যুগে যতই উচ্চাদর্শ লাভ করি না কেন, আমাদের নৈতিক জীবন যতই উন্নত হউক না কেন, সত্যনিষ্ঠা বিষয়ে আমরা যে বড়ই উদাসীন, কামিনী-কাঞ্চন বিষয়ে আমরা যে বড়ই অবিশ্বাসী, একথা শতবার স্বীকার্য্য, এবং যতদিন নৈতিকতার এই মূলভিত্তি সুদৃঢ় না হইবে, ততদিন যত উচ্চ শিক্ষালাভই হউক না কেন, প্রকৃত উন্নতি প্রকৃত মনুষ্যত্ব বাঙ্গালীর—বা অন্য যে কোন জাতিরই—পক্ষে সুদুর্লভ।

পৃথিবীতে এখন কর্ম্মকৌশল যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন, সত্য ও সাধুত্ব যে সাধারণতঃ অনেক হ্রাস পাইয়াছে এ কথা সূক্ষ্মদর্শী মনস্বী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এই বিষয়ের বিচার করিতে গেলে ঋষিগণের বর্ণিত যুগমাহাত্ম্যে সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয়। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল,—

নবদ্বীপাধিপতি স্বনামপ্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদা সভাসীন সদস্যমণ্ডলে প্রশ্ন করিলেন,—মহাশয়গণ, শাস্ত্রানুসারে স্বীকার করিতে হইবে, সম্প্রতি

পৃথিবীতে ক্রমশঃই কলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু এ বিষয়ের বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত কেহ কিছু দেখিতে পাইতেছেন কি?

প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতসমাজে অনেকে অনেকরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু কোন দৃষ্টান্তই মহারাজের মনঃপূত হইল না। অবশেষে একটি দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সবিনয়ে কহিলেন,—মহারাজ, আমি মূর্খ দরিদ্রব্রাহ্মণ, আমার শাস্ত্রজ্ঞান কিছু মাত্র নাই, তবে যদি মহারাজ অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি কলির প্রভাববৃদ্ধি বিষয়ে স্বীয় জীবনে যেরূপ প্রমাণ পাইতেছি তাহা নিবেদন করিতে পারি।

বৃদ্ধব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া মহারাজ সানুগ্রহে অনুমতি প্রদান করিলেন; ব্রাহ্মণ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে কহিতে লাগিলেন,—

মহারাজ, এক্ষণে আমি বৃদ্ধ, সামর্থ্যহীন; কিন্তু যখন আমি যুবাপুরুষ ছিলাম,—বয়স অনুমান বিংশতি বর্ষ, সেই সময়ে একদিন অপরাহ্ণকালে কোন প্রয়োজন বশতঃ স্বগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিলাম। আমি যখন সায়ংপূর্ব্বে একটি প্রান্তর মধ্যে সমুপস্থিত, সেই সময়ে সহসা বায়ুকোণ হইতে মেঘোদয় হইয়া ক্রমশঃ সমগ্র আকাশ সমাচ্ছন্ন করিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ! আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে প্রান্তরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া একটি নিবিড় নির্জ্জন আম্রকাননে প্রবেশপূর্ব্বক একখানি জনশূন্য গৃহ দেখিতে পাইয়া তন্মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ঝটিকাবৃষ্টিবেগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ নিশাগমে আম্রকানন অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সহসা আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলাম,—"ঘরে কে আছগো আমায় রক্ষা কর।" বিদ্যুৎ আলোকে চাহিয়া দেখি, একটি স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা রূপবতী যুবতী,—একেবারেই বিবস্ত্রা!

আমি তৎক্ষণাৎ গৃহদ্বার হইতে কর প্রসারিত করিয়া কহিলাম,—মা, ভয় নাই, আমার হাত ধর।

যুবতী আমার হস্তধারণ করিলেন, আমি সবলে করাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহমধ্যে তুলিয়া লইলাম এবং নিজ উত্তরীয় বস্ত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করিয়া কহিলাম,—মা, এই চাদরখানি পরিধান কর, কোন শঙ্কা নাই, আমি তোমার সন্তান। আমার দেহে প্রাণ থাকিতে তোমার কোন বিপদ্ নাই জানিবে।

যুবতী আশ্বস্তা হইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—বাবা, আমি পিত্রালয় হইতে পাল্কীতে উঠিয়া শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলাম, আমার স্বামীও সঙ্গে সঙ্গে আসিতে-

ছিলেন। হঠাৎ মাঠের মধ্যে এই বিষম ঝড় উঠিয়া কে কোথায় গেল, কিছুই ঠিক নাই। আমি পাল্কী ছাড়িয়া ছুটিতে ছুটিতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, আমার স্বামী ও বাহকগণ কে কোথায় গিয়াছেন কিছুই জানি না। বাবা, তুমি আমাকে রক্ষা কর।

আমি উত্তর করিলাম,—মা, কোন চিন্তা নাই। ঝড়বৃষ্টি থামিলে আমি তোমার স্বামী ও বাহকগণের অনুসন্ধান করিব। তোমাকে তোমার স্বামীর হস্তে সমর্পণ না করিয়া আমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিব না।

সেই ঝটিকাবৃষ্টিময় রাত্রিকালে সেই নির্জ্জন কাননগৃহে যুবাপুরুষ আমি ও যুবতী সেই বিপন্না পতিবিচ্ছিন্না রমণী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উক্তরূপ কথোপকথনে একত্রাবস্থান করিলাম; ক্রমে দুর্য্যোগ দূর হইল, মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। আমি তখন গৃহবহির্গত হইয়া যুবতীর স্বামীর উদ্দেশে নানা সঙ্কেতে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এদিকে ওদিকে চীৎকার করিতে করিতে সহসা সুদূর হইতে প্রত্যুত্তর পাইলাম।

অল্পকাল মধ্যেই যুবতীর পতি ও বাহকগণ পাল্কী লইয়া উপস্থিত হইল। পতি পত্নীমুখে আমার শিষ্টাচারের পরিচয় পাইয়া সবিনয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-পূর্ব্বক আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের গৃহে যাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। সেই রমণীও বারবার "বাবা, আমাদের বাড়ীতে চলুন্" বলিয়া সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি নিজ প্রয়োজনাতিশয্য বশতঃ অনেক অনুনয়বিনয়ে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং গন্তব্য পথে চলিয়া গেলাম।

মহারাজ, আমি এই রাজসভায় সর্ব্বসমক্ষে শপথপূর্ব্বক কহিতেছি, সে দিন সে সময়ে আমার মনে কোন প্রকার পাপবুদ্ধির আদৌ উদয় হয় নাই। সেই সময়ে যদিও আমার যৌবন বয়স, ইন্দ্রিয়গণ সদাই উদ্দাম উন্মার্গগামী, তাহাতে আমি শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ, তথাপি মন আমার সেই সঙ্কট সময়ে নিতান্ত নিষ্পাপ নিরুদ্বেগ ছিল। আজ ষাট্ বর্ষ অতীত হইল, এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। আজ আমার বয়স অশীতি বর্ষ; ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ নিশ্চেষ্ট, চক্ষে দৃষ্টি নাই, কর্ণ বধিরপ্রায়, চর্ম্ম লোল, কেশ পলিত, দন্ত গলিত, মৃত্যু সন্মুখীন। মহারাজ, বলিতে কি, এক্ষণে কোন কোন দিন রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাগম-পূর্ব্বে আমার মনে সেই দিনের সেই ঘটনার চিন্তা উদিত হয়, এবং এক একবার অন্তরে যেন এইরূপ আক্ষেপ উপস্থিত হয় যে, "হায় হায়! সে সুযোগ কেন

ছাড়িয়া দিলাম! আমি ত সে সময়ে অনায়াসে আমার দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতাম, এবং সেই রমণীর বহুমূল্য অলঙ্কারগুলিও আত্মসাৎ করিয়া অবাধে প্রস্থান করিতে পারিতাম! আমাকে ত কেহই চিনিতে বা ধরিতে পারিত না।

মহারাজ, ইহা হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, এই ষাট্ বৎসরে কলির প্রভাব কি ভয়ঙ্কর মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে! কারণ, কলিপ্রভাব ব্যতীত, যৌবন প্রৌঢ় অতীত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে এখন আমার এ দুর্মতির অপর কোন হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে এই উপাখ্যান ও তাঁহার অকপট আত্মপরিচয় শুনিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাতিশয় সন্তোষপ্রকাশপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে যথোচিত পুরস্কারে পরিতুষ্ট করিয়া রাজসভা ভঙ্গ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ধর্ম্মমত প্রচারিত হইবার পর হইতে বঙ্গীয় যুবক-মণ্ডলে ইন্দ্রিয়সংযম বিষয়ে কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু সে উন্নতি আশানুরূপ মাত্রা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই খর্ব্ব হইবার যথেষ্ট কারণও ক্রমে জন্মিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ছাত্রদিগকে সুনীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও সুফলপ্রদ বলিয়া বোধ হইতেছে না। পাঠ্য পুস্তকে যতই নীতিকথা লেখা থাকুক না কেন, আর বক্তার মুখে যতই নীতিবিষয়ক বক্তৃতা শুনা যাউক না কেন, অধ্যাপক বা বক্তা স্বয়ং শুদ্ধচরিত্র না হইলে সহস্র বক্তৃতা বা অধ্যাপনাতেও যে আশানুরূপ ফললাভ হইবে এরূপ বোধ হয় না। বিশেষতঃ অশিষ্টবংশে জাত অসৎসংসর্গে প্রতিপালিত বালকবালিকাগণের সহিত শিষ্টবংশজাত সৎসংসর্গে প্রতিপালিত বালক-বালিকাগণের অধ্যয়নচ্ছলে একত্রাবস্থান বা একত্র পানভোজনাদি সূত্রে সংক্রামিত হইয়া কুচরিত্রতাদোষ ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া পড়িতেছে। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের তথা অভিভাবকগণের এ বিষয়ে প্রয়োজনানুরূপ মনোযোগ দেখা যায় না।

যুবকমণ্ডলীর কুচরিত্রতা দোষের সর্ব্ব প্রধান কারণ তাহাদের অস্বাস্থ্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য। এই অস্বাস্থ্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের মাতাপিতা হইতে অনুপ্রাপ্ত। পিতামহ যেরূপ দৃঢ়কায় নীরোগ কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, পিতা তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন, পুত্র পিতা অপেক্ষাও ন্যূন; এইরূপই যেন আধুনিক মানবীয় বহিরন্তঃশক্তির উত্তরাধিকারিত্বে সাধারণ নিয়ম। এই

প্রকার ক্রমাবনতির সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে, আমরা শিশুকালে বৃদ্ধা পিতামহীর মুখে "কলিকালে বেগুনতলায় হাট বসিবে" ইত্যাদিরূপ যে সকল ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়াছি, তাহা আর অলীক হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয় না। দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তি বিষয়ে ক্রমশঃ আমরা যেরূপ অবনতি প্রাপ্ত হইতেছি, অন্তঃশুদ্ধতা ও অন্তঃশক্তি বিষয়েও আমাদের অবনতি তদ্রূপ।

যাহারা হীনবীর্য্য তাহাদের অন্তর ষড়্‌রিপুর তাড়নে সদাই কম্পিত ও বিচলিত, রিপুবেগ তাহাদিগকে সহসাই অধীর করিয়া তুলে, ক্ষুদ্র পাত্রের জল যেমন সহজেই টলথাইয়া পড়ে সেইরূপ নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তির অন্তর যে কোন বেগেই হউক সহজেই কম্পিত হইয়া উঠে এবং শরীরও সে বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

এ যুগে যাঁহাদের দেহ হৃষ্টপুষ্ট বা যাঁহারা নিয়মিতরূপ ব্যায়ামাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যে বীর্য্যবান্, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে। মেরুদণ্ডীয় প্রদেশের নির্ম্মলতা অর্থাৎ মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বদেশ ও ঊর্দ্ধাধঃ প্রদেশের শ্লেষ্ম-মুক্তি ও তজ্জনিত হৃৎপিণ্ড ও শ্বাস যন্ত্রের স্বাস্থ্য ও সবলতা এবং শারীরিক বায়ুর ঊর্দ্ধবেগই বীর্য্যবত্তার প্রধান নিদান। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা হেতু অনেক সময়ে অনেক তথাভিহিত সুস্থ ও বলবান্ ব্যক্তিকেও সহসাই জীবনীশক্তি হারাইতে দেখা গিয়াছে।

প্রত্যূষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বিনা তৈলে স্নান, মধ্যাহ্নে ঘৃত দুগ্ধাদি সহ নিরামিষ আতপান্ন ভোজন, রাত্রিতে ফল মূল দুগ্ধাদি লঘুপাক দ্রব্য স্বল্প পরিমাণে আহার, একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে উপবাস বা অত্যল্প আহার, পঞ্চপর্ব্বে দিবাভাগে ও স্ত্রীধর্ম্মপ্রকাশ-কালে স্ত্রীসহবাসবর্জ্জন প্রভৃতি ঋষিগণনির্দ্দিষ্ট আচরণ উপরি উক্ত রূপ স্বাস্থ্য ও বীর্য্য স্থৈর্য্য লাভের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধারণ উপায়, এ কথা এ দেশে আর এখন হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামি বলিয়া উপহাসযোগ্য নহে।

প্রথমতঃ দেশীয় শিক্ষিত সমাজ দেশীয় শাস্ত্রশাসনে নিতান্তই অনাস্থাবান্ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রশাসন অনুসারে সংযম শিক্ষা করিতে শক্তিমান্ না হইলেও, ঐ শাসন যে অধিকাংশই আমাদের অন্তর্ব্বহিঃস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধায়ক, তাহা অনেকেই বুঝিতে শিখিয়াছেন। সে শিক্ষাও শুভক্ষণে পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহার প্রধান প্রবর্ত্তকদ্বয়ের নাম—

কর্ণেল অলকট্ ও ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কী।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে উপরি উক্ত মহাত্মদ্বয় পরস্পরের সহযোগিতায় থিয়সফিকাল সোসাইটি নামে একটি তত্ত্বানুশীলনসমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহারা কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনই ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

মাডাম্ ব্লাভাস্কী অগাধ পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক শক্তি শালিনী রমণী। ইঁহার প্রকৃত নাম হেলেনা পেট্রভনা ব্লাভাস্কী (Helena Petrovna Blavatsky)। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ জর্ম্মাণ জাতীয় হইলেও বহুকাল হইতে রুসিয়াদেশবাসী। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ঐ দেশেই ব্লাভাস্কীব জন্ম হয়। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৬০ বৎসরবয়স্ক এক বৃদ্ধের সহিত ব্লাভাস্কীর বিবাহ হয়, কিন্তু অল্পদিন পরেই এ বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

তাহার পর, ব্লাভাস্কী বহুকাল ধরিয়া নানা দেশ পর্য্যটন করেন। নেপালের পথে তিব্বতপ্রবেশ করিতে না পারিয়া তিনি ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ছদ্মবেশে কাশ্মীরের পথে উক্ত দেশে প্রবেশ করেন, কিন্তু পথভ্রান্ত হইয়া সীমান্ত-প্রদেশে আনীত হন। কথিত আছে তিনি হিমালয়প্রদেশে পথভ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা একস্থানে বেদের কৌথুমীশাখার প্রবর্ত্তক কুথুম-ঋষির দর্শনলাভ করেন। কুথুম তখন অশরীরী আত্মমাত্র, নাকি সেই সৌভাগ্যশালিনী রমণীকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিবাব নিমিত্তই কৃপা করিয়া ইচ্ছানুরূপ শরীর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সময়ে মাডাম্ ব্লাভাস্কী অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ভারতভ্রমণ শেষ করিয়া ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি আমেরিকায় উপনীত হন এবং আমেরিক জাতিভুক্ত হইয়া অনেকদিন নিউইয়র্কে বাস করেন। এইখানে থাকিয়া তিনি প্রেততত্ত্বের আলোচনা করেন এবং কর্ণেল্ অলকটের সহকারিতায় পূর্ব্বকথিত থিয়সফিকাল সোসাইটি নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে কর্ণেল্ অলকট্ ও মাডাম্ ব্লাভাস্কী ভারতে আসিয়া তাঁহাদের সমিতির কার্য্য আরম্ভ করিলে ভারতবাসী শিক্ষিতসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল ; অনেক ধনী মানী শিক্ষিত ব্যক্তি ইঁহাদের সমিতিভুক্ত হইয়া অধ্যাত্মবিদ্যা ও প্রেততত্ত্বের অনুশীলন আরম্ভ করিলেন।

মাডাম্ ব্লাভাস্কী ভারতে আসিয়া মাদ্রাজে অবস্থিতি করেন। তথা হইতে

তিনি কলিকাতায় আসিয়া সর্ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অতিথি স্বরূপে "ঠাকুর কাস্‌ল্" নামক ভবনে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতা সহরের অসংখ্য লোক তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল।

কথিত আছে, এই শক্তিশালিনী রমণী অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারিতেন। তৎকালে এরূপ শুনা গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তাঁহার বিদেশবাসী বন্ধুব নামে পত্র লিখিয়া পত্রখানি মাডাম্ ব্লাভাস্কীর হস্তে প্রদান করিলে মাডাম্ ব্লাভাস্কী পত্র লইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল পরেই আসিয়া ঐ পত্র ফিরাইয়া দিলেন। পত্রলেখক পত্র খুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, পত্রপৃষ্ঠে তাঁহার সেই পত্রের যথাযথ উত্তর লিখিত রহিয়াছে, এবং দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে, উহা তাঁহার সেই দূরদেশবাসী বন্ধুরই হস্তলিপি।

ব্লাভাস্কীর এই সকল অদ্‌ভূত শক্তির পরিচয় পাইয়া এ দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের প্রত্যয় হইল যে, সাধনা করিলে মানবাত্মা পরোক্ষবিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং অলৌকিক শক্তিবলে অসাধ্যসাধনে সমর্থ হয়। এই হেতু অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। সিক্রেট্ ডক্‌ট্রিন্, আইসিস্ অন্‌ভিল্‌ড্ (Isis Unvieled) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া মাডাম্ ব্লাভাস্কী বিশিষ্টরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ইনি ইংলণ্ডে গিয়া বাস করেন এবং লুসিফার দি লাইট্ ব্রিঙ্গার (Lucifer the Light Bringer) নামক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ৮ই মে এই মহীয়সী বিদুষী রমণী ইংলণ্ডেই দেহত্যাগ করেন।

বঙ্গীয় তথা সমগ্রভারতীয় শিক্ষিত সমাজে ঋষিগণসম্মত সংযম-অভ্যাস এবং অধ্যাত্ম-শক্তিসঞ্চয় বিষয়ে বিশ্বাস ও প্রবৃত্তি এ যুগে প্রথমতঃ মাডাম্ ব্লাভাস্কী ও কর্ণেল্ অলকট্ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত। ইঁহাদের সাধ্যবিষয় ও সাধনমার্গ সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হইলেও, ইঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় সমাজে অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রথম শিক্ষক বলিয়া যে বাস্তবিকই আমাদের সম্যক্ ভক্তিসম্মানভাজন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মহাত্মা কর্ণেল অলকটের উপদেশে ও আদর্শে বহুসংখ্যক বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবক সংযম ও সাত্ত্বিক আচারব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই আমেরিকাবাসী ধর্ম্মপরায়ণ মহাপুরুষ মাডাম্ ব্লাভাস্কীর সহযোগে সর্ব্বপ্রথম থিয়সফিকাল

সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ইনিই যাবজ্জীবন ঐ সভার সভাপতি ও "থিয়সফিষ্ট" নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উক্ত পত্রিকা প্রচার, অনেকগুলি গ্রন্থপ্রকাশ এবং বক্তৃতাদির দ্বারা মহাত্মা অল্‌কট্ ঋষিধর্ম্মের প্রতি দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। ইনি স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এবং ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব যাহাতে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় তদ্বিষয়ে অশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন; ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহার সে প্রয়াস নিষ্ফল হয় নাই। তিনি নিরামিষভোজী ও সাত্বিকাচার শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন এবং জলপড়া (Mesmerised water), হস্তচালনা (Mesmaric pass) প্রভৃতি উপায়ে নিজ অলৌকিক শক্তিবলে দুরারোগ্য রোগে আরোগ্যবিধান করিতেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, সুপ্রসন্ন মুখকান্তি, উজ্জ্বল প্রশান্ত দৃষ্টি, দীর্ঘ কেশ, প্রশস্ত ললাট, লম্বমান শুভ্র শ্মশ্রু ইত্যাদি দেখিলে যথার্থই বোধ হইত, যেন ভারতীয় কোন প্রাচীন ঋষিই ঐরূপে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়াছেন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে প্রায় অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাদ্রাজ নগরের আদিয়ার (Adyar) নামক স্থানে মহাত্মা কর্ণেল অলকট্ মানবলীলা সংবরণ করেন।

মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সদাশয় অক্ষয়কুমার দত্ত, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, জটিয়া বাবা, কর্ণেল অলকট্ প্রভৃতি সংস্কারক সাধু সজ্জনগণের আদর্শ ও উপদেশ, বিদ্যালয়ে পঠিত বিবিধ সদ্‌গ্রন্থের শত শত নীতিকথা ইত্যাদি সত্বেও বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ যে অদ্যাপি সাধারণতঃ চরিত্রহীন ও কামিনীকাঞ্চনাসক্ত, এ কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ইহা হইতে কেহ যেন এরূপ অনুমান না করেন যে, বঙ্গের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে চরিত্রবান্ মহাত্মব্যক্তির একবারেই অসদ্‌ভাব বা অন্যান্য দেশীয় শিক্ষিত সমাজ অপেক্ষা বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ একবারেই অধম। বিশ্বাসভাজন ভক্তিভাজন চরিত্রবান্ মহাজন যে এ বঙ্গে এখনও অনেক আছেন, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে; তবে এ কথাও শতবার স্বীকার্য্য যে, দেশান্তরের সহিত তুলনা না করিয়া যুগান্তরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, বঙ্গের সাধারণ ভদ্রসমাজে শতবর্ষ পূর্ব্বে ব্যভিচার বিশ্বাসঘাতকতা প্রবঞ্চনা প্রভৃতির যেরূপ প্রচলন ছিল, উক্ত সমাজে ঐ সকল পাপের প্রসারপ্রতিপত্তি যেন তদপেক্ষা এক্ষণে সমধিক। সম্প্রতি অর্থ ও স্বার্থই সাধারণতঃ বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের পরম পুরুষার্থ স্বরূপে পরিগণ্য, এবং তথাভিহিত শিক্ষাও মাত্র তজ্জন্য। জ্ঞানার্জ্জনের শিক্ষা (Liberal Education) অপেক্ষা ধনার্জ্জনের শিক্ষাই (Professional

Education) সমধিক সমাদৃত সুতরাং সর্ব্বত্র প্রচলিত। এই শেষোক্ত দীক্ষা-শিক্ষারই অবশ্যম্ভাবী ফল অর্থাসক্তি, এবং ঐ আসক্তির মাত্রাধিক্যেই আমাদের আজ সাধারণতঃই অসৎপথে পদার্পণ। সমাজেও ক্রমশঃ জ্ঞানাদর অপেক্ষা ধনাদর বাড়িয়াছে। সুতরাং ধনী হইতে পারিলেই আর সমাদরের অভাব থাকে না। আমাদের প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা পরস্বাপহরণ প্রভৃতি মহাপাপাচার পরে কাঞ্চন-কঞ্চুক-মণ্ডিত হইয়া সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপে দীপ্তি পাইতে থাকে। ঐরূপ চরিত্রই আবার শত শত শিক্ষার্থীর আদর্শ হইয়া উঠে। এই হেতু ইদানীং আমাদের নীতিশাস্ত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া মাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় দণ্ডবিধির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। যিনি কাপথে পদার্পণ করিয়া ধৃত ও দণ্ডিত, তিনিই মাত্র কাপুরুষ কুনীতিসম্পন্ন, আর যিনি বুদ্ধিবলে বা অর্থবলে অধৃত বা অদণ্ডিত থাকিয়া অশেষ পাপাচার আপাততঃ সুজীর্ণ করিয়া কাঞ্চন-তবকে তনু আচ্ছাদন করিলেন, তিনিই দশের আরাধ্য অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। যক্ষ্মারোগী যেমন নিজ রোগের বিবরণ কহিতে বা শুনিতে ভাল বাসে না, সেইরূপ আমরাও আমাদের এই সামাজিক মহারোগের বিবরণ বলিতে বা শুনিতে বড়ই বিরক্তি বোধ করি, বরং মৃত্যু, তথাপি রোগ-প্রকাশ বা আরোগ্যবিধানের প্রয়াস আমাদের একান্তই অপ্রিয় ও অসহ্য। বলা বাহুল্য, এই বলবৎ লক্ষণই ব্যাধিনির্দ্ধারণে বিশিষ্ট অভিজ্ঞান।

ভিন্নদেশীয় শিক্ষিত সামাজিকগণ চরিত্রবিষয়ে সাধারণতঃ আমাদের অপেক্ষা গরীয়ান্ কি লঘীয়ান্ তাহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য নহে, আমরা—বঙ্গীয় বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী সামাজিকগণ—অনেকেই যে উক্তরূপ চরিত্রবলহীন, ইহাই মাত্র বক্তব্য,—উদ্দেশ্য আত্মসংশোধন।

বঙ্গের বর্ত্তমান পল্লীসমাজে ভদ্র ও শিক্ষিতগণের কৃত্রিম ও অভ্যস্ত নৈতিকতা অপেক্ষা সাধারণতঃ অভদ্র অশিক্ষিতগণের অকৃত্রিম সহজ নৈতিকতার সমাদর অল্প হইলেও মূল্য অধিক। পল্লীবাসী অভদ্র অশিক্ষিত কৃষক পরের গাছ হইতে একটি পাকা কাঁঠাল চুরি করিয়া লইতে সহজেই লুব্ধ হইতে পারে, ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তির সেরূপ প্রবৃত্তি সহজে হয় না সত্য, কিন্তু মনিব বা মহাজনের কর বা ঋণ পরিশোধ না করিয়া পরিশোধ করিয়াছি বলিয়া মোকদ্দমায় জবাব দেওয়া এবং ঐরূপ প্রবঞ্চনারক্ষার্থ নানারূপ বাচনিক ও লৈখিক প্রমাণ সংগ্রহ করা ও ক্ষেত্রদারাপহারিত্ব প্রভৃতি আততায়িতার অনুষ্ঠান অভদ্র অশিক্ষিত অপেক্ষা তথাভিহিত ভদ্র ও শিক্ষিতগণ কর্ত্তৃকই সমধিক হইয়া থাকে।

কয়েক বর্ষ অতীত হইল, কোন এক ভদ্রলোকের একটি যুবতী কন্যা উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া হঠাৎ ছুটিয়া যায়। ভদ্রলোক অনেক অন্বেষণ করিয়াও কোনরূপ সন্ধান পাইলেন না। কিছুদিন পরে কোন একজন সুযোগ্য পুলিস্ সব্‌ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের পত্রে অবগত হওয়া গেল যে ঐ কন্যা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে বাস করিতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র কন্যার পিতা অপর দুই এক জন ভদ্রলোকের সহিত গিয়া উক্ত সব্‌ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার কন্যাটিকে দারোগা মহাশয় উন্মাদগ্রস্ত দেখিতে পাইয়া নিকটবর্ত্তী এক বৈষ্ণবজাতীয়া প্রাচীনা গৃহস্থ রমণীর বাটীতে রাখিয়া দিয়াছেন, এবং গ্রামের মাতব্বরগণের উপর উন্মাদিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়াছেন, প্রত্যহ নিজেও তথায় উপস্থিত হইয়া খোঁজখবর লইয়া আসেন। কন্যার পিতা কন্যাটীকে পাইয়া মহাসন্তোষলাভ করিলেন এবং আসিবার সময়ে দারোগাবাবুর নিকট সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে বৃদ্ধ দারোগাবাবু কহিলেন,—

"মহাশয়, আমি এই উন্মাদিনী বালিকাটীকে দেখিয়াই ভদ্র গৃহস্থকন্যা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। এজন্য থানায় না রাখিয়া গৃহস্থপল্লীতে রাখিয়া দিলাম। যখন এই কন্যাটির বিবরণ ডায়েরীভুক্ত করিয়াছি, তখন ইহাকে পুলিশের হেফাজতে রাখাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কারণ ইহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিলে আমার সমূহ বিপদ্। কিন্তু আমি গৃহশূন্য ব্যক্তি, এখানে মাত্র কনষ্টেবলদিগের মধ্যে মেয়েটিকে রাখা অনুচিত, এজন্য বাধ্য হইয়াই আমি ইহাকে পল্লীমধ্যে রাখিয়া দিয়াছি।"

কন্যার পিতা কহিলেন, মহাশয় আপনি যথেষ্টই অনুগ্রহ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; তবে যদি কন্যাটিকে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে রাখিয়া দিতেন, তাহা হইলে আরও ভাল হইত।

দারোগা।—(বিরক্তভাবে) তাহা হইলে আপনার ও আপনার কন্যার সর্ব্বনাশ ঘটিত! দেখিতেছি আপনি প্রাচীন হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের সমাজবিষয়ে আপনার কি এখনও কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা জন্মে নাই? এই গ্রামটিতে অধিকাংশ লোকই নবশাখজাতীয় ব্যবসায়ী—ধর্ম্মভীরু ও নিরীহ, এবং ঐ বৈষ্ণবী পরিণতবয়স্কা, গ্রামস্থ সকল ব্যক্তিই উহাকে ভক্তি ও বিশ্বাস করে, উহারা সকলেই পুলিশকে যমের ন্যায় ভয় করে, তাই সর্ব্বরক্ষা; নচেৎ, যদি কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্রশিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির বাটীতে কন্যাটিকে

রাখিতাম, তাহা হইলে নিশ্চিতই সেই গৃহস্থ কর্ত্তৃকই উহার সর্ব্বনাশ ঘটিত। এই বৈষ্ণবীর বাটীতে এই কন্যা যথোচিত সতর্কে ও সযত্নে রহিয়াছে জানিবেন; তবে যদি উন্মত্ততাবস্থায় কদন্ন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে কোন সন্দেহ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গঙ্গাস্নান করাইয়া লইয়া যান। কিন্তু মহাশয়, আপনি কি কখন কোন সামাজিক বড় লোকের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ খান্ নাই? সে বড় লোক প্রত্যহই কি ব্রাহ্মণের হাতে খান্, না কখন কখন বাবুর্চ্চির হাতেও খান্? তাহা কি যথার্থ ই আপনি জানেন না, বা জানিয়াও জানেন না? সদন্ন ভিন্ন কদন্নভোজন কি আপনিও কখন করেন নাই? ধিক্ আমাদের সমাজকে! কেবল কপটাচার! আপনি আবার ব্রাহ্মণবাড়ীর কথা বলিতেছেন! বাওন কায়েতই আরও ভয়ানক! বাওন কায়েত হইলেও হয় না, ভদ্র হইলেও হয় না, শিক্ষিত হইলেও হয় না, চরিত্রবল ধর্ম্মভয় সে সব স্বতন্ত্র জিনিষ, তাহা বরং পল্লীবাসী অশিক্ষিত ছোট লোকের মধ্যে আছে, শয়তানের শিষ্যসংখ্যা শিক্ষিত ভদ্রসমাজে ও সহরবাজারেই অধিক!

কন্যার পিতা অবাক্ অধোবদন! কেননা, দারোগা বাবুর ব্যাহৃতি অনুসারে তিনি ত্রিপাপগ্রস্ত,—সহরবাসী, ব্রাহ্মণ, কিঞ্চিৎ শিক্ষিতও বটে! যাহা হউক, তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবারও কোন প্রয়োজন দেখিলেন না; অগত্যা অধিক বাক্যব্যয় ব্যতিরেকে কন্যাটিকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

বাস্তবিকই বর্ত্তমান যুগে আমরা অনেক বিষয়ে নিরক্ষর কৃষককে বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু এমনকি অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহা বড়ই কলঙ্কের কথা। আমরা অনেকেই কথায় পণ্ডিত, আচরণে ভূত!

কুরুচি ও অশ্লীলতা পাপে আমাদের জিহ্বা ও লেখনী আজ কাল বড়ই নির্লিপ্ত বটে, কিন্তু চিত্তে সে পাপ পূর্ণ চতুষ্পাদ! আচরণও তদনুযায়ী। অশিষ্ট শিক্ষাজনিত সুবুদ্ধিকৌশলে পাপগোপন করিবার শক্তি সবিশেষ জন্মিয়াছে। অগোচরে অস্বাভাবিক পৈশাচাচারে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লোক-সমক্ষে জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয়প্রদান পূর্ব্বক অনেক মহাত্মা বিদ্যাশিক্ষার সার্থকতা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। এই সকল মহাপুরুষই আবার সমাজে সাধুব্যক্তির দৈবাৎ বিন্দুমাত্র পদস্খলনে তীব্র সমালোচনা করিতে সতত অগ্রসর!

বলিতে গেলে, প্রায় শিশুকাল হইতেই বাঙ্গালীসন্তান অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-সেবায় আসক্ত হইয়া যৌবনারম্ভেই একপ্রকার পৌরুষহীন হইয়া পড়েন।

সাতিশয় শুক্রতারল্য, শিরোঘূর্ণন, মন্দদৃষ্টি, মনশ্চাঞ্চল্য, হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণালঙ্কৃত সুশিক্ষিত জরাগ্রস্ত বাঙ্গালীযুবক যথোপযুক্ত পণগ্রহণে একটি অশিক্ষিতা বাঙ্গালী বালিকার নিকট আত্মবিক্রয় করিলেন। এরূপ অবস্থায়, বালিকাটি যৌবন প্রাপ্ত হইলে যুবজানি বাবুজিউ, বি,এ বা এম্,এ পাশই হউন, সর্ব্বতোভাবে যে সেই যুবতীর মায়াপাশবদ্ধ করগত ক্রীড়ামর্কট হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তিনি শিক্ষাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া শাস্ত্রশাসন অমান্য করিয়া স্ত্রীমনোরঞ্জনার্থ নানাবিধ অবৈধ ব্যবহারকেই পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের পরিচায়ক ভাবিয়া তাহাতেই সমাসক্ত রহিলেন! মাষ্টারি ডাক্তারি ওকালতি হাকিমতি বা অন্য কোনরূপ অর্থকরী দাস্যবৃত্তির কৌশল তিনি বেশ শিখিয়াছেন। ক্রমশঃ তদুপায়ে যথাসম্ভব ধনমান উপার্জ্জনও হইতে লাগিল বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার পৈতৃক ধনে ক্রমশঃ বঞ্চিত হইয়া পৌরুষহীন কাপুরুষরূপে কামিনী-কাঞ্চনের দাসত্ব ও সামাজিক শত পাপের প্রশ্রয়দান করিতে লাগিলেন!

বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানগণের সাধারণ অদৃষ্টলিপি প্রায়শঃই এইরূপ। তবে অনেক অসাধারণ মহাপুরুষও যে এ যুগে বঙ্গমাতার শ্রীঅঙ্ক শোভিত করিতেছেন না, একথাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অনুপাতে অল্প। ফলতঃ,—বড়ই দুঃখের কথা, ইন্দ্রিয়াসক্তি ও স্বার্থপরতা বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন বড়ই অনুন্নত!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গে মাদকসেবন।

ভারতে মাদক সেবনের প্রথা চিরকালই প্রচলিত। তবে, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে মাদকসেবন শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ নিষিদ্ধ। কিন্তু ঊর্দ্ধরেতাঃ সিদ্ধদেহ মহাত্মগণ বিধিনিষেধের বহির্ভূত।

ইদানীং অনেকের বিশ্বাস যে, প্রাচীনকালে ঋষিগণ যে সোমরস পান করিতেন উহা একরূপ মদিরা মাত্র; কিন্তু সে কথা আদৌ অমূলক। সোমলতা নানাজাতীয়। তন্মধ্যে গোমসী নামক লতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনেক দিন অতীত হইল, কোন এক উদ্‌ভিৎতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিত হিমালয়প্রদেশে গিয়া বৃক্ষলতাদির পরীক্ষাব্যপদেশে বহুদিন ব্যাপিয়া শৈলারণ্যে অবস্থিতি করেন। তৎকালে উক্ত মহাত্মা নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি উপাখ্যান প্রকাশিত করিয়াছিলেন,—

"আমি সংস্কৃত শাস্ত্রে সোমলতার বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম। একদিন একাকী পর্ব্বতোপরি বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা একস্থানে পূতিকালতার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র লতা দেখিতে পাইলাম। আকৃতি দেখিয়াই আমার মনে হইল, এই বুঝি সেই সোমলতা! আমি লতাটির পত্রগুলি গণিয়া রাখিলাম। পরদিন ঠিক সেই সময়ে পুনরায় তথায় গিয়া দেখি, লতাটি ঠিক সেই স্থানে সেইরূপই আছে; কেবল, গণিয়া দেখি, একটি পাতা কম! এইরূপ প্রত্যহ দেখি, এক একটি করিয়া পাতা কমিতে লাগিল। ক্রমশঃ অমাবস্যার দিনে দেখিলাম, পাতা একটিও নাই, ডাঁটাটি মাত্র রহিয়াছে। পরদিন পুনরায় গিয়া দেখি, একটি মাত্র পাতা গজাইয়াছে। এইরূপে শুক্ল পক্ষের প্রত্যক দিনেই দেখিতে লাগিলাম, একটি করিয়া নূতন পাতা গজাইতে লাগিল। পূর্ণিমার দিনে দেখি, পনরটি সরস পত্রে লতাটি সুশোভিত হইয়াছে। পুনরায় কৃষ্ণপক্ষের প্রত্যেক দিনে একটি করিয়া পাতা ঝরিতে ঝরিতে অমাবস্যার দিনে পত্রহীন দণ্ডটিমাত্র রহিল।

এইরূপে তিন চারি পক্ষ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহে বুঝিলাম, ইহাই সেই শাস্ত্রোক্ত সোমলতা বটে।

তখন আমি একদিন একটা কাচপাত্র লইয়া গিয়া ঐ লতাটির ডগা ভাঙ্গিয়া

একটু রস লইয়া আসিলাম, এবং আমার মুরগীর পালে একটি পালখহীন অতিবৃদ্ধা মুরগীকে ঐ রসের কিয়দংশ খাওয়াইয়া দিলাম, আর আমার বাসায় যে বৃদ্ধা আয়া ছিল তাহাকে দাওয়াই বলিয়া দুগ্ধের সহিত অবশিষ্টাংশ পান করাইলাম।

দিন কয়েক বাদে দেখি, প্রাচীনা মুরগীটার গায়ে পালখ উঠিতে আরম্ভ হইল; ক্রমে দেখি, তাহার যৌবনশ্রী প্রকাশ পাইল, এবং সে পুনরায় ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করিল!

এদিকে—কি অশ্চর্য্য,—আমার আয়া-বুড়ী দেখি ক্রমে যুবতী হইয়া উঠিল! তাহার গাত্রের মাংসচর্ম্ম লোলতাপরিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার লাবণ্য পরিগ্রহ করিল, শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, পতিত বক্ষোজদ্বয় পুনরুত্থিত হইল! বৃদ্ধা লজ্জায় মস্তক ও গাত্র সর্ব্বদাই বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখে, এবং কোন মতেই আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে চাহে না।

আমি একদিন তাহাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আহ্বান করিলাম; সে কিছুতেই আসিল না। তখন আমি তাহাকে ধমকাইয়া কহিলাম,—তুমি এখন এরূপ অবাধ্য হইয়াছ কেন? শীঘ্র আমার আদেশ পালন কর।

বুড়ী বড়ই শঙ্কিতভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি কহিলাম,—তুমি ওরূপ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়াছ কেন?

বুড়ী।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) হুজুর, আমার এ কি রোগ হইয়াছে! এই দেখুন, আমি বুড়া মানুষ, আমার শরীর আবার কিরূপ হইয়াছে! এই জন্য, হুজুর, লজ্জায় আমি আপনার সম্মুখে আসিতে পারি না।

এই বলিয়া বৃদ্ধা অঙ্গাবরণ মোচন করিল; চাহিয়া দেখিলাম,—যথার্থই বটে! কি বিচিত্র রসায়ণ-শক্তি! বৃদ্ধা প্রকৃতই যুবতী হইয়াছে!

ভয়াকুলাকে অভয়দানে কহিলাম,—তোমার ভয় নাই! সাবধান থাকিও, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। আমি তোমাকে যে দাওয়াই দিয়াছিলাম, তাহাতেই এরূপ হইয়াছে।

আমি কিন্তু ইত্যবসরে প্রায় প্রত্যহই বনমধ্যে সেই লতাটি দেখিয়া আসিতেছি। পরে, একদিন ভাবিলাম,—চারাটি তুলিয়া লইয়া একটা টবে পুঁতিয়া রাখিয়া দেই; কোন বোটানিকাল্ গার্ডেনে দিব।

এই ভাবিয়া একটি টবে মাটি পুরিয়া একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে লোক সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে গিয়া দেখি,—সে চারা আর সেস্থানে নাই! যেন কে এই

মাত্র উহা তথা হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে! স্থানটিতে তখনও খনন-চিহ্ন বর্ত্তমান!

আমার বড় বিস্ময়বোধ হইল। সেই জনমানবহীন নিবিড় জঙ্গলেও কে যেন কোথায় থাকিয়া আমর গতিবিধি ও ক্রিয়াকপাল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, এবং ঠিক উপযুক্ত সময়েই চারাটি সরাইয়া লইয়া গিয়াছে!

এই আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সোমরস মাদক নহে, মহারসায়ণ মাত্র। সাধকগণ সাধনোপযোগী অজরত্বলাভার্থই উহা পান করিতেন।

যাহা হউক, প্রাচীনকালে ভারতবাসী আর্য্যগণের মধ্যে সুরাদি মাদক-সেবনের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশেও বহুদিন হইতেই উহা প্রচলিত। ব্রাহ্মণগণেব পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ হইলেও বাঙ্গলার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সুরাপানপ্রথা সবিশেষ প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিক সাধক সুরাপান করিয়া প্রমত্ততার পরিচয় কদাচিৎ প্রদান করিতেন। তবে বিষয়াসক্ত ধনবান্ শক্তিমন্ত্রোপাসক বাঙ্গালীগণ সেকালে কালীপূজার রাত্রিতে সুরাপান করিয়া বড়ই ব্যভিচার করিতেন।

শুনা যায়, বঙ্গের স্বনামধন্য সঙ্গীতকার সাধকভক্ত রামপ্রসাদ সুরাপান করিতেন। সে যুগে অনেক তান্ত্রিক ভক্তমহাজনও উক্তরূপ আচারপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা কখনও প্রমত্ততার পরিচয় দিতেন না।

এক্ষণে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রসার হওয়ায় সাধনার্থ মাদকসেবনের প্রথা অনেক কমিয়াছে সত্য, কিন্তু অসাধক গৃহাশ্রমীর পক্ষে সুরাপান যে একবারেই নিষিদ্ধ, এ সংস্কারও দূর হইয়াছে। সুতরাং সাধারণে সুরাপান অবাধে প্রচলিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সময়ে শিক্ষিত সমাজে সুরাপান যেরূপ প্রচলিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে সেরূপ আর নাই। তবে এক্ষণে সাধারণতঃ অর্দ্ধশিক্ষিত দাস্যবৃত্তিধারিমণ্ডলে মাদকসেবনের বড়ই প্রবলতা দেখা যায়। বিশেষতঃ কলিকাতার অফিসর, কারিগর ও নৈশকর্ম্মচারী ইত্যাদি মহলে মদ, গাঁজা, ভাং, আফিং, চরস্, কোকেন্ এই সকল নেশা প্রচলিত হওয়ায় ব্যভিচারবৃদ্ধি, দারিদ্রবৃদ্ধি ও রোগবৃদ্ধি যথেষ্টই হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল লোকের নেশা অভ্যাস করিবার হেতুও যথেষ্ট আছে।

সকালে বেলা ৮টা ৯টা বাজিতে বাজিতে স্নানাহার করিয়া কাজে বাহির হইতে হইবে, আর সারাদিন পরিশ্রম করিয়া কেহ ৫টায়, কেহ ৬টায় কেহ কেহ

বা রাত্রি ৮।৯ টার সময়ে ফিরিবেন। প্রত্যহ এইরূপ পাশব পরিশ্রম কোন পাশবিক সঞ্জীবনীশক্তির আশ্রয় ব্যতীত মনুষ্যের পক্ষে প্রায়শঃই অসাধ্য। এই জন্যই এই সকল শ্রামিকদলে মাদকাসক্তি এত অধিক। এই সকল মাদকাসক্ত ব্যক্তি কি বিদ্যাবুদ্ধিতে, কি সামাজিক বা লৌকিকাচারে, কি ধর্ম্মচর্চ্চায়, কি শিষ্টাচার বা শিষ্টালাপে, কি পারিবারিক ব্যবহারে, একেবারেই পশুবৎ অনভিজ্ঞ, কিন্তু স্বস্ব কর্ম্মক্ষেত্রে ইহারা অনেকেই হয় ত সুদক্ষ কর্ম্মচারী, কার্য্যাধ্যক্ষের বড়ই প্রিয়পাত্র।

ইহা হইতে অনুমান করা যায়, দেশে কল কারখানা আপিস্ ইত্যাদির কাজ অর্থাৎ পশুবৎ অবিরাম কঠোর শ্রমশীলতার প্রয়োজন যতই বৃদ্ধি হইবে, মাদকসেবনের প্রয়োজনীয়তাও ততই বৃদ্ধি পাইবে, পারিবারিক অশান্তি দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে।

তবে, অফিসর কারিগর বা অন্যান্য শ্রেণীর শ্রামিকগণের মধ্যে যে সকলেই মাদকাসক্ত, এ কথা অবশ্যই অস্বীকার্য্য ; উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ নির্ম্মলচরিত্র ও ধর্ম্মশীল, যে তাঁহাদিগকে সমাজের অলঙ্কার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালীর মধ্যে যিনি যে কোন মাদকই সেবন করুন, পরিণামে প্রায় সকলেই বাধ্য হইয়া একমাত্র অহিফেনের আশ্রয় লইয়া থাকেন। বাঙ্গালী যতদিন চাকুরে, ততদিন অনেকে মদ্যপায়ী, চাকরী গেলে বা পেন্‌সন্ লইলে প্রায়ই অহিফেনসেবী ; কারণ তখন অল্প অর্থে অধিক কার্যসাধনের আবশ্যক। গাঁজার বিষয়েও ঐ রূপই দেখা যায়, বৃদ্ধবয়সে গাঁজা ভাং ইত্যাদি প্রস্তুত করা সকল সময়ে সুসাধ্য নহে, দুপয়সার আফিং কিনিয়া গালে ফেলিয়া দিলেই গোল মিটিয়া গেল।

কেহ বাত কেহ উদরাময় ইত্যাদির প্রতীকারকল্পেও অহিফেন সেবন করিয়া থাকেন। ইহাতে দেখা যায়, বর্ত্তমান বাঙ্গলা দেশে অহিফেনের রাজত্বই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক। অনেক অঞ্চলে বালক এবং স্ত্রীলোকেরাও অহিফেন ব্যবহার করিয়া থাকেন। কবিরাজ ডাক্তার মহাশয়েরাও আজকাল অনেকে অনেক সময়ে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণের রোগবিশেষের উপশমার্থ অহিফেন সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু এই কালকূট যে বাঙ্গালার কি মহানিষ্ট করিতেছে, তাহা রোগী বা বৈদ্য কেহই প্রণিধানপূর্ব্বক ভাবিয়া দেখেন না। হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য সঙ্কীর্ণতা ভীরুতা ক্রূরতা ইত্যাদি উৎপাদনে অহিফেনের অপূর্ব্বশক্তি। রোগবিশেষে—আরোগ্য নহে—উপশম প্রদানে ইহার শক্তি

থাকিতে পারে বটে, কিন্তু দৈহিক রোগ নিবৃত্ত করিতে গিয়া অন্তরের রোগ বাড়াইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিতে ইহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা।

রক্ষা এই যে, বর্ত্তমান সুশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে সুরা অহিফেন প্রভৃতি মাদকের প্রসার অতি কম।

বাঙ্গালী বড়লোক অর্থাৎ ধনবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে মাদকের প্রচলন কম নহে। তবে তাঁহাদের মন্দের ভাল এই যে, অনেকে আজকাল অতি সংগোপনে মাদক সেবন করিয়া থাকেন। গোপনে সবই করিবেন, অথচ বাহিরে জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন, এই ধূর্ত্ততাবুদ্ধি তাঁহাদের মধ্যে অনেকের দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, নিন্দার ভয় ও যশের প্রার্থনা সুমঙ্গলের চিহ্ন, সন্দেহ নাই। তবে আজকাল বাঙ্গালী বড়লোকের মধ্যে যথার্থই চরিত্রবান্ মহাত্মব্যক্তিরও অসদ্ভাব নাই।

গাঁজা আজকাল ধনী দরিদ্র সকল সমাজেই চলিতেছে। ইহাতে অনেক বাঙ্গালীর স্বভাব রুক্ষ করিয়া তুলিতেছে এবং যক্ষ্মা উন্মাদ প্রভৃতি রোগের প্রসারবৃদ্ধি করিতেছে। কলিকাতায় অর্দ্ধশিক্ষিত ধনোপার্জ্জনশীল ব্যক্তিগণ এবং অশিক্ষিত শ্রমজীবিগণের মধ্যে গাঁজার প্রচলন অনেক অধিক। সঙ্গীত-ব্যবসায়ী ও শিল্পব্যবসায়িগণের মধ্যেও গাঁজা বড়ই সমাদৃত। তাঁহারা স্ব স্ব মতানুসারে উহাকে বড়ই কার্য্যসাধিকা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু কালোয়াতজীই হউন্ আর স্বামীজী বা গোসাইজীই হউন, গাজার ব্যবহারে আপাততঃ যিনি যতই উপকার বা সুবিধা বোধ করুন না কেন, পরিণামে যে উহার বিষময় ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। বঙ্গদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে উন্মাদগ্রস্ত সমুদায় পুরুষসংখ্যার মধ্যে বোধ হয় প্রায় চারিভাগের তিন ভাগ গঞ্জিকাসেবনেই তথাবিধ বিকৃত-মস্তিষ্ক।

চা চুরুট তামাক এই তিন প্রকার দ্রব্য যদিও আব্গারি বিভাগের অন্তর্গত নহে, তথাপি উহারা যে মাদক বা নেশার মধ্যেই ধর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, ধাতুবিশেষে এক পেয়ালা চা-পানে সময়ে সময়ে এক আউন্স্ সুরাপানের ন্যায় উত্তেজনা জন্মিয়া থাকে।

তামাক বাঙ্গালী সমাজে এতই অভ্যস্ত হইয়াছে যে, উহাতে এখন আর শারীরিক কোন বিশিষ্ট অনিষ্ট অনুভূত হয় না। তথাপি উহা যে আদৌ অনিষ্টকর তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

বিড়ি বড়ই অপকারক। যে কোনদিন বিড়ি বা তামাক খায় নাই, এমন

একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালককে উপর্য্যুপরি দুই পাঁচদিন বিড়ি খাওয়াইলে দেখা যাইবে, তাহার শরীরের ও স্বভাবের ঘোর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ক্রমশঃ তাহার চক্ষু কোটরস্থ, মাংস ও চর্ম্ম শুষ্ক, শিরাসকল উদ্‌গত, গণ্ড ও তুণ্ড লাবণ্যহীন ও মাংসশূন্য, বাক্য কর্কশ এবং স্বভাব রুক্ষ ও অপ্রীতিকর হইয়া উঠিবে।

চা ও বিড়ি শারীরিক স্বভাবজ শ্লেষ্মাকে নিরুদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া আপাততঃ শরীরের জড়তা ভঙ্গ করিয়া সজীবতা সম্পাদন করে বটে, কিন্তু অতিমাত্রায় পরিণামে অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণতা যক্ষ্মা প্রমেহ প্রভৃতি উৎকট রোগ আনয়ন করে এবং মানবজীবনকে দুঃখময় ও স্বল্পস্থায়ী করিয়া ফেলে।

আমরা ঐ সকল বিষ সেবনের পরিপোষক প্রমাণ মাত্র ইহাই দেখিতে পাই ও দেখাইয়া থাকি, যে কোটি কোটি লোকে উহা সেবন করিয়াও ত সচ্ছন্দে সজীব সকর্ম্মা রহিয়াছে! যদি চা বিড়ি তামাক ইত্যাদি দ্রব্য বিশিষ্টরূপ অনিষ্টা-বহই হইত, তবে ত আজ বঙ্গদেশেই হউক, ভারতবর্ষেই হউক, আর সমগ্র ভূমণ্ডলেই হউক, সুস্থ সচ্ছন্দ লোক প্রায়ই দেখা যাইত না!

এতদুত্তরে অবাধে বলিতে পারা যায়,—হে বঙ্গবাসী, হে ভারতবাসী, হে ভূমণ্ডলবাসী কোটি কোটি মানব, গণিয়া দেখ দেখি,—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, তোমাদের প্রতিশতকের মধ্যে, প্রতি সহস্রের মধ্যে, প্রতি অযুতলক্ষনিযুতকোটির মধ্যে কয়টি লোক যথার্থই নীরোগ সুস্থ সচ্ছন্দ। গণিয়া দেখ দেখি, এরূপ লোক কয়টি আছেন, যাহাদের জীবনে যে কোন একটি বর্ষের মধ্যে অন্ততঃ এক দিনও অস্বাস্থ্য ভোগ না করিয়াছেন বা ঔষধ সেবনের প্রয়োজন না হইয়াছে। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য কাহাকে বলে, জরাজীর্ণ পৃথিবী তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। স্থূলকায় বা অস্থায়ী পাশব বীর্য্য বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যের অভিজ্ঞান নহে।

সংপ্রতি এই বিশ্বব্যাপী সনাতন অস্বাস্থ্যের নিদান এক মাত্র মাদক সেবন না হইলেও, ঐরূপ অসংখ্য নিত্তনৈমিত্তিক অত্যাচারের সমষ্টিই যে অন্ততঃ উহার সহায়ক হেতু বলিয়া পরিগণ্য হইতে পারে, বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

আজ কাল নবীন বাঙ্গালীদলে আবার সেই সে কালের বিদ্যালঙ্কারাদি প্রবীণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদলের ন্যায় নস্যগ্রহণপ্রথা বড় প্রবল দেখা যাইতেছে। নস্যগ্রাহী বালকদল স্বপক্ষসমর্থনার্থ বলিয়া থাকেন, নস্যগ্রহণে নাসাপথ মূর্দ্ধা প্রভৃতি নির্ম্মল পরিষ্কৃত থাকে। কিন্তু আমরা ত জানি, নস্যগ্রহণ অভ্যাস স্থায়ী হইলে, উহাতে নাসাপথ মূর্দ্ধা প্রভৃতি প্রদেশ সর্ব্বদাই ক্লেদপূর্ণ থাকে, এবং সেই

জন্যই সেকালের নস্যসেবী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ—"ওঁ গঙ্গা" বলিতে গিয়া "ওগ্ গগ্গা" বলিয়া ফেলিতেন। বস্তুতঃ নিত্য নস্যব্যবহারে নাসামস্তকাভ্যন্তরস্থ স্নায়ুমণ্ডলের পৌনঃপুনিক উত্তেজনা হেতু স্থায়ী অবসাদ আসিয়া পড়ে, এবং তৎফলে নানা রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

আধুনিক বাঙ্গালী ব্রাহ্মমণ্ডলে,—বড়ই আনন্দের কথা,—একমাত্র চা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত মাদক বা উত্তেজক দ্রব্যাদির ব্যবহার বড়ই বিরল। অনেকেই তাম্বুল পর্য্যন্তও সেবন করেন না। ওষ্ঠ তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত হওয়া অসভ্যতার চিহ্ন, অন্ততঃ উহা ইউরোপীয় রীতির বিরুদ্ধ, এবং তাম্বুল ব্যবহারে শব্দোচ্চারণের স্পষ্টতা নষ্ট হয়, এইরূপ ধারণাই অনেকের তাম্বুল ত্যাগের হেতু। বাস্তবিক কিন্তু ভোজনান্তে স্বল্পমাত্রায় তাম্বুলসেবন আচমন-মুখশুদ্ধিরই অঙ্গীভূত,—স্বাস্থ্য বই অস্বাস্থ্যকর নহে। তবে, রাত্রিকালে তাম্বুলসেবনের পর মুখ না ধুইয়া নিদ্রা যাওয়া অকর্ত্তব্য। পরিমিত মাত্রায় তাম্বুলসেবন জিহ্বার জড়তানাশক, জড়তাজনক নহে। মহর্ষি ব্যাসদেবও মহাভারতে লিখিয়াছেন,—"তাম্বুলেন বিনা রাজন্ জড়ীভূতা সরস্বতী"।

যাহা হউক, আমাদের ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাম্বুল ব্যবহার না করুন্, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, তাঁহারা এখন সাধারণতঃ যেমন মাদকত্যাগী, এইরূপ চিরদিন থাকিলে এ বিষয়ে তাঁহারা যে দেশের আদর্শস্থল হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিলে আরও সুমঙ্গল।

মাদকসেবনের কথা উঠিলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরৎকুমার লাহিড়ী-মহাশয়ের চরিতকথা মনে পড়ে। লাহিড়ীমহাশয় চা ভিন্ন অন্য কোন মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য সেবন করিতেন না; পানটি পর্য্যন্ত তাঁহাকে কদাচিৎ খাইতে দেখিয়াছি। তিনি মাদকসেবীর সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিতেন; অথচ—

একদিন কোন প্রয়োজন বশতঃ রাত্রি ৯টার সময়ে শরৎ বাবুর হারিসন্রোড-স্থিত ভবনে গিয়া দেখি,—বাহিরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমিও গিয়া চুপ করিয়া বসিলাম। দেখিতে লাগিলাম, লোকটি ঘন ঘন হাঁই তুলিতেছেন আর চোক ডলিতেছেন, যেন তাঁহার শরীরমধ্যে কি একটা দারুণ উপসর্গ বোধ হইতেছে,—স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। কিয়ৎক্ষণ পরেই শরৎবাবু আসিয়া উপস্থিত!

অমনি সেই লোকটি শরৎবাবুকে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—অনুগ্রহ পূর্ব্বক এদিকে আসিয়া একটি কথা শুনিয়া যান্।

শরৎবাবু লোকটির সহিত ভিতরের বারান্দায় গেলেন। লোকটি তাঁহার সহিত সংগোপনে অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলে, শরৎবাবু মনিব্যাগ্ খুলিয়া তাঁহার হাতে কি দিলেন,—খুব সম্ভব, টাকা না হয় পয়সা। অমনি ভদ্রলোক মহা উৎসাহে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পরক্ষণেই শরৎবাবু আমার নিকটে বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“ব্যাপার কি?” শরৎবাবু বলিতে অনিচ্ছুক। আমি কিন্তু নছোড়!

তখন তিনি প্রকাশ করিলেন,—“ঐ ভদ্রলোক কোন সম্ভ্রান্ত কুলের সন্তান; সঙ্গদোষে নেশাখোর! প্রত্যহ প্রায় সিকি ভরি আফিংএর আবশ্যক!”

“তার পর?”

“তার পর, আজ আফিংও নাই, পয়সাও নাই। করি কি, কিছু দিলাম।”

আমি শরৎবাবুর অন্তর্ভাব বিলক্ষণ জানিতাম; কিঞ্চিৎ কপট বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক এরূপ অবৈধদান হেতু তাঁহাকে ইঙ্গিতে তিরস্কার করিলাম।

মহাত্মা শরৎকুমার অপ্রতিভ হইয়া কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন,—

“কি করি, বেচারা বিষ খাইতে শিখিয়াছে; এখন না পাইলে মরে। দেওয়া উচিত নহে, সে কথা সত্য মানি; কিন্তু উহার যে এখন কষ্টে প্রাণ যায়! আমি আজ রাত্রিতে ভাত না খাইলে বাঁচিব, কিন্তু আফিং না খাইলে উহার মৃত্যুযন্ত্রণা! এজন্য আপাততঃ আফিং দিয়া উহার কষ্ট দূর করিয়া পরে আফিং ছাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত। ফল কথা, যিনি যাহাই বলুন, মানুষের ওরূপ ক্লেশ ও কাতরতা দেখিলে না দিয়া থাকা যায় না। এবিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন। এটি আমার বড়ই দুর্ব্বলতা।”

শরৎবাবুর এইরূপ সকরুণ স্বীকারোক্তি শুনিয়া আমার তৎকালে বড়ই আনন্দানুভব হইল।

আমি ততই যেন উগ্রমূর্ত্তি গুরুমহাশয়বেশে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলাম,—“আপনার পয়সা আপনি দিবেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু জানিবেন, ইহাতে আপনার দান বা দয়া—কোন ধর্ম্মই হইতেছে না, হইতেছে কেবল পাপের প্রশ্রয়দান ও সমাজের ঘোর অনিষ্টসাধন।”

শরৎবাবু আমার তীব্র সমালোচনা শুনিয়া অপরাধী বালকের ন্যায় ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া কেবল কাতর ভাবে “তা' বটে, তা' বটে,” বলিয়া প্রকারান্তরে মাত্র আমার প্রসাদ ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; আমি তৎকালে তাঁহার সেই অকৃত্রিম বালকত্ব ও অকপট দীনতা দেখিয়া অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ উপভোগ

করিতে লাগিলাম, আর মনে মনে তাঁহার সেই মহাজনোচিত সহজ কারুণ্য-ধর্ম্মের শত ধন্যবাদ, আর আমার সেই পুস্তকাভ্যস্ত পাষণ্ডোচিত কপট পাণ্ডিত্যের শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

শরৎকুমারের তৎকালীন কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গিতে আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আমার ন্যায় মলগ্রাহী সমালোচকদলের ভয়ে এরূপ দান অতি সংগোপনেই করিয়া থাকেন, কিন্তু আজ দুর্ভাগ্যক্রমে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

সেই অহিফেনসেবী ভদ্রলোককে আমি তৎপরেও মধ্যে মধ্যে শরৎবাবুর বাটীতে ভোজন করিতে দেখিতাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, পাচক ও পরিচারক-গণের প্রতি শরৎবাবুর আদেশ আছে, দিবাভাগেই হউক আর রাত্রিতেই হউক যখনই তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়া অন্নপ্রার্থী হইবেন, তখনই যেন চারিটি অন্ন পান।

অনেক দিন পরে একদিন দেখি, শরৎবাবু সন্ধ্যাকালে বাহিরের ঘরে মুদ্রিত নয়নে বসিয়া আছেন, ঘরে আর কেহই নাই, কেবল সেই ভদ্রলোক পার্শ্বে বসিয়া নিমীলিত নেত্রে ভক্তিভরে গাইতেছেন,—

"যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেওনা প্রভু।
যদি কোন দিন এ বীণার তারে, তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া করে তুমি ক্ষণেক দাঁড়াও, ফিরিয়া যেওনা প্রভু।
তব আহ্বানে যদি কভু মোর, নাহি ভেঙ্গে যায় সুপ্তির ঘোর,
বজ্রবেদনে জাগাও আমায়, ফিরিয়া যেওনা প্রভু।
যদি কোন দিন তোমার আসনে, আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেওনা প্রভু।"

অহিফেনসেবীর সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও অপূর্ব্ব ভক্তিগদ্‌গদভাব দেখিয়া তৎকালে আমার ইচ্ছা হইল তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করি। পরে পরিচয় পাইলাম, তিনি যেমনই সম্ভ্রান্ত কুলের সন্তান, তেমনই কোন এক সম্ভ্রান্ত কুলের জামাতা; লেখাপড়াও বেশ জানেন, কিন্তু সঙ্গদোষে নানাবিধ মাদকাসক্ত হওয়ায় উভয় কুল হইতেই বহিষ্কৃত,—অগত্যা একরূপ পথের ভিখারী। সংপ্রতি শরৎবাবুর কৃপায় ভদ্রলোক ক্রমশঃ আবার সৎপথে ফিরিতেছেন, অন্যান্য মাদক পরিত্যাগে একমাত্র আহিফেনের উপরেই নির্ভর, তাঁহারও মাত্রা আপাততঃ অতি কম!

ইহার অল্প দিন পরেই শরৎবাবুর দেহত্যাগ ঘটে। সে ভদ্রলোক এখন কোথায় কি ভাবে আছেন জানি না; কিন্তু এ কথা মানি বটে যে, যদি মহাত্মা শরৎকুমার লাহিড়ী আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তবে সেই পতিত ভদ্রসন্তানের নিশ্চিতই পুনরুদ্ধার হইত।

মাদকে আসক্ত হইয়া শিক্ষিত ভদ্রসন্তানও অবশেষে অপকৃষ্ট চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত সুবিরল নহে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গের বর্ত্তমান শিক্ষাবিধান।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে যে শিক্ষাবিধানের অসদ্ভাব ছিল, তাহা নহে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বালকগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু-সন্নিধানে ব্রহ্মবিদ্যা যুদ্ধবিদ্যাদি শিক্ষা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সময়েও বিদ্যাভ্যাসের সবিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মুশলমান রাজত্বকালেও, রাজকৃত সবিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলেও, ভারতে বিদ্যাশিক্ষার অভাব ছিল না। বঙ্গদেশেও সে সময়ে অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিতেন। এক নবদ্বীপেই শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী নানা শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিত। এই সকল ছাত্রও অনেকাংশে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ থাকিত। তখনও সরস্বতী এখনকার মত সম্পূর্ণ রূপে কমলার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন নাই। তখন বঙ্গদেশে কেবল ধনোপার্জ্জনের নিমিত্তই লোকে বিদ্যাদেবীর আরাধনা করিত না। দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতগণও তখন দারিদ্রপীড়নে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মাত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনেই জীবনাতিপাত করিতেন। একরূপ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনেই অন্নসংগ্রহ করিয়া তাঁহারা তদ্দ্বারা স্ত্রীপুত্র ছাত্রাদির প্রতিপালন করিতেন। ঐশ্বর্য্য বা বিলাসিতার দিকে তাঁহাদের দৃক্‌পাতও ছিলনা, অথচ সমাজে তাঁহাদের সম্মান প্রতিপত্তিও যথেষ্টই ছিল। বঙ্গের অদ্বিতীয় অধ্যাপক স্মার্ত্তগুরু রঘুনন্দনের ধনহীনতা বিষয়ে প্রবাদ অছে যে,—

একদিন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্নী কলসীকক্ষে গঙ্গার ঘাটে জল আনিতে গিয়াছেন, সেই সময়ে আরও অনেক কুলমহিলা সেই ঘাটে উপস্থিত। সকলেই দেখিলেন, স্মার্ত্তপত্নীর উভয় হস্ত বলয়শঙ্খাদির পরিবর্ত্তে দুইখানি সূক্ষ্ম লোহিত বস্ত্রখণ্ডে মণ্ডিত রহিয়াছে!

মহিলাগণ সবিস্ময়ে কহিলেন,—আহা একি! সধবা হইয়া হাতদুখানি একেবারে খালি রাখিয়াছ! দুইটি রুলি কি দুগাছা শাঁখাও কি যুঠে নাই! ওমা, স্মার্ত্তমহাশয়ের স্ত্রীর কেন এ দুর্দ্দশা! ছি ছি, স্মার্ত্তমহাশয়ের কি একেবারেই কিছু নাই! তিনি এত বড় পণ্ডিত হইয়া এসকল বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত

করেন না! ছি ছি ছি! দুই হাতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বাঁধা! ইহারই স্বামী আবার এত বড় পণ্ডিত! ধিক্ অমন পাণ্ডিত্যে!

পতিনিন্দা সতীর অসহ্য হইয়া উঠিল। স্মার্ত্তপত্নী সগৌরবে উত্তর করিলেন,—"দেখ, আমার এই ছেঁড়া নেকড়ার মূল্য তোমাদের ঐ সকল শঙ্খ বা স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার অপেক্ষা অনেক অধিক! আমার হাতের এই রাঙ্গা নেকড়া যে দিন খুলিবে, সে দিন জানিবে,—একা আমি নই,—সমগ্র বাঙ্গলা দেশ বিধবা হইবে।" স্ত্রীগণ অধোবদন!

এই সময়ে নবদ্বীপের ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থিগণ নিজেরাই রন্ধনাদি করিতেন, মধ্যাহ্নে মাত্র নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিতেন, রাত্রিতে কিঞ্চিন্মাত্র ফলমূলদুগ্ধাদি সেবন করিয়া থাকিতেন। সকলেই প্রাতঃস্নায়ী, নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি সকলেই করিতেন। তাঁহাদের শরীর সাধারণতঃই নীরোগ লাবণ্যময় ও তেজঃসম্পন্ন। তাঁহারা বেগুনি ফুলরী, জিলাপী কচুরী, সোডালেমনেড্, মৎস্য মাংস খাইতে পাইতেন না সত্য, কদলীপত্রে শাকান্ন ও কলার খোলায় দাইলতরকারি ভোজন করিতেন, কিন্তু সংযম, সদাচার, ভগবদর্চ্চনা, দুগ্ধঘৃত সেবন ইত্যাদি জনিত পবিত্রশ্রী তাঁহাদের আপাদমস্তক সর্ব্বশরীরে বিরাজমান। গুরু তাঁহাদের পিতা, গুরুপত্নীই তাঁহাদের মাতা। অসার আমোদপ্রমোদে সকলেই বিরত; সদাই পরস্পর শাস্ত্রালাপ; সকলেই সকলের সহায়। জাহ্নবীকূলে ত্রিসন্ধ্যা সহস্র সহস্র কণ্ঠে স্তবমালা-পাঠ! জাহ্নবীজলে সহস্র পুষ্পমাল্য তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে! এই আনন্দের দিনেই নদিয়ায় গৌরনিত্যানন্দের উদয়। অপূর্ব্ব অকৈতব প্রেমে দু'ভাই হরি বলিয়া নৃত্য করিলেন, নবদ্বীপ সে নৃত্যে, সে প্রেমতরঙ্গে নাচিল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশ নাচিয়া উঠিল! প্রেমের ঢেউ ক্রমে বঙ্গ হইতে উৎকলে, উৎকল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে, বৃন্দাবন হইতে রামেশ্বরসেতুবন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল! সেই দিনই এ বঙ্গের শেষ শুভদিন!

বঙ্গের সৎ-শিক্ষাবিধানও সেই অবধি সাঙ্গ। ইহার পর হইতেই ক্রমশঃ শিক্ষকশিক্ষার্থিগণ ধনোপাসক হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপকগণ সর্ব্বত্র শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া বিদায় অর্থাৎ পাণ্ডিত্যানুসারে প্রণামী বা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন; কেহ কেহ জমিদারগণের নিকট বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন; তদ্ব্যতীত অনেকে পৌরহিত্য বা মন্ত্রদান ব্যবসায় করিতেন। এই সকল ব্যবসায় দ্বারা যে উপার্জ্জন হইত, তদ্দ্বারা স্ত্রীপুত্র ও ছাত্রাদির অন্নসংস্থান করিতেন।

জমিদার ও ধনশালী ব্যক্তিগণও বাহাদুরি দেখাইয়া পরস্পর পাল্লা দিয়া দানসাগর শ্রাদ্ধাদি করিতেন, এবং তদুপলক্ষ্যে অধ্যাপকগণকে এবং তাঁহাদের ছাত্রগণকে পর্য্যন্ত ধনদান করিতেন। বাঙ্গালীর সমাজে এরূপ যত শ্রাদ্ধমহোৎসব হইয়াছে তন্মধ্যে পাইকপাড়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ স্বনামপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত মহাত্মা লালাবাবুর পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ লর্ড হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। তখন রাজস্ববিভাগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না; পাঁচ বৎসর অন্তর নূতন বন্দোবস্ত হইত। এই নূতন বন্দোবস্ত উপলক্ষ্যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ জমিদারগণের নিকট তৈলবট স্বরূপ বহু অর্থ পাইতেন। শুনা যায়, এইরূপ সদুপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়ার্থ গঙ্গাগোবিন্দ মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। এই শ্রাদ্ধে নাকি দধি দুগ্ধ ঘৃতাদির পৃথক্ পৃথক্ সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাজ মহারাজ প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র মহারাজ শিবচন্দ্রও নিমন্ত্রিত হইয়া এই শ্রাদ্ধে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

মহারাজ শিবচন্দ্র এই সমারোহ ব্যাপার দেখিয়া সহাস্যে কহিলেন,—"দেওয়ানজী, এ যে দক্ষযজ্ঞব্যাপার দেখিতেছি!"

গঙ্গাগোবিন্দও সহাস্যে উত্তর করিলেন,—"মহারাজ, এ ব্যাপার দক্ষযজ্ঞ অপেক্ষাও গুরুতর।"

এই আত্মশ্লাঘাসূচক উত্তর শুনিয়া শিবচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত প্রশ্ন করিলেন,—"সে কিরূপ?"

গঙ্গাগোবিন্দ সবিনয়ে কহিলেন,—"আজ্ঞে, দক্ষযজ্ঞে আয়োজন অনেক হইয়াছিল বটে, কিন্তু শিবের আগমন হয় নাই, আমার এখানে শিব (অর্থাৎ মহারাজ শিবচন্দ্র) স্বয়ং আসিয়াছেন!"

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আরও দুইটি ব্যাপার উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বহুধন দান করিয়াছিলেন। প্রথমটি বেলুড় গ্রামে নিজভবনে পুরাণপাঠ, দ্বিতীয়টি নিজ পৌত্রের (লালাবাবুর) অন্নাশন। শেষোক্ত ব্যাপারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে স্বর্ণপত্রে খোদিত লিপি প্রদান পূর্ব্বক নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল।

সেকালে এই সকল সমারোহব্যাপারে সমুপস্থিত অধ্যাপকমণ্ডলী সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যসভাস্থলে পরস্পর ব্যাকরণ সাহিত্য স্মৃতি ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের বিচার ও

বাদানুবাদ করিয়া স্ব স্ব পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠা করিতেন, এবং এই প্রতিষ্ঠানুসারেই কর্ম্মকর্ত্তার নিকট বিদায় বা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। প্রতিষ্ঠা ও ধনলাভার্থ বিদ্যোপার্জ্জন-প্রবৃত্তি এই হইতেই বঙ্গে বহুল প্রবৃত্ত!

জিগীষাবশে শাস্ত্রের অসদর্থ প্রতিপাদন, ধনলোভে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রদান, ইত্যাদি বহুদোষ ক্রমশঃ বঙ্গের বিদ্বৎসমাজকে বিদূষিত করিতে লাগিল, এবং এইরূপে বঙ্গসমাজে শিক্ষার ব্যভিচার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পূর্ব্বকালে কেবল যে ব্রাহ্মণবালকগণই বিদ্যাশিক্ষা করিতেন তাহা নহে; বৈদ্য কায়স্থ ও ক্বচিৎ যোগী (যুগী) প্রভৃতি বংশের বালকগণও অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ অভিধান নিদান প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ক্রমশঃ নবাবি রাজত্বের প্রসারের সহিত সকল জাতীয় বাঙ্গালীই অর্থোপার্জ্জন প্রত্যাশায় সুযোগমতে আরবিক পারসিক প্রভৃতি তদানীন্তন রাজভাষা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। বঙ্গে বিত্তার্থিনী শিক্ষার ক্রমশঃই প্রসারবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

অতঃপর ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ। ইংরাজ রাজপুরুষ ইংরাজ বণিক্, এ সকলেরই নিকট ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞের যথেষ্ট সমাদর হইতে লাগিল। সে সময়ের ইংরাজি শিক্ষার সেই এক স্বতন্ত্র প্রণালী ছিল। যিনি অন্ততঃ দুইশত ইংরাজি শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ জানিতেন, তিনিই ইংরাজপ্রসাদে দু'দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন। যাঁহারা পাঁচ শত বা হাজার শব্দ শিখিতে পারিতেন তাঁহারা তৎকালে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিতেন। শুনা যায়, এই সময়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রামদুলাল সরকার বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরাজি ভাষায় চিঠির মুশবিদা লিখিয়া দিতেন, কেরাণীরা ঐ চিঠি ইংরাজি অক্ষরে নকল করিয়া যথাস্থানে পাঠাইতেন।

ক্রমে সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট্ দেশীয়গণের শিক্ষা বিধানার্থ বহুচেষ্টা ও বহুলঅর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট্ যদিও জ্ঞানালোক প্রদানের নিমিত্ত ও আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবার নিমিত্তই শিক্ষাবিস্তারে সমুদ্যত, আমরা কিন্তু মাত্র প্রতিষ্ঠা ও অর্থ কামনা করিয়াই শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হইলাম। শিক্ষিত হইয়া হাকিম হইব, উকিল হইব, ডাক্তার হইব, সওদাগরি আফিসের মুৎসুদ্দি হইব, তৎকালে এইরূপই আমাদের শিক্ষার সাধারণ সঙ্কল্প। চরিত্রসংশোধন, সাধুতাবলম্বন, সত্যপালন প্রভৃতি সৎসঙ্কল্প মাত্র মুখেই রহিল, অন্তরের মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু ঐশ্বর্য্যলাভ!

দেশীয় জীবন প্রধানতঃ বিদ্যাশিক্ষা ও চাকরী এই দুই কর্ম্মেই পর্য্যবসিত

হইতে লাগিল। এই দুই কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষেই মানবজীবনের সাফল্যবৈফল্য নির্ভর করিল। জাতি ধর্ম্মঅবস্থা প্রভৃতির নির্ব্বিশেষে বঙ্গবাসীমাত্রেই স্ব স্ব পুত্রগণকে ঐ দুই কর্ম্মার্থেই প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। দিন দিন দেশে দাসসংখ্যা ও শিক্ষিতসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে শিক্ষা ও শ্ববৃত্তির পরস্পর পরিমাণ-বৈষম্য উপস্থিত! প্রয়োজনীয় দাসসংখ্যা অপেক্ষা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক দাঁড়াইল। ভিক্ষাভাবে শিক্ষা যেন প্রভাহীন প্রভাত-চন্দ্রের ন্যায় ম্রিয়মাণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। শিক্ষিতগণ যখন দেখিতে লাগিলেন যে, অর্দ্ধশিক্ষিতগণও পূর্ব্ব হইতে চাকরী আরম্ভ করিয়া অনায়াসে নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন, অথচ তাঁহারা স্বয়ং সুশিক্ষিত হইয়াও অন্নাভাবে অনশন অবমাননা ভোগ করিতেছেন, তখন তাঁহারা ক্ষিপ্তচিত্তে অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী হইতে লাগিলেন; নিজ নিজ অন্তরের ঈর্ষাঅশান্তি তাঁহারা দেশময় প্রসারিত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা রাজবিধানে বিপ্লব ঘটাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বৈদেশিক শিক্ষাবিকারে তাঁহাদের চিত্ত সততই দম্ভদ্রোহপরায়ণ; কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতাভিমান সততই তাঁহাদের চিত্তে ক্ষোভ উপস্থিত করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের অনুকরণে তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন দেশের রাজনৈতিক স্বত্বে স্বত্ববান্ বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কেহ দেশে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে, কেহ বা হয়ত প্রজাতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেও প্রয়াসী! ফলতঃ তাঁহারা পাশ্চাত্য ইতিহাস অবলম্বনে কল্পনাকাশে কেল্লা বাঁধিয়া কেহ গ্যারিবল্ডি কেহ ওয়াসিংটন কেহ বা মেজিনি সাজিয়া বসিতে লাগিলেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতিপাদবিক্ষেপের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহাদের অন্তরের হলাহল ক্রমে দেশময় ছড়াইতে লাগিলেন। উদার ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া আমাদিগকে মুদ্রাযন্ত্রের ও বাগ্‌যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলেন, অকৃতজ্ঞ আমরা সে দানের অপব্যবহার করিয়া গ্রন্থ সংবাদপত্র ও বক্তৃতাদি দ্বারা রাজপ্রতিদ্বন্দ্ব প্রচার করিতে লাগিলাম।

গবর্ণমেণ্ট সহৃদার সাম্যনীতির অনুসরণ পূর্ব্বক জাতিপ্রকৃতি নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণকে সমভাবে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষালাভে অধিকার উৎসাহ দান করিলেন, আমরা নিজ নিজ জাতি ও প্রকৃতি অনুসারেই সদসদ্ অর্থ পরিগ্রহ করিলাম। যে বেদ ব্রাহ্মণঋষিতপস্বিগণের সাধনসর্ব্বস্ব, আমরা শ্ববৃত্তিধারী দম্ভাহঙ্কারমত্ত স্বার্থপরায়ণ হইয়া সে বেদ বুঝিলাম কৃষকের গানমাত্র! যে "নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং" "শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতং" শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথালাপে শ্রীমদ্ অদ্বৈতগোস্বামী

নবদ্বীপধামে একদিন শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের অপূর্ব্ব লীলাভিনয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন, আজ অন্নাভাবে শূন্যোদর, স্বাস্থ্যাভাবে ভগ্নদেহ, সংযমাভাবে পশুস্বভাব, কল্পিতজ্ঞানালোকের ঝলকে অন্ধীভূত আমরা অনধিকারে অধিকারী হইয়া, স্বেচ্ছাপ্রলাপের সুন্দর অবসর পাইয়া সপ্রমাণ করিলাম যে, সে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা কুৎসিতরসাশ্রিত অতএব অপাঠ্য, অথবা উহা সকলই মিথ্যা, রূপক-বর্ণিত অধ্যাত্মপরিচয় মাত্র! যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা মৃতের সদ্‌গতিকামনায় শ্রাদ্ধাদিতে পর্য্যন্ত অধীত হইত, যাহার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে কথিত হইয়াছে,—"গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ", যাহাতে বাসুদেব স্বয়ং কহিতেছেন,—"উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্, ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্," সেই গীতাপাঠে আমরা রাজদ্রোহিতা গুপ্তহত্যা দস্যুতা প্রভৃতি ঘৃণিত ব্যবসায়কেই পরম পৌরুষকর বলিয়া জ্ঞান করিলাম! আমরা দুর্ম্মতিগ্রস্ত, শাস্ত্রপাঠ আমাদিগের পক্ষে ভুজঙ্গের পয়ঃপানবৎ হইল। এই জন্যই যে, ঋষিগণ বিশিষ্ট সৎপাত্র ব্যতীত সাধারণকে বিশিষ্ট বিশিষ্ট শাস্ত্রপাঠের অধিকার প্রদান করেন নাই, তাহা এখন বোধ হয় অনেকের বোধগম্য হইতেছে। আমরা আজকাল যতই উচ্চশিক্ষাভিমানী হই না কেন, সকলেই যে সমান সৎপাত্র ও সর্ব্বাধিকারী, সে কথা কখনই স্বীকার্য্য নহে।

উপদেশ অপেক্ষা আদর্শই শিক্ষাবিষয়ে সমধিক কার্য্যকর। এই হেতুই প্রাচীনভারতে শিষ্যগণ সতত গুরুসন্নিধানে বাস করিতেন। এক্ষণে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরাজ। ইংরাজ চেষ্টা করুন আর নাই করুন, আমাদের সাধারণ চেষ্টা কিন্তু সর্ব্ববিষয়েই ইংরাজের অনুকরণ। যতদিন ইংরাজ রাজা, ততদিন ভারত-প্রজা জ্ঞাতসারেই হউক অজ্ঞাতসারেই হউক, ইংরাজের অনুবর্ত্তী। অতএব ইংরাজ নিজ চরিত্রাদর্শ দেখাইয়া, জ্ঞানবিজ্ঞান-মুকুটমণ্ডিত ইংলণ্ড স্বীয় আচারবিচারে পথ দেখাইয়া, উক্ত কুপ্রবৃত্তি নিবারণ কবিতে প্রয়াস না পাইলে, আমাদিগের আর পরিত্রাণ নাই। স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ প্রভৃতি শব্দ আমরা বেদপুরাণে দেখি নাই শিখি নাই, তৎপ্রতি সর্ব্বজনীন লালসা আমাদের ছিল না। এসকল রোগ পাশ্চাত্য শিক্ষাসূত্রেই এ দেশে আসিয়াছে। যে সাধারণ প্রবৃত্তিবশে পাশ্চাত্যপ্রদেশে রাজতন্ত্রনীতির প্রসার ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়াছে, যে প্রবৃত্তিবশে তথায় ইতস্ততঃ কিয়দংশ প্রজালোক সংগোপনে অরাজকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী, সেই সংক্রমিত প্রবৃত্তিবশেই আজ আমরা প্রজা হইয়া রাজার,—পুত্র হইয়া পিতার,—শিষ্য হইয়া গুরুর গুণদোষবিচার করিতে,—

তাঁহাদের স্বত্বাংশভাগী হইতে যেন পরোক্ষে প্রয়াসী! যদি যথার্থই শিক্ষাসূত্রে এই দুষ্প্রবৃত্তির সংক্রমণ হইয়া থাকে, তবে সুধু এ দেশের নহে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা-বিধানেও সংস্কারসাধন অতীব কর্ত্তব্য।

প্রজাতন্ত্র রাজত্ব, স্বায়ত্ত শাসন, স্বরাজ, স্বাধীনতা প্রভৃতি শব্দগুলি, ভাবিয়া দেখিলে, স্ব স্ব প্রকৃতিবিরুদ্ধ, মাত্র শুনিতে বড়ই মধুর,—যেন 'সোণার পাথর-বাটি'!

ঐ সকল শব্দ যেমন ন্যায়শাস্ত্রাসিদ্ধ, উহার উদ্দিষ্ট বিধানও সেইরূপ নয়শাস্ত্র-বিরুদ্ধ,—সাত্ত্বিক বিচারে, আপাততঃই হউক আর পরিণামেই হউক, উহা অতীব অনর্থকর।

আমরা অনেকে স্বাধীনতার অর্থ যেন স্বেচ্ছাচারিতাই বুঝিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাই কি শ্রেয়স্কর? কখনই নহে, সে ত পাশবনীতি! যদি স্বাধীনতার অর্থ স্বদেশীয় রাজার অধীনতা, এবং মাত্র তাহাই যদি শান্তিসুখপ্রদ বলিয়া সকলেরই প্রার্থনীয়, তবে স্বাধীন পাশ্চাত্যেও অসন্তোষ অরাজকত্বপ্রিয়তা ও রাজদ্রোহের প্রয়াস কেন? স্বাধীন পাশ্চাত্যপ্রদেশই কি সর্ব্বসুখাকর নিখিলমঙ্গলনিলয় পাপতাপদ্বেষহিংসাশূন্য দেবলোক,—ভূমণ্ডলের আদর্শভূমি? কখনই নহে। অসূয়া অসন্তোষ দ্বেষ হিংসা বিদ্রোহবুদ্ধি, ষড়্‌যন্ত্র, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি পাপ স্বাধীন ঐ সকল প্রদেশেও কম নহে। ঐ সকল পাপ আজ কেবল পরাধীন ভারতে বা বঙ্গেই যে প্রথম প্রবৃত্ত, তাহা নহে, স্বাধীন পাশ্চাত্যই ঐ সকলের পথপ্রদর্শক। অধীনতাভোগ বা স্বাধীনতালিপ্সা উপলক্ষ্য মাত্র, বস্তুতঃ উহা ঐ সকল পাপপ্রবৃত্তির প্রজনক নহে। রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্যহেতু অনর্থে পরমার্থজ্ঞান, বিষয়ে বিষমাসক্তি, ঈর্ষা ও অহঙ্কারবিমূঢ়তাই উহার আদি নিদান। কালস্বভাবে সম্প্রতি সে সকল রোগ জগদ্‌ব্যাপী। সৎশিক্ষাই উহার মহৌষধ-মহামন্ত্র সত্য, কিন্তু ওঝা ভূতগ্রস্ত হইলে ঝাড়িবে কে?

কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় আমরা সকলেই শিক্ষাবলে বলীয়ান্ হইয়া আত্ম-কর্ত্তৃত্বের ইয়ত্তা না পাইয়া সততই সুখশান্তিনির্ম্মাণের কৌশল আবিষ্কারে ব্যতিব্যস্ত। পঞ্চভূত অহঙ্কার মন বুদ্ধি এই অষ্টধাতুযোগে, অলৌকিক শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া মাত্র লৌকিক শক্তিসাহায্যে যে সর্ব্বাপৎশান্তির ও সর্ব্বসম্পৎপ্রাপ্তির মহা-কবচ নির্ম্মাণপূর্ব্বক জগৎকে করায়ত্ত করিব, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য, তদনু-সারেই আমাদের শিক্ষা। হস্ত দ্বারা কেবল লেখনীচালন ও নানাবিধ যন্ত্রাদির

নির্ম্মাণ বা পরিচালন করিতে হয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা নানা বৈষয়িক স্বার্থবিচার ও কর্ম্মকৌশল উদ্ভাবন করিতে হয়, ইহাই আমরা জানি, কিন্তু আমাদের হস্তের ও মনোবুদ্ধির অতীতে যে অন্য কোন অবাঙ্মনসগোচর শক্তির খেলা চলিতেছে, সে শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে, সে শক্তির উপর নির্ভর করিতে, সে শক্তির সাধনা করিতে আমরা জানিনা,—শিখি নাই। আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য উর্দ্ধস্তরে নহে, অধস্তরে মাত্র, সুতরাং আমরা ক্রমেই অধমাচারে অধঃপতিত!

আমাদের শিক্ষা দীক্ষা যতদিন মাত্র এইরূপ আধিভৌতিক ভাবেই চলিবে, ততদিন আমাদের মধ্যে একশ্রেণীর পাপ নিরাকৃত হইলেও অপর শ্রেণীর পাপ আসিয়া তাহার স্থানাধিকার করিবে। রোগবীজ বিনাশের চেষ্টা ব্যতীত মাত্র লক্ষণ চিকিৎসায় সম্পূর্ণস্বাস্থ্যসম্পাদন অসম্ভব।

বিচক্ষণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ বিদ্যার্থিগণের সুনীতিশিক্ষা বিষয়ে সম্প্রতি সবিশেষ মনোযোগ করিতেছেন সত্য, কিন্তু মাত্র মুখের কথনে ও কর্ণের শ্রবণে সে শিক্ষা সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। কার্য্যতঃ অভ্যাসই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যই সে শিক্ষার প্রশস্ত উপায়। জটা গৈরিক ধারণ হবিষ্যান্নভোজন প্রভৃতিই যে সেরূপ ব্রহ্মচর্য্যের নির্দ্দিষ্ট উপকরণ তাহা নহে। শিষ্য ব্রহ্মচারী বা শিক্ষার্থিগণের নিত্যনৈমিত্তিক আচার ব্যবহারে সত্য শৌচ সংযম বিনয় আর্জ্জব অস্তেয় অহিংসা অক্রোধ তিতিক্ষা ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মপালনের নিয়মিত অভ্যাস, তদভ্যাস-উপযোগী আহার-বিহার, তৎসহায়ক শাস্ত্রপাঠ, এবং স্ব স্ব ধর্ম্ম ও প্রকৃতির অবিরুদ্ধ ভাবে ভগবদর্চ্চনা, এই সকলই ব্রহ্মচর্য্যের উৎকৃষ্ট উপাদান। এ সকল অনুষ্ঠান হিন্দু মুশলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান সকলেরই পক্ষে সুসাধ্য এবং সকল ধর্ম্মেরই অবিরুদ্ধ। এইরূপ অভ্যাস দ্বারা চরিত্রদার্ঢ্য সম্পাদিত না হইলে, মাত্র বিদ্যালয়ে কয়েকঘণ্টা-কাল বসিয়া আসিলে, শিক্ষার্থী জীবিকার্জ্জন-কৌশল শিখিতে পারে সত্য, কিন্তু বংশের প্রদীপ, জাতির অলঙ্কার, দেশের গৌরবস্থল, দশের আদর্শ, রাজ্যের শান্তিরক্ষক ও রাজার অপত্যতুল্য প্রজা হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। বর্ত্তমান বোর্ডিং মেস্ হষ্টেল ইত্যাদি ছাত্রাবাসে যতই সুনীতিরক্ষার সুব্যবস্থা হউক না কেন, উক্তরূপ অভ্যাসযোগ-শিক্ষার কোনরূপ নিয়মিত ব্যবস্থা আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান শিক্ষকসম্প্রদায়ের মধ্যেও আপনাকে উক্তরূপ শিক্ষাদানে প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ অধিকারী বলিয়া মনে করিতে পারেন, এরূপ কয়জন যথার্থ গুরুদেব আছেন, তাহাও বলা যায় না।

পাঠার্থিগণের পাঠ্যগ্রন্থনির্ব্বাচন একটি সবিশেষ বিবেচ্য বিষয়। বর্ত্তমান

শিক্ষাবিধানের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এ বিষয়ে সবিশেষ সতর্কভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু বিষয়টি বর্ত্তমানে এতই সমস্যাকুল যে, পদে পদে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা।

পাঠ্যগ্রন্থপ্রণয়ন এ যুগের একটি লাভজনক সুতরাং লোভজনক ব্যবসায়। এই লাভের লোভে ইদানীং গুরুশিষ্য, পণ্ডিতমূর্খ, যাজক-যজমান, রজক-ক্ষৌরকার, সাধুতস্কর, সকলেই প্রায় স্বস্ব কর্ম্মের অবসরানুসারে একআধখানি গ্রন্থ প্রণয়ন বা সঙ্কলন করিতে এবং তদন্তে ঐ গ্রন্থ শিক্ষাবিধানে সঞ্চালিত করিতে একান্ত ইচ্ছুক; অনেকে ইচ্ছানুসারে চেষ্টা করিতেও ত্রুটী রাখেন না। বোধ করি, নির্ব্বাচক কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ইঁহাদের জ্বালায় সময়ে সময়ে অস্থির হইয়া যান। হয়ত সময়ে সময়ে নির্ব্বাচনার্থে তাঁহাদের নিকট এত গ্রন্থপ্রেরিত হয় যে, আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহাদের পাঠসমাধা সুকঠিন। এ অবস্থায় নির্ব্বাচনে মতিভ্রম সুসঙ্গত বই অসঙ্গত নহে। ইহার উপর বিষম জ্বালা এই যে, নির্ব্বাচকগণের পক্ষে বিভাগীয় বিধিলঙ্ঘন অসাধ্য জানিয়াও, অনেক সুবিবেচক গ্রন্থকার হয়ত সহি-সুপারিস সহ তাঁহাদের গৃহে গৃহে গিয়া বিরক্ত করিতে আরম্ভ করেন। ধিক্! বিড়ম্বনা!

শিক্ষাবিভাগের বিধানানুমত বই লিখিতে পারিলেই, তাহা পাঠ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এই বিশ্বাসে অনেকের লেখনীই গ্রন্থ উদ্‌গিরণে ব্যতিব্যস্ত, ঐরূপ উদ্‌গীর্ণ আবর্জ্জনারাশি নিরুপায় শিক্ষার্থিগণের সুন্দর আহার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করাইবার নিমিত্ত তাঁহারা অহরহঃ সচেষ্ট। এদিকে, যথার্থ গুণবান্ জ্ঞানবান্ প্রতিভাবান্ গ্রন্থকার নিতান্ত অভাবী হইলেও ধনোপার্জ্জনলোভে নিজপ্রতিভাকে শিক্ষাবিভাগীয় বিধি দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বা আত্মমর্য্যাদা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্তরূপ ভিখারীদলের সহিত কোলাহল করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, অনভ্যস্ত। ইত্যাদি হেতু বিদ্যার্থিগণের উপযুক্তরূপ পাঠ্যপুস্তক অনেক সময়ে সুনির্দ্ধারিত হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। শিক্ষাপক্ষে বর্ত্তমানে ইহা এক বলবৎ বাধা।

আবার, এক শ্রেণীর লোক বিদ্যালয়-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাবিধান-ব্যাপারে অনেক ব্যভিচার ঘটাইতেছেন। ইঁহাদের কেহ হয়ত কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিয়া একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। স্বল্পবেতনে গুটিকয়েক বেকার-ভদ্রসন্তানকে শিক্ষকরূপে নিয়োজিত রাখিয়া স্বতঃপরতঃ প্রাণপণচেষ্টায় ছাত্র-সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

ছাত্রসংখ্যা যত অধিক হইবে, ব্যবসায়েরও ততই শ্রীবৃদ্ধি। এই হেতু এইরূপ বিদ্যালয়ে প্রায়ই অসচ্চরিত্র ছাত্র অনেক সংগৃহীত হইয়া থাকে। ঐ সকল ছাত্র বিদ্যালয়ে যতই অশিষ্টাচরণ ও দুর্নীতির প্রবর্ত্তন করুক না কেন, বা উহাদের সংসর্গে সাধুছাত্রগণের যতই সর্ব্বনাশ হউক না কেন, স্বত্বাধিকারী মহাশয় ছাত্রসংখ্যার হ্রাস সুতরাং তাঁহার এই সাধুব্যবসায়ের হানি হইবে ভাবিয়া, সে বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তিবর্জ্জিত! যে শিক্ষক ঐ সকল অশিষ্ট অসাধু বালককে তোষামোদে বা হাস্যপরিহাসে বাধ্য রাখিয়া কোনরূপে সাময়িক কার্য্য সমাধা করিতে পারিলেন, তিনিই সুদক্ষ শিক্ষক, আর যিনি ন্যায়পথে চলিতে সচেষ্ট, তিনি অযোগ্য শিক্ষক, তাঁহার অন্ন অল্পদিনেই উঠিল! এইরূপ বিদ্যালয়-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করিলে হয় ত দেখা যায়, মাসে যেমন আয় তেমনই ব্যয়, মহাপুরুষ মাত্র নিজ অগাধবিদ্যা বিনামূল্যে বিলাইবার নিমিত্তই এই সাধু অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, আর না হয় ত মাসিক যথেষ্ট-যৎকিঞ্চিৎ নামমাত্র বেতনের বিনিময়ে নিজ অসীম অভিজ্ঞতা অকাতরে বিতরণ করিতেছেন!

এইরূপ কপট পূতনা-বৃত্তিধারী ব্যক্তিগণ স্বার্থসাধনার্থ পীযূষ প্রদানচ্ছলে নির্ব্বোধ নিরীহ বালকগণকে হলাহল দান করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত!

অবশ্য, অনেক সদাশয় মহাত্মা অনেক স্থানে সদভিপ্রায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধু শিক্ষকগণের সহকারিতায় সদ্‌ভাবে শিক্ষাদান পূর্ব্বক দেশের যে যথেষ্ট উপকার করিতেছেন, একথাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার্য্য।

পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত এ দেশের শিক্ষাবিধান যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহার চরমোৎকর্ষে ইহাই মাত্র প্রত্যাশা করা যায় যে, একদিন এদেশ দোষেগুণে পাশ্চাত্যেরই সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। কিন্তু সে সমকক্ষতা রাজাপ্রজা কাহারও পক্ষেই কি শ্রেয়স্কর হইবে? পাশ্চাত্য গুণভাগী হইতে হইলে যদি পাশ্চাত্য দোষভাগীও হইতে হয়, তবে সে বিষমিশ্রিত অমৃতে লোভ কি আমাদের পক্ষে কল্যাণকর? পশ্চাত্য-পক্ষেও সেই স্বসংক্রমিত বিষের প্রতি-সংক্রমণ কি প্রার্থনীয়?

স্পেন্‌-দৃষ্ট আমেরিকা বা রোম-দৃষ্ট ইংলণ্ডের সহিত ইংলণ্ড-দৃষ্ট ভারতের প্রভেদ অনেক। অবোধ-অপোগণ্ড ইংলণ্ড বা আমেরিকায় তখন যেরূপ শিক্ষা বা সংস্কার সুফলপ্রদ হইয়াছিল, বর্ষীয়ান্ বহুদর্শী জরাজীর্ণ ভারতে সেরূপ শিক্ষা-

সংস্কার বিফল বা কুফলপ্রদ হইবারই কথা। পশ্চাত্যের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাও প্রাচ্যপক্ষে কখন কখন অনুপযুক্ত বলিয়াই পরিগণ্য।

সিজর ব্রুটস্ ওয়েলিংটন্ ওয়াসিংটন্ বোনাপার্ট, যিনি যতই দিগ্‌বিজয়ী মহাবীর বা মহাত্মা হউন না কেন, আমাদের রাম লক্ষ্মণ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম অর্জ্জুন কর্ণ প্রভৃতির আদর্শ পশ্চাৎ রাখিয়া যে দিন আমরা ঐ সকল নূতন নূতন পাশ্চাত্য আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছি, অশান্তির আমন্ত্রণ সেই দিনই সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের শিক্ষকগণ যদি তখন সহায়ক হইয়া থাকেন, তবে এখন যে সহভোগী হইবেন, তাহাতে আর বিস্ময় কিসে?

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাবিধানের বিধাতৃগণ যতদিন আমাদিগকে পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিত করিতে থাকিবেন, ততদিন আমাদিগের গুরুহন্তৃত্ববিদ্যার বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে বলিয়া বোধ হয় না। পুনশ্চ, দেশ কাল পাত্রের অবিচারে শিক্ষা-বিস্তারে যথেচ্ছাচার, এবং মাত্র পরীক্ষাফলের নিদর্শনপত্রই বিদ্বত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত যতদিন হইবে, ততদিন শিক্ষাবিধানের কোনরূপ সংস্কারই সার্থক হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে এ দেশের শিক্ষার্থিগণ যেরূপ অবস্থায় শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, তাহা দেশের সাধারণ অবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। পল্লীগ্রামস্থ দরিদ্র বালক দূরবর্ত্তী নগরে গিয়া ছাত্রাবাসে থাকিয়া পাচক পরিচারক পরিচারিকা প্রভৃতির সুখসেবা গ্রহণ পূর্ব্বক সুখশয্যায় শয়ন করিয়া, সুমসৃণ কাষ্ঠমঞ্চে উপবেশন করিয়া পাঠাভ্যাসে নিরত হইল; বিদ্যালয়ে তদপেক্ষাও সুখকর ব্যবস্থা; ক্রীড়া ব্যায়ামাদিতেও বিলাসিতার ত্রুটি নাই। কিন্তু পাঠ পরিত্যাগ করিয়া যেদিন সেই দরিদ্রসন্তান গৃহপ্রত্যাগত হইল, সে দিন সে যেন যথার্থই স্বদেশ হইতে বিদেশে আসিল! সকলই নূতন! কোথায় সে পাচক পাচিকা, সেবক সেবিকা! কোথায় সে কাষ্ঠমঞ্চ কাষ্ঠাধার! কোথায় বা সে মনোহর ক্রীড়োপকরণ! তাহার সেই চিরসুখের মাতৃপল্লী সম্প্রতি সম্পূর্ণ অসুখ-কর! ভোজনের অন্নগুলি পর্য্যন্ত অতৃপ্তিকর! সে সর্ব্ববিষয়েই অনভ্যস্ত! অগত্যা বৃদ্ধা জননী সুশিক্ষিত সৎপুত্রের পাচিকা ও পরিচারিকার কর্ম্মে নিযুক্তা হইলেন, পুত্রবধূও শ্বশ্রূদেবীর সহকারিণী স্বরূপে আবশ্যক হইলে শিক্ষিত স্বামীর তামাকু সাজিতেও উৎসাহিনী! পূজ্যপাদ পতিদেবতা হিন্দুশাস্ত্রের শতপ্রশংসা পূর্ব্বক পরমানন্দে পত্নীপূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন! বৃদ্ধ পিতা নিজে বাজার করিয়া বোঝা বহিয়া আনিতেছেন বা বৈশাখরোদ্রে শস্যক্ষেত্রে কৃষকের কাজকর্ম্ম

দেখিয়া তৃতীয় প্রহরে গৃহপ্রত্যাগত হইয়া হয়ত যখন বিগ্রহসেবায় নিযুক্ত, গরীয়ান্ গ্রাডুয়েট্ পুত্র নির্দ্দিষ্ট দশঘটিকামধ্যে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক তখন বিশ্রাম-সুখে বিভোর! ঐ সকল কার্য্য তাঁহার অভ্যাসবহির্ভূত, স্বাস্থ্যশাস্ত্রের অননুমোদিত! ক্রয়বিক্রয়, কৃষিবিদ্যা, গোরক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে,—আবশ্যক হইলে,—তিনি প্রকাশ্য সভাস্থলে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান বা প্রবন্ধপাঠ করিতে সমর্থ সত্য, কিন্তু সে সকল কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করা তাঁহার অনভ্যাস, বিশেষতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানগরিমার গ্লানিকর।

যাহা হউক, কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, হয় ত মাসিক চল্লিশটাকা বেতনে একটি চাকরি মিলিল। এইবার যুবক মহানন্দে পত্নীসহ প্রবাসী বা পথের ভিখারী হইলেন! গৃহস্থলীর কার্য্যে তিনি একবারেই অনভ্যস্ত, কৃষি-বাণিজ্যাদিতেও তথৈবচ, অতএব চাকরিই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অদৃষ্টবিধান। সেই চাকরী মিলিয়াছে! এই বার নিশ্চিন্ত! কিন্তু সম্ভবতঃ চাকরি পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া দেখিবেন, সে সর্ব্বরক্ষক মাতাপিতা আর নাই, সে সুখের গৃহস্থলী শ্মশান হইয়াছে, সে চাসবাস গোরুবাছুর সকলই গিয়াছে, সম্প্রতি সম্বলমাত্র স্বোপার্জ্জিত কিয়ৎপরিমাণ অর্থ, স্বর্ণরৌপ্য অথবা যৎকিঞ্চিৎ পেন্‌সন্। অগত্যা তদুপরি নির্ভরেই তখন চিরাভ্যস্ত প্রবাসসুখই প্রশস্ত! এই হইতেই বাঙ্গালীর ভবিষ্যদ্‌বংশ প্রকারান্তরে ক্রমশঃ যাযাবর-বৃত্তিধারী!

বঙ্গের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে শতকে সপ্ততিসংখ্যকের প্রায় এইরূপই পরিণাম! ইহাই কি শিক্ষার চরম লক্ষ্য?

শৈশবে বাল্যে যৌবনে সংযমশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভ্যাস নাই, সে শিক্ষা সে অভ্যাস ব্যতীত মাত্র মুখের ও পুস্তকের নৈতিক উপদেশে সাধুতা যেরূপ সিদ্ধ হইতে পারে, বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহারই দৃষ্টান্তস্থল।

যদি কল-কারখানা ব্যবসায়-বাণিজ্য আপিস্‌-আদালত প্রভৃতির নিমিত্তই কেবল শিক্ষার আবশ্যক হয়, তবে শিক্ষাবিধানের সবিশেষ সংস্কার না হইলেও চলে, কিন্তু যদি সাধুত্বরক্ষা চরিত্ররক্ষা ধর্ম্মরক্ষা শান্তিরক্ষা রাজ্যরক্ষা প্রভৃতির নিমিত্তই শিক্ষার প্রয়োজন, তবে বর্ত্তমান শিক্ষাবিধানের আমুল সংস্করণ অবিলম্বে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্রভাবে দেশে যে অনেক সুফল ফলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা অনেক প্রাচীন শিক্ষিত মহাত্মার নাম উল্লেখ করিতে পারি। তন্মধ্যে শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের পিতা স্বনামধন্য স্বর্গীয়

মহাপুরুষ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্র একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। যাঁহারা সেই স্বর্গগত ঋষিকল্প মহাত্মার সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রথমতঃ আমাদের দেশে কতই স্বর্ণফল প্রসব করিয়াছিল! শরৎবাবুর চরিত্রেও সেই পৈতৃক শিক্ষার ফল সবিশেষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শিষ্টাচার, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, পরোপচিকীর্ষা, দয়া, দানশীলতা, সর্ব্বত্র অদ্রোহিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগ্রাম প্রাচীন শিক্ষিত সমাজে যেরূপ সাধারণতঃই দেখা যাইত, ইদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে সেরূপ দেখা যায় না, বা দেখা গেলেও তাহার বহিরাবরণ মুক্ত করিলেই অভ্যন্তর-ভাগ স্বার্থপুরীষ-পরিপূর্ণ বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। তখন হইতে এ পর্য্যন্ত শিক্ষাবিধানের অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু তখন অপেক্ষা এখন শিক্ষাফলের যদি তারতম্য ঘটিয়া থাকে, তবে সে তারতম্য কি উক্ত পরিবর্ত্তনেরই আশুফল, অথবা আদ্যন্ত সমগ্র শিক্ষাবিধানেরই পরিণামফল, সে বিষয়ও সুবিচার্য্য।

শিক্ষালাভ বিষয়ে স্ত্রীপুরুষ উভয়তঃই সমান ও একইরূপ অধিকার থাকা প্রাকৃতিক-বিধিসঙ্গত কি না ইহাও বিবেচ্য। যদি স্ত্রীপুরুষ সকলেই স্ব স্ব জীবিকানির্ব্বাহার্থ সমভাবে শ্বৃত্তি অবলম্বন করিবে, ইহাই মাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে এখন যেমন উভয় সম্প্রদায় একইরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছে, ইহাই বিধেয়, নতুবা পুরুষশিক্ষার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃতি ও প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হওয়াই প্রয়োজনীয়।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গের বাণিজ্য।

বাঙ্গালী বাণিজ্য বুঝে না, এ কথা শিক্ষিত বঙ্গসমাজে বহুমুখে ব্যাখ্যাত, বহুকর্ণে আকর্ণিত। কিন্তু কথাটি কি যথার্থ? তবে, সাধারণতঃ শিক্ষিত বঙ্গ-যুবক যে বাণিজ্য বুঝেন না, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য; কেবল বাণিজ্য কেন, কৃষিবাণিজ্য-শিল্প সামাজিকতা লৌকিকতা গৃহকর্ম্ম দেবধর্ম্ম এ সকল বিষয়েই তিনি অজ্ঞ।

বাঙ্গালীর মধ্যে সাধারণতঃ সুবর্ণবণিক্, গন্ধবণিক্, তিলি, তাম্বুলিক, সাধু (সাউ), শৌণ্ডিক প্রভৃতি জাতি চিরদিনই বাণিজ্য-জীবী। এই সকল জাতীয় ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই বাণিজ্য-ব্যবসায়োপযোগী গুণসম্পন্ন। ইহারা বাণিজ্যকার্য্যে সাধারণতঃ যেরূপ ভাবে যেরূপ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ, অপরাপর জাতীয় ব্যক্তিগণ সেরূপ নহেন। ইহা অনেকেই পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং অনেকেই বিধিনির্দ্দিষ্ট অবোধ্য অদৃষ্টই ইহার হেতু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কিন্তু, পুরুষ-পরম্পরাচরিত ধর্ম্মের নিগূঢ় শক্তিই ইহার একমাত্র হেতু।

তবে, এ কথা স্বীকার্য্য যে, পাশ্চাত্যগণের ন্যায় বাণিজ্যবুদ্ধি বাঙ্গালীর কখনও ছিল না, এখনও হয় নাই। সামুদ্রিক বাণিজ্যে বঙ্গের সম্পর্ক যে কোন-দিনই ছিল না, এ কথা বলা যায় না। প্রাচীন বঙ্গগ্রন্থে লিখিত সাধুসদানন্দের 'ডিঙ্গা', শ্রীমন্ত সওদাগরের 'ডিঙ্গা', চাঁদ সওদাগরের 'ডিঙ্গা' শব্দের অর্থ, ইদানীং-দৃষ্ট ধীবরগণের মৎস্য ধরিবার ডিঙ্গিনৌকা নহে। ঐ সমস্ত গ্রন্থে আনুষঙ্গিক বর্ণনা পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ 'ডিঙ্গা' শব্দের অর্থ সাগরগামী তরী (See-going vessels)। যাহা হউক, বঙ্গের সে বাণিজ্য-গৌরব অনেক দিন গিয়াছে। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান বাণিজ্যের অর্থ সাধারণতঃ দোকানদারি বা আড়তদারি। বহু বাঙ্গালী তাহা করিতেছেন, অনেকে অনেক দক্ষতাও দেখাইতেছেন।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম সময়ে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বণিক্ ছিলেন—

স্বর্গীয় রামদুলাল সরকার।

জন্ম ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে দমদমা ও বারাকপুরের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে; পিতার নাম বলরাম সরকার, নিবাস ঐ অঞ্চলের রেকজানি গ্রামে। বলরাম নিজগ্রামে গুরুগিরি করিতেন, অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তখন বঙ্গদেশে 'ওই বর্গী আসিল!' বলিলেই গৃহস্থগণের মাথায় যেন অকস্মাৎ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত! একদা এইরূপ আকস্মিক ত্রাসবশেই রেকজানির অধিবাসিগণ গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অগত্যা বলরামও আসন্নপ্রসবা পত্নী সহ রেকজানির কুটীরাবাস পরিত্যাগ করিয়া দম্‌দমার দিকে যাত্রা করিলেন। এই ঘোর অশুভ অশান্তি-সময়েই পথে প্রান্তরমধ্যে শুভক্ষণেই রামদুলালের জন্ম!

স্বর্গীয় মোগলসম্রাট্ মহাত্মা আক্‌বর সাহ ও তদীয় পুত্রবধূ অসামান্যরূপ-লাবণ্যবতী স্বনামপ্রসিদ্ধা স্বর্গীয়া সম্রাট্-মহিষী নুরজাহানের জন্মও ঐ রূপ। তবে, তাঁহারা তদানীন্তন সৌভাগ্যবান্ মোগল, রামদুলাল আমাদের ইদানীন্তন অভাগ্যবান্ বাঙ্গালী। তথাপি কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে রামদুলালের সৌভাগ্য প্রকৃতই অতুলনীয়।

রামদুলাল শৈশবে মাতৃহীন পিতৃহীন অনন্যোপায় হইয়া, একটি শিশু ভ্রাতা ও ভগিনী সহ কলিকাতায় দরিদ্র মাতামোহ রামসুন্দর বিশ্বাসের বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। রামসুন্দর ভিক্ষোপজীবী বলিলেই হয়; অতিকষ্টে দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণকে পালন করিতে লাগিলেন।

দুঃখীর দিন দুঃখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু যখন একেবারেই সংসার অচল হইয়া উঠিল, তখন রামদুলালের মাতামহী হাটখোলার প্রসিদ্ধ ধনী মদনমোহন দত্তের বাটীতে পাচিকা বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এই হইতে দিদিমায়ের সহিত দৌহিত্র রামদুলালও দত্তবাটীর পোষ্যমধ্যে পরিগণিত হইলেন। ইহাই তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

এইবার দত্তবাটীর গৃহশিক্ষক মহাশয়ের নিকট রামদুলাল লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রগাঢ় মনোযোগপূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া অল্পদিনেই বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে ও ইংরাজিতে কথা বলিতে শিখিলেন। তখন মদন দত্ত মহাশয় ইঁহাকে নিজ আপিসে শিক্ষার্থিস্বরূপে নিযুক্ত করিলেন; পরে ইঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে বিল্‌সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে একদিন রামদুলাল দমদমায় কোন এক সৈনিক সাহেবের নিকট

বিল্ সাধিতে গিয়া, অনেক বিলম্বে টাকা পাইলেন। রামদুলাল টাকা লইয়া বাহির হইলেন, সন্ধ্যাও হইয়া আসিল। টাকাও অল্প নহে; তখন আবার কলিকাতার চারিপাশে বড়ই দস্যুভয়! উপায় কি!—রামদুলাল চিন্তায় অস্থির হইলেন। কোন গৃহস্থালয়ে আশ্রয় লইয়া রাত্রি যাপন করিতেও সাহস হইল না; কি জানি, অর্থলোভে গৃহস্থই বা অতিথিহত্যা করে! অগত্যা ফকির সাজিয়া এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। বিপদের রাত্রি ঈশ্বরেচ্ছায় নিরাপদেই কাটিয়া গেল। প্রভাতে কলিকাতায় আসিয়া যথাকালে আপিসে টাকা জমা করিয়া দিলেন।

মনিব মদন দত্ত এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অচিরেই রামদুলালকে দশটাকা বেতনে সিপ্ সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য্যোপলক্ষ্যে তাঁহাকে অনেক সময়ে জাহাজে যাইতে হইত। ক্রমে তিনি জাহাজ ও জাহাজি-মাল সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

এই সময়ে একদিন তিনি ভাগীরথীতীর দিয়া যাইতে যাইতে একখানি জলমগ্ন জাহাজ দেখিতে পাইয়া, উহাতে কত মাল আছে, কি উপায়ে কি পরিমাণ মালের উদ্ধার হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে মনে মনে একটা হিসাব স্থির করিয়া রাখিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে, মনিব মদন বাবু তাঁহাকে ১৪০০০৲ টাকা দিয়া অন্য একখানি জলমগ্ন জাহাজ নীলামে ক্রয় করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। নীলাম-আপিসে উপস্থিত হইয়া রামদুলাল শুনিলেন, কিয়ৎকালপূর্ব্বে সে জাহাজের বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট জাহাজখানির নীলাম হইতেছে। রামদুলাল তৎক্ষণাৎ ১৪০০০৲ টাকা দিয়া তাঁহার প্রভুর নামে সেই নীলাম ডাকিয়া লইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই এক সাহেব আসিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে, সেই জলমগ্ন জাহাজ মদন দত্তের পক্ষ হইতে রামদুলাল সরকার খরিদ করিয়াছেন। সাহেব সেই নীলাম-অফিসেই রামদুলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জাহাজখানি নিজে কিনিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ কৌশলে ভয়-প্রদর্শন, পরে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। রামদুলাল যখন সাহেবের কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তখন সাহেব ক্রমশঃ দরদাম করিতে করিতে অবশেষে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা মূল্য দিতে স্বীকার করিলেন। রামদুলাল ঐ মূল্য গ্রহণ করিয়া জাহাজখানি বিক্রয় করিলেন, এবং স্বীয় প্রভুর নিকট আসিয়া ঐ টাকা প্রদান করিয়া সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইলেন। মহাপুরুষ মদন দত্ত ভৃত্যের এইরূপ অসাধারণ লোভ-রাহিত্যের পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট

ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, বলিলেন,—রামদুলাল, আমার চৌদ্দ হাজার আমাকে দাও, মুনাফার এক লক্ষের এক পয়সাতেও আমার অধিকার নাই। তোমারই ভাগ্যে ঐ একলক্ষ লাভ হইয়াছে, উহা তুমি লও, তাহাতেই আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইব।

এই সামান্য মূলধন—লক্ষ টাকা লইয়া রামদুলাল বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন; তাঁহার অসামান্য মূলধন স্বীয় সাধুতা সুবুদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি কমলার কৃপা। বাণিজ্যে ক্রমেই যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং কয়েকখানি জাহাজ ক্রয় করিয়া তদ্দারা আমেরিকার সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ভারতে মার্কিন্ বণিক্‌গণের একমাত্র প্রতিনিধি হইলেন রামদুলাল সরকার! তদানীন্তন আমেরিক বণিক্‌গণ তাঁহাকে "বাঙ্গলার রথ্‌চাইল্‌ড্" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। বণিক্‌সমাজে রামদুলালই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি নানাবিধ দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায় করিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রামদুলাল বড়ই নিরহঙ্কার ও দয়াবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন বাঙ্গলার রথ্‌চাইল্‌ড্, তখনও মদনদত্তের ভৃত্যত্ব পরিত্যাগ করেন নাই, এবং প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে পাদুকা ত্যাগ করিয়া যাইতেন, মাসান্তে অন্যান্য ভৃত্যগণের সহিত গিয়া নিজের বেতনের দশটি টাকা সমাদরে লইয়া আসিতেন।

রামদুলাল মূলাযোড় গ্রামের একটি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পাত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের অল্পকাল পরেই তিনি উপরি উক্ত লক্ষটাকা লাভ করিয়াছিলেন। এই সাধ্বী রমণী যেমনই ভাগ্যবতী তেমনই তেজস্বিনী ও দানশীলা ছিলেন। একদা শীতকালে গুদামের সমস্ত বনাত ইনি গরিবদুঃখীদিগকে বিলাইয়া দেন। জানিতে পারিয়া রামদুলাল তিরস্কার পূর্ব্বক পত্নীকে কহিয়াছিলেন,—"তুমিই আমার সৌভাগ্যের শনি!"

অভিমানিনী মানভরে অনাহারে মৌনাবলম্বিনী রহিলেন। রামদুলাল অনেক সাধনাতেও মানভঙ্গ করিতে পারিলেন না; তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বকৃত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ দুইশত টাকা জরিমানা দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। মানিনী মানভঙ্গে পানভোজন করিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে বাঙ্গলার তৎকালীন বড় লোকগণের ঐরূপ আদব-কায়দার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত উপাখ্যানটির উল্লেখ করিলাম।—

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে কোন এক জমিদারের দুইটি পুত্র,—দু'জনই প্রত্যহ আহারান্তে বিদ্যালয়ে পড়িতে যান। একদিন দু'ভাই

ভোজন করিতেছেন, তখনও তাঁহাদের যোগান দুগ্ধ আসে নাই। জননী সম্মুখে উপস্থিত, কনিষ্ঠভ্রাতা কহিলেন,—"মা, দুধ না হইলে ভাত খাইব কিরূপে ?"

পতিপরায়ণা উত্তর করিলেন,—"বাবা, গয়লা এখনও তোমাদের দুধ দিয়া যায় নাই, কেবল কর্ত্তার দুধ দিয়া গিয়াছে, সে দুধ তোমাদিগকে কি করিয়া দিব? তিনি ত একটু পরেই আহারে বসিবেন।"

"আপনি সেই দুধই দিন, এখনই ত গয়লা আমাদের দুধ আনিবে, সেই দুধ বাবার জন্য জ্বাল দিয়া রাখিলেই হইবে।

স্নেহময়ী সন্তানের কথায় বাধ্য হইয়া পতির সেবনীয় দুগ্ধ দুই ভ্রাতাকে ভাগ করিয়া দিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ভোজনান্তে বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলেন। অপরাহ্নে বাটীতে আসিলে দেওয়ানজী আসিয়া জানাইলেন,—"আপনারা কর্ত্তার সেবনীয় দুগ্ধ পান করিয়াছেন বলিয়া, কর্ত্তা আপনাদিগকে ২০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, এবং অবিলম্বে উহা আদায় করিতে হুকুম দিয়াছেন।"

কর্ম্মচারীর মুখে এই অবমাননা-বাক্য শুনিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কনিষ্ঠ তেজস্বিতার সহিত কহিলেন,—"দাদা, আপনি কাঁদিতেছেন কেন ? বাবা ত ঠিক বিচারই করিয়াছেন! দেওয়ানজীরই বা অপরাধ কি? উহাঁকে ত আমরা যাহা হুকুম করিব তাহাই করিবেন। বাবার হুকুম অনুসারে অবশ্যই ত উনি জরিমানা আদায় করিতে বাধ্য। মহাশয়, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমরা টাকা আনিয়া দিতেছি।"

ভ্রাতৃদ্বয় সত্বর জননীর নিকট হইতে কুড়িটি টাকা আনিয়া কর্ম্মচারীর হস্তে দিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে, একদিন দুইভ্রাতা বিদ্যালয় হইতে বাটীতে আসিয়া জননীর নিকট বসিয়া জলযোগ করিতেছেন, পুত্রবৎসলা অতর্কিতভাবে বৎসদ্বয়ের সহিত নানাবিধ স্নেহালাপে প্রবৃত্ত। এমন সময়ে সহসা বিশিষ্ট প্রয়োজনবশতঃ তথায় কর্ত্তামহাশয় আসিয়া উপস্থিত! সাধ্বী সসম্ভ্রমে অবগুণ্ঠন টানিলেন, কনিষ্ঠপুত্র তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠকে ইঙ্গিত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং একেবারে সদরে আসিয়া দেওয়ানজীকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন,—"দেওয়ানজি, কর্ত্তা মহাশয় আসিবামাত্র তাঁহাকে ১০০৲ টাকা জরিমানা করিবেন। মা অসতর্ক ভাবে বসিয়া আমাদিগকে খাবার দিতেছেন, আমরাও সানন্দে স্বচ্ছন্দে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, পূর্ব্বে খবর না করিয়া সে সময়ে সহসা সেখানে

উপস্থিত হওয়া তাঁহার পক্ষে বড়ই বেআদবি হইয়াছে! আমি জরিমানার টাকা এখনই আদায় চাই।"

কর্ত্তা সদরে আসিবামাত্র দেওয়ান মহাশয় বিনম্রভাবে উক্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। ন্যায়বান্ পিতা নিরাপত্তিতে উত্তর করিলেন,—"আমার যথার্থই অন্যায় হইয়াছে! খাজাঞ্চীর নিকট হইতে ১০০৲ একশত টাকা লইয়া এখনই ছোট শ্রীমানের হস্তে দিয়া আসুন্, এবং তৎসহ তাহাকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানাইবেন।"

রামদুলাল দুইশত টাকা জরিমানা দিয়া শিক্ষা পাইলেন, জীবনে আর কখনও পত্নীর প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু এই পত্নীর গর্ভে সন্তানোৎপত্তি না হওয়ায় তিনি গোপনে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করেন। সেই পত্নীর গর্ব্ভে আশুতোষ ও প্রমথনাথ, ওরফে সাতুবাবু ও লাটুবাবু জন্মগ্রহণ করেন।

রামদুলাল প্রত্যহ ৭০৲ সত্তর টাকা করিয়া দান করিতেন। একবার মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে ইনি এককালে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় রামদুলালের বাসভবনের নিকট একটি লোক বাস করিত,—সে উন্মাদ রোগগ্রস্ত। একদিন প্রভাতসময়ে রামদুলাল বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ঐ উন্মত্ত ব্যক্তি সহসা তথায় আসিয়া রামদুলালের ক্রোড়ের উপর একটি মৃত পারাবত-পক্ষী নিক্ষিপ্ত করিল; পক্ষীটির মৃতদেহ অসংখ্য কীটে পরিপূর্ণ।

রামদুলাল মৃতকপোত-পাতে চমকিত হইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিয়া বিরক্ত ভাবে কহিলেন,—"আরে বেটা পাগল! কোথা হ'তে একটা মরা পায়রা এনে গায়ের উপর ফেলে দিলে!"

পাগল হাসিয়া উত্তর করিল,—"যে নিজ শরীর দ্বারা সহস্র সহস্র জীবকে আহার দান করিতেছে সে মরা, আর তুমি রামদুলাল সরকার কোটিপতি হইয়া এক মুষ্টি অন্ন ব্যয় কর না, তুমি বুঝি তাজা, কেমন?"

উত্তর শুনিয়া রামদুলাল স্তম্ভিত! পাগলও ইত্যবসরে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত!

তৎক্ষণাৎ সরকার মহাশয় নিজ কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন,—

"প্রতিদিন অন্ততঃ দুইশত লোক পরিতোষ পূর্ব্বক আহার পাইতে পারে, এমন একটি অতিথিশালা স্থাপন করিতে কত টাকার প্রয়োজন, তাহার আনুমানিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া আন।"

তালিকা আনা হইলে রামদুলাল উহা স্বাক্ষরিত করিলেন এবং সত্বর অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করিতে আদেশ দিয়া স্নানাহার করিতে গেলেন।

এই গ্রন্থে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, রামদুলাল ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন এবং ইংরাজি ভাষায় বাঙ্গলা অক্ষরে চিঠিপত্রের মুশাবিদা লিখিয়া দিতেন, কর্ম্মচারীরা তাহাই ইংরাজি অক্ষরে নকল করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতেন। লেখাপড়া তিনি অধিক জানিতেন না।

১২৩১ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে এই সুবিখ্যাত মহাত্মা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইনি নগদ সঞ্চিত ও বাণিজ্যে নিয়োজিত, সকল্যে তিন কোটি টাকা রাখিয়া যান। তৎকাল হইতে একালপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালীই বাণিজ্যব্যবসায়ে রামদুলাল সরকারের ন্যায় উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই।

তৎপরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে বাণিজ্যে বিশিষ্টত্ব লাভ করিয়াছিলেন—

স্বর্গীয় মতিলাল শীল।

বাঙ্গালীসমাজে ইঁহার নাম সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। ইনি সুবর্ণবণিক্-বংশোদ্ভূত। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে কলিকাতা—কলুটোলায় জন্ম, ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে মৃত্যু। পিতার নাম চৈতন্যচরণ শীল। মতিলাল বাল্যে পাঠশালায় বাঙ্গলা লেখাপড়া শিক্ষা করেন, পরে সরকারি কেল্লায় গুদাম-সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য করিতে করিতেই তিনি কর্ক্ ও বোতলের কারবার করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিছুদিন পরে কেল্লার চাকরী ছাড়িয়া জাহাজের কাপ্তেনগণের মুৎসুদ্দিগিরি করিতে আরম্ভ করেন, অর্থাৎ বিলাত হইতে যে সকল বাণিজ্য-জাহাজ আসিত, ঐ সকল জাহাজের মাল বেচিয়া দিতেন, এবং কাপ্তেনসাহেবগণের ফরমাইশ মত জিনিষ পত্র কিনিয়া দিতেন। অতঃপর তিনি তিনটি হৌসের মুৎসুদ্দির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নানাবিধ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় দ্বারা প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

ধনশালী মতিশীল সদ্‌ব্যয়ও অনেক করিয়াছিলেন। এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৪২ খৃঃ অব্দে "সিল্‌স্ ফ্রি স্কুল" নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে বেলঘরিয়ায় একটি বৃহৎ অতিথিশালা স্থাপন করেন, তৎপরে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দান করেন। ইনি শরণাগত ব্যক্তির বিপদ্ উদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ব্যক্তিগত দান ও ইঁহার যথেষ্ট ছিল।

অদ্যাবধি এই মহাত্মার দানের উপাখ্যান বঙ্গসমাজে অনেক শুনা গিয়া থাকে। নিম্নে একটির উল্লেখ করা যাইতেছে।—

মতিলাল শীলের বাটীতে কয়েকজন দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান চাকরী করিতেন। একবার কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণশূদ্রাদিজাতীয় অনেক লোক নিমন্ত্রণ করা হয়, কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণগুলিও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ পরিবেশন পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিলেন, পরে অন্যান্য সমস্ত লোকের আহার সমাধা হইলে, আপনারা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একজন কুলীনসন্তান শারীরিক অস্বাস্থ্যের আপত্তি করিয়া বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ ভোজনে উপবেশন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন,—"অমুক অসুখের ভাণ করিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন, বাবু জানিতে পারিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, সুবর্ণবণিকের বাড়ীতে আহার করিবে না বলিয়াই এ বাহ্মণ পলাইয়াছে। যাহা হউক, বাবুকে এ কথাটা কেহ জানাইও না, জানাইলে বেচারার রুজি মারা যাইবে।"

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ জল্পনা করিতে করিতেই সহসা সম্মুখে মতিলাল শীল স্বয়ং উপস্থিত! "দেবতাগণ! আপনারা সকলেই ত সেবায় বসিয়াছেন?" বলিয়া শীল মহাশয় একএক করিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ, আমরা বসিয়াছি।"

মতিলাল।—কই, অমুককে দেখিতেছিনা যে?

ব্রাহ্মণগণ।—আজ্ঞে, তাঁর একটু অসুখ মত করেছে, তাই তিনি বাসায় গিয়েছেন।

মতিলাল।—হুঁ, আচ্ছা!

"এইবার সর্ব্বনাশ! আহা, বেচারার বুঝি রুজি মারা গেল!" এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মতিলাল সক্রোধে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

পরদিন কর্ম্মচারিগণ যখন সকলেই উপস্থিত, সেই সময়ে শীল মহাশয় প্রধান কর্ম্মচারীকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"অমুক ব্রাহ্মণকে তাহার প্রাপ্য বেতনের টাকা বুঝিয়া দিয়া এখনই বিদায় করিয়া দাও।"

আদেশ পাইয়া সদাশয় প্রধান কর্ম্মচারী শীল-মহাশয়ের নিকট স্বয়ং গিয়া ব্রাহ্মণের চাকরী বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক স্তুতিমিনতি করিতে লাগিলেন, মতিলাল কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন,—

"আমি অমন গোখুরা সাপ কখনই পুষিব না। তবে যদি উহার বড়ই অভাব হয়, এক কালে কিছুটাকা দিয়া দাও। চাকরী উহাকে আমি আর কিছুতেই দিব না। উহাকে শীঘ্র বাড়ী চলিয়া যাইতে বল। বাড়ীর ঠিকানাটা লিখিয়া লইও।"

অগত্যা সেইরূপই ব্যবস্থা হইল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ টাকা লইয়া কলম রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইলেন।

কিছুদিন পরেই মতিলাল শীল মফস্বলে একটি ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন। উপরিউক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিবাসস্থানও এই জমিদারির অন্তর্গত। মতিলাল স্বয়ং কয়েকজন পারিষদ সঙ্গে লইয়া এই নূতন জমিদারি দেখিতে গেলেন, এবং অনুসন্ধান করিয়া সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন স্নানান্তে শিবপূজা করিতেছিলেন; যথাসময়ে পূজা সমাপ্ত হইলে সসম্ভ্রমে পূর্ব্বতন মনিবের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। মতিলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি ঠাকুর? কি দিয়ে শিবপূজা কর্‌লেন?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—

"আজ্ঞে, কিঞ্চিৎ আতপ চাউল ও ফুল বিল্বদল দিয়ে পূজা কর্‌লাম।"

"ভাল ভাল! মা-ঠাকরুণকে বল, আজ আমরা এখানে প্রসাদ পাব।" বলিয়া মতিলাল যথার্থই সেদিন তথায় অবস্থিতি ও ভোজনাদি করিলেন, এবং সেই সমগ্র নূতন সম্পত্তিটি ব্রাহ্মণের পূজিত শিবের নামে দেবোত্তর লিখিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণের একখানি পাকা বাড়ী ও শিবমন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে ব্রাহ্মণপত্নীর চরণপ্রান্তে এক প্রস্থ স্বর্ণালঙ্কার রাখিয়া মাতৃ-সম্বোধন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহাত্মা মতিলাল শীলের এরূপ সদাশয়তার কথা অনেক শুনা যায়। কলিকাতার স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মহাত্মা তারক নাথ প্রামাণিক মহাশয়ও একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং প্রাতঃস্মরণীয় সদাশয় ব্যক্তি। ইঁহার ব্যক্তিগত দানের সীমা ছিল না। ইদানীন্তন বাঙ্গালী ব্যাবসায়িকগণ অনেকে অনেক আয় করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সদ্ব্যয় সেকালের মত সকলের দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বর্গীয় মতিলাল শীলের পর বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বণিক্—

স্বর্গীয় মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা—

—অনুমান ১৮২৩ খৃঃ অব্দে, সপ্তগ্রামের সুবর্ণ বণিক্‌বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ লাহা, জন্মস্থান চুঁচড়াসহর। দুর্গাচরণ বাল্যকালে

হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। পিতা প্রাণকৃষ্ণ লাহা কয়েকটি সওদাগরি আফিসের মুৎসুদ্দিগিরি করিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে স্বয়ং একটি সওদাগরি আপিস খুলিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ কিছুকাল হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিবার পর পিতার অভিপ্রায়ানুসারে সেই আপিসে ব্যবসায়কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে প্রাণকৃষ্ণ স্বর্গলাভ করিলে দুর্গাচরণই স্বয়ং আপিস চালাইতে লাগিলেন। ইনি স্বীয় ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং কালে অনেক গুলি সওদাগরি আফিসের মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন। বাণিজ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইনি জমিদারী ক্রয় করিয়া ক্রমে বঙ্গের একজন প্রধান বণিক্ ও জমিদার হইয়া উঠিলেন। ইংরাজ বণিক্ সমাজে ও গবর্ণমেণ্টের নিকটও ইনি সবিশেষ সম্মান সুখ্যাতি লাভ করিলেন। প্রথমতঃ ছোটলাটের, পরে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়া অবশেষে ১৮৮২ খৃঃ অব্দে দুর্গাচরণ কলিকাতার সরিফ পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ক্রমান্বয়ে সি আই, ই, রাজা ও মহারাজা উপাধি লাভ করেন। এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে ইনিই প্রথমে পোর্ট কমিশনারপদ প্রাপ্ত হন। ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিনেও ইনি দুইবার সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

দুর্গাচরণের দুই পুত্র কৃষ্ণদাস এবং হৃষীকেশও বিষয়কার্য্যে সুনিপুণ এবং সদনুষ্ঠানপরায়ণ। কয়েক বৎসর অতীত হইল, ইঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দুর্গাচরণের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দও জ্যেষ্ঠের ন্যায় সুদক্ষ ও সদাশয় ছিলেন। ১৯০৪ খৃঃ অব্দে মহারাজ দুর্গাচরণ পরলোক প্রাপ্ত হন।

কলিকাতার বাহিরে ইটাচোনা, মানকুণ্ড, ভাগ্যকুল, গোয়াইলবাড়ী, আবাইপুর, ধানকুঁড়ে, আম্‌লা প্রভৃতি স্থানের সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ অনেকেই ব্যবসায়ী এবং তদুপায়ে কেহ কেহ এখন যথেষ্ট ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়া নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন।

কলিকাতায় এবং মফস্বলে আজকাল অনেক বাঙ্গালী ময়দার কল, তৈলের কল, কাপড়ের কল ইত্যাদি কলকারখানা স্থাপন করিয়া ব্যবসা করিতেছেন, অনেকে লাভবান্‌ও হইতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী পাটের ব্যবসায়ে, অনেকে রাজা অনেকে ফকির হইয়াছেন। পাটের আড়তদারি ও বেলারি বাঙ্গলার একটি বিশিষ্ট লাভজনক

ও লোভজনক ব্যবসায়। অনেকেই ইহাতে বড়লোক হইয়াছেন, আবার লাভের লোভে অনেকের সর্ব্বস্বান্তও ঘটিয়াছে। কলিকাতায় বিধুভূষণ মিত্র ও কীর্ত্তি চন্দ্র মিত্র পাটের বাণিজ্যে অগাধ ধনশালী হইয়াছিলেন, শেষে উভয়েরই সর্ব্বনাশ! এখনও ঐ ব্যবসায়ে অনেক বাঙ্গালী অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। অনেক বাঙ্গালী অনেক স্থানে চাউলের আড়ৎদারি ও অন্যান্য ভুসি মালের আড়ৎদারিও করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত অনেক বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান কাপড়ের ব্যবসায়, কাগজের ব্যবসায় পুস্তকের ব্যবসায়, এবং ছাপাখানা হরফের কারখানা প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প ব্যবসায় দক্ষতার সহিত চালাইতেছেন। যাহাই হউক, মারোয়ারিগণই এখন সাধারণতঃ বঙ্গের প্রধান ব্যবসায়ী।

আজকাল বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণের মধ্যে ধনে মানে বুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সর্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মার্টিন্ কোম্পানির একজন প্রধান স্বত্বাধিকারী, ব্যবসায় বুদ্ধিতে বড়ই বিচক্ষণ। সর্ রাজেন্দ্র নাথ কি ভারতে, কি ইংলণ্ডে উভয়ত্রই একজন সম্ভ্রান্ত বড়লোক বলিয়া সম্মান্য। এই মহাত্মার প্রকৃতিও অতি উদার অমায়িক। ইনি দানশীল, পরোপকারী ও বহুপ্রতিপালক। গবর্ণমেণ্টেও ইঁহার সম্মান প্রতিপত্তি যথেষ্ট। জগদীশ্বর ইঁহাকে চিরায়ুঃ করিয়া রাখুন্।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

শরৎবাবুর গ্রন্থ-ব্যবসায়।

বাঙ্গালীর গ্রন্থ-ব্যবসায়ে সংস্কৃতপ্রেসডিপজিটরি শিক্ষিত সমাজে এককালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল। তখন ক্যানিং লাইব্রেরীরও প্রসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। এস, সি, আঢ্য ও মেডিকেল লাইব্রেরী এ দুইটিও অনেক দিনের প্রসিদ্ধ কারবার। কিন্তু, স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় "এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড্‌ কম্প্যানি" নামক পুস্তকালয় খুলিয়া বাঙ্গালীর গ্রন্থ-ব্যবসায়ের যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই সেরূপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "কটন প্রেস্" নামক ছাপাখানাটিও বাঙ্গালীর পরিচালিত ছাপাখানাগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে পরিগণ্য। তাঁহার পুস্তকের দোকান ও ছাপাখানার বিশিষ্টত্ব এই যে, স্কুলকলেজের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উচ্চনীতিক সদ্‌গ্রন্থ ব্যতীত কোনরূপ কুনীতি-সূচক বা অসার আমোদপ্রদ গ্রন্থ বিশিষ্টরূপ লাভজনক হইলেও, তাহা ঐ দোকানে বিক্রীত হয় না, বা ঐ প্রেসে মুদ্রিত হয় না। এই হেতু এবং শরৎবাবুর সাধুতা ও বিনয় শিষ্টাচার হেতু, সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় জষ্টিস্ এ, চৌধুরী, স্বর্গীয় মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং ইংরাজ সমাজে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সর্ রবার্ট র‍্যাম্পিনি, (ইদানীং লর্ড্ ফুল্‌টন্), সর্ লরেন্স্ জেঙ্কিন্‌স্, চিফ্ সেক্রেটারি গুর্‌লে এবং স্বয়ং শাসনকর্ত্তা লর্ড্ কর্‌মাইকেল্‌ প্রমুখ প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ শরৎবাবুকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে, কোন ইংরাজের বা অপর কোন বাঙ্গালীর পরিচালিত ছাপাখানায় না দিয়া, অনেক সময়ে শরৎকুমারের কটন প্রেসেই মুদ্রিত করিতেন, এবং সাধারণতঃ মেসার্স এস্ কে, লাহিড়ী এণ্ড্ কম্প্যানীকেই উহার প্রকাশক নিযুক্ত করিতেন। ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালী-পরিচালিত অন্য কোন মুদ্রাযন্ত্রাধিকারীর বা গ্রন্থ-ব্যবসায়ীর এরূপ সম্মান-সৌভাগ্য ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

পূর্ব্বে পুস্তক-বিক্রেতাগণ নিজ নিজ ব্যবসায়ে যথেচ্ছাচার করিতেন, তাঁহাদের পরস্পর ঐকমত্য বা অনুবন্ধিত্ব ছিল না। ইহাতে অনেক সময়ে সাধু ব্যবসায়ীর ক্ষতি, প্রবঞ্চকের লাভ এবং ব্যবসায়ের মর্য্যাদাহানি হইত। শরৎ বাবু উদ্যোগী হইয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠাবান্ গ্রন্থব্যবসায়ীর সহযোগে "বুক্ সেলার্স্ এসোসিয়েশন" (Book-sellers' Association) নামক একটি সমিতি গঠিত করেন। রায় বাহাদুর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট্ এবং স্বয়ং শরৎবাবু ইহার সেক্রেটারি নির্ব্বাচিত হন।

এই সমিতি এখনও বর্ত্তমান। পূর্ব্বোক্ত প্রেসিডেণ্টের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং শরৎবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষকুমার লাহিড়ী এক্ষণে যথাক্রমে উহার প্রেসিডেণ্ট্ ও সেক্রেটারি। এক্ষণে দেশীয় গ্রন্থ-ব্যবসায়িগণ উক্ত সমিতির নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে চলিতে বাধ্য, কেহ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সমিতি কর্ত্তৃক দণ্ডনীয়। ইহাতে গ্রন্থ-ব্যবসায়ে প্রবঞ্চনা অনেক কমিয়াছে, এবং সাধু ব্যবসায়ীর সুবিধাও অনেক বাড়িয়াছে।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ২০০৲ দুইশত টাকা মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া শরৎ বাবু নিজ বুদ্ধি পরিশ্রম ও সাধুতাফলে বিশ বৎসরের মধ্যে অন্যূন তিন লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার পুস্তকালয় যে গৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ঐ গৃহ তাঁহার ইদানীং-বিস্তীর্ণ ব্যবসায়কার্য্যের পক্ষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও অনুপযুক্ত বলিয়া, তিনি এক্ষণে কলেজষ্ট্রীটের পার্শ্বে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া মার্টিন কোম্পানি কর্ত্তৃক একটি পাঁচতলা বাটী নির্ম্মাণ করাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি হারিসন রোডস্থিত স্বীয় বাসভবনের পূর্ব্বদিকে স্বাধিকৃত প্রকাণ্ড পঞ্চতল ভবনে তাঁহার কটন-প্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুস্তকালয়প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ৫৬ নং কলেজষ্ট্রীটে নিজ ব্যয়ে ভূমি ক্রয় করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন।

ইহার বহুপূর্ব্বেই ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের অগষ্ট মাসে তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, স্নেহময়ী মাতৃদেবীও স্বর্গগতা; পত্নী ও পুত্র-কন্যাগণ এবং কনিষ্ঠ সহোদর বসন্তকুমারকে লইয়া শরৎকুমার বাবু এক্ষণে কলিকাতা সহরের একজন ধনাঢ্য গৃহস্থ। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সর্ব্বোপকরণই তাঁহার গৃহে বর্ত্তমান। মাতাপিতা জীবিত থাকিতে গুরুসেবা তাঁহার যথেষ্ট হইয়াছে। সময় নাই অসময় নাই, অতিথি-সেবা শরৎবাবুর গৃহে সততই ছিল,

স্বধর্ম্মানুসারে দেবার্চনারও ত্রুটি ছিল না, গোসেবা ত তাঁহার একটি সর্ব্বপ্রধান গৃহকর্ত্তব্য। বস্তুতঃ শরৎবাবু ব্রাহ্ম। যে সকল ব্রাহ্মদ্বেষী একদেশদর্শী হিন্দু কেবল হিন্দু সমাজ মধ্যে পুত্রকন্যার আদানপ্রদান বা ক্রয়বিক্রয়ে, দুর্গোৎসব-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে হিন্দুপংক্তি মধ্যে বসিয়া চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয় চতুরঙ্গ সেবাগ্রহণে, কদাপি বা স্বেচ্ছাক্রমে অন্নবিক্রীয়ীর 'শ্রীক্ষেত্র'-মন্দিরে দ্বাদশ জাতীয়োচ্ছিষ্ট সুমিষ্ট 'মহাপ্রসাদ'-আস্বাদনে স্বীয় সনাতন ধর্ম্ম সম্যক্ অক্ষুণ্ন রাখিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত তুলনায় পুণ্যশ্লোক রামতনু-পুত্র শরৎকুমারকে একজন বরণীয় হিন্দু-ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? বস্তুতঃ শরৎ-কুমার কৃষ্ণনগরের সুপবিত্র লাহিড়ী-বংশের অলঙ্কার,—ব্রাহ্ম গৃহস্থগণের আদর্শ পাত্র।

'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে,' এই চিরপ্রচলিত মহাবাক্যটির উজ্জ্বল উদাহরণ শরৎবাবুর সুপবিত্র গৃহস্থলীতে এক দিন সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই মহাদুর্দ্দৈব তথা মহান্ দেবানুগ্রহের ব্যাপারটি এই,—

বেলা তৃতীয় প্রহর, শরৎবাবু বসন্তবাবু উভয় ভ্রাতাই গৃহবহির্গত, দাসদাসী ও অপরাপর পোষ্যবর্গ মাধ্যাহ্নিক ব্যাপারান্তে সকলেই বিশ্রামবিহ্বল। হ্যারিসন্ রোডে লোক গাড়ীঘোড়া প্রভৃতির যাতায়াতও সংপ্রতি অত্যল্প, গৃহস্থালয়গুলিও যেন নির্জ্জন নীরব। এমন সময়ে শরৎবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সন্তোষকুমার,—মাত্র বর্ষত্রয়দেশীয় শিশু,—সহসা শৈশবচেষ্টায় তৃতীয় তলস্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অলিন্দে লৌহবৃতি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অধোভাগে নিপতিত! অন্যূন চল্লিশ ফুট নিম্নে ইষ্টকাচ্ছাদিত সুকঠিন রাজপথ, পতনে প্রাণপাত অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু করুণাময়ের করুণা-বিধান মানবের সুদুর্বোধ্য। যে দৈববশে মাতা-পিতার অজ্ঞাতসারে অবোধ অসহায় শিশু সহসা মৃত্যুমুখে পতনোন্মুখ, সেই দৈববশেই সেই সময়ে এক ভারবাহক সুকোমল শয্যাভার মস্তকে লইয়া সেই স্থানে রাজপথে সমুপস্থিত! শিশু সৌভাগ্যক্রমে সেই শয্যাভারোপরি নিপতিত! সঙ্গে সঙ্গে ভাররাশিও সবেগে ভূপতিত!

এই আকস্মিক অচিন্তিত অদ্‌ভুত ব্যাপারে ভূতোপহতবৎ বিমূঢ়চিত্ত হইয়া, ভারবাহক এই আকস্মিক ব্যাপারের তত্ত্বাবধারণ না করিয়াই ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়িত! পতনাতঙ্কিত শিশু পথপ্রান্তে শয্যাভারোপরি হতজ্ঞান!

অবোধ্য বিধির বিচিত্র বিধান, অজ্ঞেয় নিয়তির নিগূঢ় রহস্য! অকস্মাৎ ঠিক সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় ঈশ্বর-প্রেরিতবৎ তথায় উপনীত! অবিলম্বে অচেতন শিশুসন্তানটিকে বক্ষে লইয়া মহাত্মা পার্শ্ববর্ত্তী স্বীয়ভবনে প্রবেশ করিলেন। সমুচিত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা দ্বারা শিশুর চৈতন্যসম্পাদন ও স্বস্তিবিধান করিয়া শরৎবাবুর বাটীতে আনিয়া দিলেন। দর্শনে শ্রবণে সকলেই বিস্মিত বিমোহিত!

"রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহপ্রবেশোৎসব।

১৯১১ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে মার্টিন্ কোম্পানি ৫৬নং কলেজষ্ট্রীটে শরৎবাবুর ব্যবসায়ের নিমিত্ত নূতনগৃহ-নির্ম্মাণ সমাধা করিলেন। মে মাসের প্রথম দিবসই গৃহপ্রবেশের দিন স্থির হইল, এবং সুহৃন্মিত্র শুভাকাঙ্ক্ষী বহুসখ্যাক মান্যগণ্য ব্যক্তি গৃহপ্রবেশোৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত সানুনয়ে নিমন্ত্রিত হইলেন।

১লা, ২রা এবং ৩রা, এই তিনদিনই উৎসবানন্দ চলিল। ঐ দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসবের বিবরণ "Report of the Opening Ceremony of the New Premises of S. K. Lahiri & Co"—নামক সচিত্র পুস্তিকা হইতে যথাসম্ভব অনুবাদপূর্ব্বক নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

(কম্প্যানীর স্বীয় উক্তি)

ইং ১লা মে, ১৯১১, বাং ১৮ই বৈশাখ, ১৩১৮, সোমবার।

ভগবৎকৃপায় আমাদিগের এই ব্যবসায় সপ্তবিংশতি বর্ষকাল চলিয়া আসিল। এতাবৎ কাল আমাদিগের পুস্তকালয় ও কার্য্যালয় সকলই একটি পর্য্যাপ্ত আলোকবিহীন সঙ্কীর্ণ গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকায় অশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। পরমপিতার প্রসাদে এবং আমাদিগের মাননীয় পৃষ্ঠপোষক ও অনুগ্রাহকগণের সহৃদয়তা ও অনুগ্রহফলে, বিগত পঞ্চবিংশতিবর্ষব্যাপী প্রয়াসের পর এইবার আমরা পুস্তকালয় ও কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠার্থ একটি স্বাধিকৃত স্বতন্ত্র ভবন নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

১লা মে প্রাতঃকালে বেলা সাত ঘটিকার সময়ে আমাদের এই নবনির্ম্মিত ভবনের তৃতীয়তল-গৃহে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম্ এ, এম্ বি, মহাশয় কর্ত্তৃক ভগবদ্ উপাসনা কার্য্য যথারীতি সম্পাদিত হইল। ঐ সময়ে শ্রীযুক্তবাবু নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভগবানের স্তুতিগান করিলেন। তৎপরে বেলা সাড়ে আট ঘটিকার সময়ে আজমীঢ়-নিবাসী দুইটি ব্রাহ্মণবালক সুমধুরস্বরে বেদগান করিয়া উপস্থিত মহাশয়গণের চিত্তবিনোদন করিলেন। সংস্কৃত কলেজের

প্রিন্‌সিপ্যাল মাননীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি, মহাশয়ই উক্ত বৈদিক সঙ্গীতগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া দেন।

ঐ দিন প্রদোষসময়ে এই নূতন ভবন বড়ই মনোহর শ্রীধারণ করিয়াছিল। গৃহাভ্যন্তরদেশ বিচিত্র আস্তরণে মণ্ডিত এবং ভিত্তিসমূহ প্রাচীন মহাত্মগণের চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তি সমূহে পরিশোভিত! তন্মধ্যে মহাত্মা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহানুভব রামতনু লাহিড়ী, এই প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহাপুরুষদ্বয়ের তৈল-চিত্রিত বৃহত্তর প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ই সেই বিদ্যুৎ-আলোকিত সুন্দর গৃহের সবিশেষ শোভাসংবর্দ্ধন করিয়াছিল।

এই গৃহপ্রবেশোৎসবের সমগ্র বিবরণ 'বেঙ্গলী,' 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' 'ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস্' প্রভৃতি সংবাদপত্রে যথাযথভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক-মহাশয়গণকে ধন্যবাদ!"

২রা মে, মঙ্গলবার।

সায়ংকালে আমাদের সুহৃন্মিত্র ও সদাশয় পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ সাদুগ্রহে সমুপস্থিত। শ্রীযুক্ত বাবু সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুমধুর সঙ্গীতালাপে সকলেরই চিত্তরঞ্জন করিলেন। প্রীতিসম্ভাষণ ও জলযোগের পর রাত্রি ১০টার সময়ে সভাভঙ্গ হইল।

৩রা মে, বুধবার।

কলিকাতার সমস্ত গ্রন্থব্যবসায়ী মহাশয়গণ ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ সকলেই সানুগ্রহে নিমন্ত্রণরক্ষার্থ শুভাগমন করিলেন। তন্মধ্যে জনৈক মহাশয় সানন্দে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশচ্ছলে কহিলেন,—আমাদের সমব্যবসায়াবলম্বিগণের মধ্যে একজন যে স্বীয় পরিশ্রম ন্যায়নিষ্ঠা এবং সাধুতাফলে আজ এই সহরে একটি স্বাধিকৃত স্বতন্ত্রভবনে তাঁহার কার্য্যালয় ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন, ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই আশা ও আনন্দপ্রদ, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বদিনের ন্যায় অদ্যও সুশীলবাবুর সঙ্গীতশ্রবণ ও জলযোগের পর অভ্যাগত ব্যক্তিগণ রাত্রি দশটার সময়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার।

মার্টিন্ কোম্পানীর মিঃ আর, এন্, মুখার্জ্জি সি, আই, ই, মহাশয় অনবধারিত কালের পূর্ব্বেই এই নূতন গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপনের নিমিত্ত ও নিমন্ত্রিত

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের জলযোগাদির নিমিত্ত সানুগ্রহে সুব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে বড়ই উপকৃত ও বাধিত করিয়াছেন।

আমাদের কয়েকজন কর্ম্মচারীও এই উৎসবকার্য্যের সুচারু সমাধানার্থে সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি।

৫ই মে, ১৯১১। } এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কম্প্যানি।
৫৬নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্য্যবিবরণী ।

১ম। স্তুতিগান,—

মূলতান—আড়াঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল (বিভু)।
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়াছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধিবল।
না গড়িতে এ রসনা, গড়েছ সুমিষ্ট নানা,
ফল শস্য যতকিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।
এ পাষাণ-অন্তরে, তোমারে পাবার তরে,
অযাচিত কৃপাগুণে রোপিয়াছ জ্ঞানবল।

২। সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম্, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক প্রার্থনা।

৩। স্তুতিগান,—

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ ;
শ্রবণ কর করুণা করি, প্রভু, এ স্তুতিগীত ত্বরিত।
শান্তিসুধা সর্ব্বভুবনে বিস্তার, ইচ্ছা তোমার হউক সফল হে ;
অনীতি দুর্নীতি করি অপহৃত, পুণ্যসলিল বরিষ, বরিষ অমৃত।
ভক্তবৎসল তুমি, ভক্ত এই যাচে, মোচন কর সর্ব্ব দুরিত দুষ্কৃত।
কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে, দীনহীন সবে মলিন দুর্ব্বল হে ;
বিঘ্নবিনাশন পতিতপাবন, দেখাও দেখাও হে, তব পুণ্যপথ।
বিশ্বনিয়ন্তা বিভু ন্যায়সিন্ধু, ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে ;
দিব্যপিতা প্রভু পরম কৃপাময়, বিতর সবে শান্তি সুমতি সতত ॥

৪র্থ। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের স্বীয় সম্ভাষণ,—

"মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহাশয় ও অনুগ্রাহক অভ্যাগত ভদ্রমহোদয়গণ!

আজ এই শুভদিনে আমি আপনাদিগের সকলকেই সাদরে সবিনয়ে অভ্যর্থনা করিতেছি। আজ মহাশয়গণ যে সানুগ্রহে শুভাগমন পূর্ব্বক এই সভাশোভন করিয়াছেন, ইহাতে আমি যেরূপ আনন্দিত ও বাধিত হইয়াছি তাহা বাক্যে অপ্রকাশ্য।

২৬ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে গ্রন্থ প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তদনুসারেই ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে আমি এই কারবার আরম্ভ করি। "সাধুতাই সর্ব্ববিষয়ে সার নীতি" এই মহাজনবাক্যে যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়াই আমি এতাবৎকাল আমার এই ব্যবসায়কার্য্য চালাইয়া আসিতেছি। এই ব্যবসায়টিকে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিতে আমাকে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা সামান্য কথায় কাহারও হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া অসাধ্য। যাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কারবার, গত ২৬ বৎসর কাল আমি তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে সাধ্যমতে ত্রুটি করি নাই। সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

অদ্য এই শুভদিনে আমি আমার পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও অনুগ্রাহকগণের নিকট, বিশেষতঃ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি এস্ আই, সর্ রবার্ট্ র‍্যাম্পিনি কে-টি এমএ এলএল ডি (সম্প্রতি সর্ রবার্ট্ ফুল্‌টন্), সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে-টি এম এ ডিএল্ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্‌সেলর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সি এস্ আই (সম্প্রতি সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কে-টি) মহোদয়গণের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইঁহারা চিরদিনই যথাসম্ভব অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে যথেষ্ট কৃতার্থ করিয়াছেন। মহোদয়গণ, আপনাদিগের দশজনের সহায়তাই আমার সর্ব্বসিদ্ধির নিদান। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমি যেন এইরূপ সহায়তালাভে কোনদিনই বঞ্চিত না হই। তিনি আমাদিগকে সর্ব্বকার্য্যই ধর্ম্মানুসারে সম্পাদন করিতে শিক্ষা প্রদান করুন্।

মহাশয়গণ, আপনারা যে এই শুভদিনে সানুগ্রহে এই উৎসবে শুভাগমন করিয়াছেন, এজন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলকেই পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান

করিতেছি। এই মহাজনগণের শুভসংমেলন অবশ্যই আমার ব্যবসায়ের শুভলক্ষণ বলিয়া পরিগণ্য।”

৫ম।—সমবেত ব্যক্তিগণের স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ, এবং উপসংহারে মাননীয় চীফ্ জষ্টিস্ সর্ লরেন্‌স্ জেঙ্কিন্‌স্ মহোদয়ের উক্তি।

সর্ব্বপ্রথমে সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাতলে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

“আমি এই পুস্তকালয়ের একজন পুরাতন খরিদ্দার; এই হেতু আজ এই সভায় সর্ব্বাগ্রে মন্তব্য প্রকাশের অধিকার পাইয়াছি। শরৎবাবু তাঁহার সাধুতার পুরস্কার স্বরূপই স্বীয় ব্যবসায়ে এতদৃশ উন্নতিলাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সম্ভাষণ-প্রবন্ধেও স্বীকার করিয়াছেন যে, সাধুতাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। সাধুত্তম স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বংশে এ বুদ্ধি বিস্ময়কর নহে। আমার পঠদ্দশায় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগরে অধ্যাপকতা করিতেন। আমি সেই মহাত্মার ছাত্র না হইলেও, তাঁহাকে প্রকৃতই গুরুবৎ ভক্তি করিতাম।

উচ্চমনাঃ ইংরাজগণ যে উদ্যমশীল সুযোগ্য সৎপাত্রে উৎসাহ প্রদানে সততই প্রস্তুত, একথা আজ আমাদের মনে আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিতেছে। একজন দেশীয় গ্রন্থব্যবসায়ী আজ তাঁহার স্বদেশবাসী ভ্রাতৃগণের ন্যায় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহাত্মগণেরও নিকট হইতে যে এইরূপ যথেষ্ট সহৃদয়তা সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অসামান্য সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। মাননীয় সর্ লরেন্স্ জেঙ্কিন্‌স্ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্বরূপে ভারতবাসী ও ইংলণ্ডবাসী এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাগণের মধ্যে ন্যায়ের তুলাদণ্ড সমভাবে ধারণ করিয়া আছেন; অতএব আজ এই উভয় সম্প্রদায়ের শুভসংমেলন-সভায় উক্ত মহাত্মাই যে সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা অতি উপযুক্ত ও সমীচান ব্যবস্থাই হইয়াছে।”

অন্যান্য অনেক মহোদয়ের বক্তৃতার পর, সর্ব্বশেষে মাননীয় সর্ লরেন্‌স্ জেঙ্কিন্‌স্, কে-টি, সি আই ই, কে সি, মহোদয় কহিলেন,—

“লাহিড়ী মহাশয় এবং অভ্যাগত সভ্য মহাশয়গণ!

আমি যে এই রমণীয় আনন্দউৎসবে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আমার পক্ষে বড়ই আহ্লাদের বিষয়। আমি ভাবিয়াছিলাম, আজ এক্ষেত্রে আমার স্বতন্ত্রভাবে করণীয় কোন কার্য্যই উপস্থিত হইবে না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে উপসংহারকালীন বক্তৃতা

আমাকেই করিতে হইবে। বস্তুতঃ সর্ব্ববিষয়েরই উপসংহার-সমস্যা প্রায়শঃই সুকঠিন। লাহিড়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বিচারপতি শ্রীযুক্ত কার্ণ্‌ডফ্‌ সাহেব ইতঃপূর্ব্বেই সুন্দর অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমি এখন এইমাত্র স্বীকার করিতেছি যে, লাহিড়ী মহাশয়ের শ্রীবৃদ্ধিতে আনন্দ প্রকাশ করিবার এই শুভযোগ প্রাপ্ত হইয়া আমি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। তিনি যে কলিকাতার প্রধান সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়িগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, ইহাতেও আমি আনন্দিত। তাঁহার ব্যবসায় বড়ই শ্লাঘনীয় এবং প্রীতিকর। তিনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নের ব্যবসায়ী ; ঐ রত্ন অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা জনসমাজের সমধিক প্রীতিপ্রদ ও সমধিক কল্যাণকর। সমুপস্থিত ব্যক্তিগণ যে তাঁহার এই উৎসবে সকলেই সম-আনন্দিত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

* * * * * * *

আজ এই সভায় দেখিতেছি আমার দুই জন ভূতপূর্ব্ব ও চারি জন বর্ত্তমান সহকারীও শুভাগমন করিয়াছেন। ব্যবসায়-গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এরূপ মহাজন-সংমেলন একজন গ্রন্থব্যবসায়ীর পক্ষে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। লাহিড়ী মহাশয়ের এ সৌভাগ্যোদয়ে আমি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। (সভ্যমণ্ডলে আনন্দধ্বনি)।”

সংবাদপত্রের অভিমত।

বেঙ্গলী পত্রিকার উক্তি।

এস্‌, কে, লাহিড়ী এণ্ড কম্প্যানি।

গৃহপ্রতিষ্ঠা,—মহান্‌ সমারোহ !

গত সোমবারে উপরিউক্ত কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের ৫৬ নং কলেজষ্ট্রীটের নবনির্ম্মিত ব্যবসায়-গৃহের শুভ প্রতিষ্ঠা-কার্য্য যথোচিত সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব-সভায় মহামান্য চিফ্‌ জষ্টিস্‌ সর্‌ লরেন্‌স্‌ জেঙ্কিন্‌স্‌ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মার্টিন কোম্পানির তত্ত্বাবধানে সুনির্ম্মিত সেই পঞ্চতল অট্টালিকা ভবনটি, আলম্বিত বিচিত্র বস্ত্রখণ্ডসমূহে সুসজ্জিত ও মনোহর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সমুজ্জ্বল হইয়া, সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল, এবং তথায় মনীষী মহাজনগণের শুভাগমনে সভার শোভা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একজন গ্রন্থব্যবসায়ীর নূতন ব্যবসায়-গৃহ প্রবেশোপলক্ষ্যে, স্বয়ং হাইকোর্টের প্রধান বিচার-

পতি তথা বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব অপরাপর ছয় জন বিচারপতি এবং তদ্ব্যতীত বহু-সংখ্যক গণ্যমান্য বিশিষ্ট বিদ্বন্‌মহাজনের শুভ সমাগম,—এদেশে এ দৃশ্য অবশ্যই অভূতপূর্ব্ব! লাহিড়ী মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সন্তোষ কুমারের এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের যথোপযুক্ত সহায়তায় এই সুবৃহৎ উৎসবব্যাপার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। উৎসব-ভবনের তৃতীয়তলে বিবিধ জলযোগোপকরণ সুসজ্জিত ছিল; সভাভঙ্গে অধিকাংশ সভ্যগণ তথায় সমাহূত হইয়া যথারুচি পরিতর্পিত হইয়াছিলেন।

অভ্যাগত মহোদয়গণের মধ্যে, সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, মাননীয় মিঃ ই ডব্‌লিউ কলিন্‌স, বিচারপতি মিঃ কার্ণ্‌ডফ্, বিচার-পতি শ্রীযুক্ত (সর্) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি মিঃ ফ্লেচর্, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মিঃ (সর্) আর, এন্, মুখর্জ্জি, মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর, রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর, রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর, সি, আই, ই, প্রিন্‌সিপাল্ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বিচারপতি নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান'-পত্রাধ্যক্ষ মিঃ জোন্‌স্ এবং ঠাকুর ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু চিরসুহৃৎ লাহিড়ী প্রভৃতি মহাজনগণই অগ্রগণ্য।

উৎসবারম্ভে ভগবানের স্তুতিগান! তৎপরে প্রিন্‌সিপাল্ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্ এ মহাশয় উপাসনা প্রসঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিলেন। অতঃপর আর একটি স্তুতিগান হইল; সঙ্গীত অন্তে শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার লাহিড়ী মহাশয় সমুপস্থিত সভ্যগণ-সম্বোধন পূর্ব্বক স্বীয় সম্ভাষণপত্র পাঠ করিলেন।

অনন্তর সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে-টি, মহাশয়ের সুমধুর সুযৌক্তিক বক্তৃতা সাঙ্গ হইলে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি মিঃ কার্ণ্‌ডফ্ স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশচ্ছলে লাহিড়ী মহাশয়ের সাধুতা ও শ্রমশীলতার যথোচিত প্রশংসাবাদ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মাননীয় সর্ লরেন্‌স্ জেঙ্কিন্‌স্ অতি মধুর ভাষায় বক্তৃতা-চ্ছলে কহিলেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি সভা-জনগণের যেরূপ সহানুভূতি তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বিচারপতি মিঃ কার্ণ্‌ডফ্ সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

উপসংহারে মাননীয় সভাপতি মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের যশঃকীর্ত্তন করিলেন।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় স্বল্পের মধ্যে মনোহর বক্তৃতাচ্ছলে মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে, সভাভঙ্গ হইল।

"ষ্টেট্স্ ম্যান্।"

সভাসংবাদ।

গত কল্য সায়ংকালে কলিকাতা—৫৮নং কলেজষ্ট্রীট ভবনে গ্রন্থব্যবসায়ী মেসর্স্ এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড্ কম্প্যানির নূতন ব্যবসায়-গৃহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গৃহপ্রতিষ্ঠা-সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন মাননীয় সর্ লরেন্স্ জেঙ্কিন্স্। মাননীয় মিঃ ফ্লেচর, মিঃ কার্ণ্ডফ্ সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত (সর্) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সি এস্ আই, শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, শ্রীযুক্ত সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে-টি, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মিঃ (সর্) আর্ এন্ মুখর্জ্জি, সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর, মাননীয় ই, ডব্লিউ কলিনস্, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র, মিঃ এ জোন্স্, রায় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল, রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর, প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম এ, ডব্লিউ বি, বোগ্, মিঃ বি, নন্দী, মিঃ পি, কর এম্ এ, বাবু যোগেশচন্দ্র দে বি, এল্, প্রভৃতি বহুসংখ্যক মান্য গণ্য ব্যক্তি সমবেত হইয়া সভাশোভন করিয়াছিলেন।

উৎসবারম্ভে ভগবানের স্তুতিগান, তৎপরে প্রার্থনা হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় স্বীয় সম্ভাষণ-পত্র পাঠ করিলে, সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মিঃ জষ্টিস্ কার্ণ্ডফ্ এবং স্বয়ং সভাপতি মহাশয় ক্রমশঃ স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করেন।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় মাননীয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সভাভঙ্গ হইলে আমন্ত্রিত মহোদয়গণের যথাযোগ্য জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান্ ডেলিনিউস্ নামক ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রেও এই উৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

উৎসবোপলক্ষ্যে শরৎ বাবুর শুভানুধ্যায়ী মহোদয়গণের সহানুভূতি-সূচক পত্র।

রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর অনরেবল্ মিঃ সি, ই, এ, ডব্লিউ ওল্ড্হাম সাহেবের পত্রের মর্ম্মানুবাদ,—

"আমি উৎসবে উপস্থিত হইব বলিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্য সহসা জ্বরাক্রান্ত হওয়ায় আমাকে শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছে, এজন্য যাইতে পারিলাম না। আশা করি আপনার উৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইবে।"

হাইকোর্টের বিচারপতি অনরেব্ল্ মিঃ সি, পি, ক্যাস্পার্জ্ প্রেরিত পত্রের মর্ম্মার্থ,—

"ভাবিয়াছিলাম কোন সঙ্গীর সহিত একযোগে যাইব; কিন্তু দুঃখের বিষয় সঙ্গী যুটিয়া না উঠায় যাওয়া ঘটিল না। নবপ্রতিষ্ঠিত গৃহে আপনার ব্যবসায়ের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি হউক, ইহাই কামনা করি।"

আসামের ভূতপূর্ব্ব চিফ্ কমিশনর সর্ হেন্‌রি কটন মহোদয়ের পত্র,—

"প্রিয় শরৎকুমার,—তোমার নূতন ব্যবসায়-গৃহপ্রতিষ্ঠার বিবরণ ইতঃপূর্ব্বেই সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি, সংপ্রতি তোমার প্রেরিত তৎসংক্রান্ত সবিস্তার বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। উত্তরোত্তর তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা জানিবে।"

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চিফ্ জষ্টিস্ সর্ রবার্ট্ ফুলটন্ (র‍্যাম্পিনি) মহোদয়ের পত্র,—

"মহাশয়,—আপনার নবগৃহপ্রতিষ্ঠার বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। আশা করি এই নূতন ভবনে আপনার ব্যবসায়ের নূতনরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইবে। যদি আপনি এই উৎসবের ফটোগ্রাফ্ চিত্র তুলিয়া থাকেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে একখানি পাঠাইয়া দিবেন। * *"

ইংলণ্ডেশ্বরের প্রিভি কাউন্‌সিলের মেম্বর রাইট্ অনরেব্ল্ মিঃ আমির আলি পি, সি, এম, এ, এলএল, ডি, মহোদয়ের পত্র,—

"প্রিয় লাহিড়ী মহাশয়,—আপনার নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে, আমার বন্ধু সর্ লরেন্স্ জেঙ্কিন্‌স্ সভাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন, শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, পুরাতন গৃহের ন্যায় এই নূতন গৃহেও আপনার ব্যবসায়কার্য্যের ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হইবে।"

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি এফ্ ই পার্‌জিটর এস্কোয়ার্ মহাশয়ের পত্র,—

"প্রিয় শরৎবাবু,—"আপনার গৃহপ্রতিষ্ঠার বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া বাধিত হইলাম, এবং ঐ ব্যাপার সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া আনন্দলাভ করিলাম। উক্ত বিবরণীর এক খণ্ড পত্র সর্ উইলিয়ম্ হার্শেল মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়াছি।"

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপাল সি, এইচ্, টনি, এস্কোয়ার্ এম্‌এ, সি, আই, ই, মহাশয়ের পত্র,—

"প্রিয় লাহিড়ী,—তোমার গৃহপ্রতিষ্ঠার বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া বড়ই বাধিত হইলাম। তুমি যেরূপ সদুপায়ে যেরূপ সুসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি। ইহা কেবল বঙ্গদেশের পক্ষে নহে—সমগ্র ভারতের পক্ষেই বড় সুমঙ্গলসূচক। তোমার এই উৎসবব্যাপার প্রসঙ্গে বহুপূর্ব্বের একটি শুভদিনের কথা আমার স্মরণ হইতেছে,—সে দিনে আমি আমার ছাত্র আর একজন লাহিড়ীর সম্মানার্থ প্রতিষ্ঠিত সভাতলে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলাম,—সে ছাত্রটির নাম প্রসন্ন কুমার লাহিড়ী। এইরূপ আরও অনেকের নাম আমার মনে পড়িতেছে,—অনেক দিন পূর্ব্বে হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্‌এ পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্যে বিশিষ্টরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—না? সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, এস, আই, মিঃ (সর্) জষ্টিস্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সি, এস, আই প্রভৃতির কথাও একে একে মনে পড়িতেছে। * * *"

এতদ্‌ব্যতীত এফ্, বি, হাড্‌লি বার্ট্‌ স্কোয়ার, বিএ, এফ্‌আর জি এস্, আই সি এস্, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্‌সেলর সর্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেটি, এম্‌এ, ডিএল, সি, আই, ই, সর্ আলফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ কে, সি, আই, ই, বেঙ্গল রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সিনিয়র্ মেম্বর ডব্‌লিউ, বি, ওল্‌ড্‌হাম্, ইউরেনস্ বা হার্শেল্ গ্রহের আবিষ্কারক সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ স্বর্গীয় মহাত্মা ডাক্তার হার্শেল সাহেবের সুযোগ্য পৌত্র এবং নদিয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব সেসন্‌স্ জজ্ সর্ ডব্‌লিউ, জে, হার্শেল সাহেব এবং পুনা-ফর্গুসন্ কলেজের প্রিন্‌সিপাল্ ফার্ষ্ট্ র‍্যাঙ্গ্‌লার প্রোফেসর্ আর্ পি পরাঞ্জপে এম্ এ, বিএ (ক্যান্টাব্) প্রভৃতি সুপণ্ডিত মহাত্মমণ্ডলী শরৎকুমার বাবুর গৃহপ্রতিষ্ঠার আনন্দোৎসবে পূর্ব্বোক্তরূপ পত্র দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করেন।

তৎসমূহের মধ্যে বিলাত হইতে হার্শেল সাহেবের প্রেরিত পত্রখানি ও শ্রীযুক্ত ওল্‌ড্‌হাম্‌ সাহেবের প্রেরিত পত্র দুই খানি বড়ই প্রীতিজনক ও উৎসাহপ্রদ। এই হেতু অতঃপর ঐ দুইখানি পত্রের অবিকল অনুলিপি প্রদত্ত হইল ;—

শ্রীযুক্ত হার্শেল্‌ সাহেবের পত্র,—

"I have been, at times, reading to myself and family, the very interesting account you sent me of the Ceremonial Opening of your new premises as a Publisher and Book-seller. I assure you that the story it tells is one of keen concern to an old Indian (as we call ourselves) like me. It tells us, in a way, that I never did, in fact, know, during my life among you, of a progress in industrial enterprize which we longed to see ; and it tells us also of the preservation in that progress of the truly national spirit of religious devoutness, which perhaps we did not so much care about as we would have done, if we had known of its working among you by such descriptions as this. Perhaps it was not working quite in the way here told us about to-day. From what I read about Bengal now I may be allowed to say, without lessening my strong sympathy with your own action on this occasion, that I trust, you are not alone in this open combination of true industry with God-fearing worship. The opening hymn is in a true key. The world and all nature, above all, our own amazing bodies—all at our disposal, to work our will with them as we please ;—but—but—but —with devout regard to the Will of Him who fashioned us and our environment,—এই মানসে যে আমাদের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা সফল হয়. The second hymn completes this great thought. Sir Gooroodass's simile about vulgar literature is unfortunately too true. An unwholesome book you can throw into the ditch : you cannot ask unwholesome questions of a true friend.

In my old age I have just pubiished a book which you will, I am sure, dip into with reverence for its subject ; and not, I hope, without sympathy for the motive of its composi-

tion. Accept it, I beg you, with all good wishes for prosperity and শান্তি."

বার্কসায়ের
১৫ই জুলাই, ১৯১১।

Believe me,
Yours sincerely

উল্লিখিত পত্রগর্ভস্থ বাঙ্গলা কথাগুলি মহাত্মা হার্শেলের স্বহস্তে বঙ্গাক্ষরে লিখিত ছিল। ঐ হস্তলিপি অনেক বাঙ্গালী যুবকের হস্তলিপি অপেক্ষা সুন্দর ও সুস্পষ্ট।

শ্রীযুক্ত ওল্ড্‌হাম সাহেবের পত্রদ্বয় ;—

"My Dear sir,—The Report of the Opening Ceremony of your New Premises, which your note of the 11th May says, has been sent to me, has not arrived, but I had already seen an account of the proceedings in my "Statesman", and was much gratified by their eclat. Such an assemblage at the opening of a Publisher's premises is quite unprecedented, and in your case, it was a tribute to you as well as to your revered Father. He and you have counted foremost among those who help towards solidarity in India,"

With kind regards, believe me,
Yours sincerely
(Sd.) W. B. Oldham.

"My dear sir,—Many thanks for my copy of the Report of the proceedings at No. 56, College street of 1st, 2nd, and 3rd May. I am particularly pleased to see the many expressions of good will you have had from old friends and wellwishers in England. The fact is that occasions and occurrences like this make us, who have passed so much of our lives in Bengal, full proud of Bengal, as we felt, though in a different way, at the news of the recent victories of the Mohan Bagan foot ball team. They dispose of the ideas that Bengal is a land either sunk in meditation, or only roused from it to talk or write. I hope that with its newfound activities and powers, the characteristic by which Bengal is best remembered by me will no way dimimish, I mean its kindliness.

Meanwhile may your firm, the development of which has been so remarkably celebrated, last as long as Calcutta lasts!"

Yours sincerely
(Sd.) W. B. Oldham.

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমার বাবুর সদ্‌গুণ ও সৎকীর্ত্তি।

শরৎবাবু শুভক্ষণে মাতৃপ্রদত্ত দুই শত মুদ্রা মূলধন অবলম্বনে ব্যবসায়ারম্ভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে তদবধিই শুভগ্রহের সুবাতাসে অনুকূল প্রবাহে তরীবাহন করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি নিজমুখে কহিয়াছেন,—"ব্যবসায়ারম্ভের আনুমানিক ছয় মাস পরে দেখিলাম, আমার তহবিলে কপর্দ্দকও নাই, বাজারেও দেনা বা পাওনা কিছুই নাই; দোকানে তখনও বিক্রেয় পুস্তক যতগুলি আছে, বিক্রয় করিলে কোনরূপে মাতৃদেবীর দুই শত টাকা উঠিতে পারে। বেঙ্গলীপত্রে বিজ্ঞাপন চলিতেছে বটে, কিন্তু এতাবৎকালের মধ্যে একটিও অর্ডার আসে নাই। ভগ্নোৎসাহ হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ বসন্তকুমারের সহিত পরামর্শ করিলাম,—আর ব্যবসায়ে কাজ নাই, এখনও মায়ের দুই শত টাকা বজায় আছে; আগামী কল্য আসিয়া মজুত পুস্তকগুলি দোকানদারের ঘরে বিক্রয় করিয়া মায়ের টাকা মাকে প্রত্যর্পণ করাই এক্ষণে যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু পরদিন আসিয়া দোকান খুলিয়া দেখি, একখানা পত্র পড়িয়া রহিয়াছে; পড়িয়া দেখিলাম—পুস্তকের অর্ডার্! নৈরাশ্য-নীরস অন্তরে সহসা আশা-নীরধারা ছুটিল। মুহূর্ত্তে পূর্ব্বসঙ্কল্প বিস্মৃত হইয়া গেল। সোৎসাহে সে দিন অর্ডারের পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিয়া ভি, পি, ডাকে পাঠাইয়া দিলাম। তৎপরদিন দুই তিনটি অর্ডার আসিল, তৃতীয় দিনে পাঁচ সাতটি, এইরূপে প্রায় প্রত্যহ দেড় শত বা দুই শত টাকার অর্ডার আসিতে লাগিল। তখন বুঝিলাম, বেঙ্গলীর বিজ্ঞাপন বিফল হয় নাই। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে গ্রন্থবিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহার পরেও, কখন স্বীয় বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ, কখন পরের প্রবঞ্চনাবশতঃ, কখন বা সাধুতা ও সুনামরক্ষার্থে, অনেকবার আমাকে অনেক ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছে। ব্যবসায়ের উন্নতিমুখে কঠোর শ্রমনিরত হইয়া কখন কখন নিয়মিত আহারনিদ্রাও ত্যাগ করিতে হইয়াছে।"

শরৎ বাবুর শেষ জীবনেও দেখিয়াছি, তিনি রাত্রি চারিটার সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপুর্ব্বক কার্য্যোদ্দেশে গৃহবহির্গত হইতেন, এবং বেলা

দশটা এগারটার সময়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্নানাহারান্তে দোকানে গিয়া বসিতেন, আর কোন দিন রাত্রি দশটা, কোন দিন বারটা কোন দিন বা একটা পর্য্যন্ত অবিরাম কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি বিবিধ কার্য্যব্যস্ততা ও দেনাপাওনার ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও কখন বিরক্ত হইয়া কাহাকেও কটুমুখে কর্কশবাক্য কহিতেন না, বা প্রসন্ন বই অপ্রসন্ন থাকিতেন না। কর্ম্মচারিগণ কোনরূপ অপ্রিয়াচরণ করিলে বা কোন ক্ষতিকর কার্য্য করিলে যদি কখন তিরস্কার করিতেন, অবসরক্রমে আবার তাঁহার নিকট তজ্জন্য নিরভিমানে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। সে সময়ে তাঁহার আচরণ একেবারে সরলচিত্ত বালকের ন্যায় বোধ হইত; কে প্রভু, কেই বা কর্ম্মচারী, তাহা তখন বুঝিতে পারা কঠিন।

এই সরল ব্যবহার ও সবিনয়ভাব তাঁহার পৈতৃক সম্পৎ। আর একটি বিশিষ্ট সদ্‌গুণ ছিল,—তিনি বাড়ীতে শত চিন্তা ও শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রফুল্ল মনে এক একবার গুন্ গুন্ করিয়া কোন ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি পদ আবৃত্তি করিতেন; দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হইত, তাঁহার অন্তরে নিরন্তর নিগূঢ় ব্রহ্মসুখানুভূতি ও আত্মপ্রসাদ বর্ত্তমান! এই গুণটিও তাঁহার পুরুষপরম্পরা-কৃত সাধনায় স্বভাবসিদ্ধ।

দানে ও অভাবীর অভাব-মোচনে শরৎবাবুর আন্তরিক আগ্রহ দেখা যাইত; কিন্তু বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণ ব্যতীত তাঁহার বদান্যতা-বৃত্তান্ত অন্যে সহসা অবগত হইতে পারিতেন না। কখন কখন তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণও তাঁহার দানের বিষয় জানিতে পারিতেন না। অনেক দরিদ্র ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয়ের বেতন পাঠ্যপুস্তক, কখনও বা গ্রাসাচ্ছাদন দিয়াও সাহায্য করিয়াছেন। হাতে অর্থের অনটন, পাওনাদার আসিয়া হয়ত ফিরিয়া যাইতেছে, সে সময়েও অভাবী অভাব জানাইলে, দয়ার্দ্র রামতনু-পুত্র যথাশক্তি সে অভাব মোচনে ত্রুটি করেন নাই, বা তিনি যে তখন নিজেও অভাবী, তাহা যাচককে জানিতে দেন নাই।

বুভুক্ষুর অন্ন শরৎকুমারের অন্নপূর্ণা-শালায় সতত প্রস্তুত থাকিত। শিবদ্বারে কুষ্ঠীর সমাগমও স্বল্প ছিল না। শরৎবাবু কদাপি উপদেশ-ব্যপদেশে আহার-দানে অনিচ্ছাপ্রকাশ বা তাহাদিগের প্রতি অসমাদর প্রদর্শন করিতেন না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাঁহার অনেক অনাহূত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়বন্ধু আপদ্‌বিপদে আসিয়া ("Claimed kindred there, and had his claims allowed.") তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন, তিনিও যথাসাধ্য কায়িক বাচিক বা আর্থিক সাহায্যে তাঁহাদের বিপদুদ্ধারে যত্নবান্ হইতেন। এমন দিন দেখিতে

পাই নাই, যে দিন মহাত্মা শরৎকুমার পরোপকারার্থে অন্যূন দু' চারি টাকা ব্যয় বা অন্ততঃ দু' এক ঘণ্টা স্বয়ং শ্রমস্বীকার করেন নাই। পরোপকারার্থে কাহারও নিকট কোন উপরোধ অনুরোধ জানাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইলেও, তিনি তাহা স্বীয় গৌরবহানিকর বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার এবংবিধ নিত্য ও নৈমিত্তিক দান বা পরোপকার-ব্রতের কথা সাধারণে প্রকাশিত হইবার বিষয়ে তিনি একান্ত উদাসীন ও অনিচ্ছুক।

শরৎবাবু সর্ব্বান্তঃকরণে পিতৃভক্তিমান্ ছিলেন। পিতা বর্ত্তমানে তিনি যথাশক্তি তাঁহার সেবাপরায়ণ ছিলেন, এবং অবর্ত্তমানে যথারীতি তাঁহার পারলৌকিক সংক্রিয়া সম্পাদনে কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পিতার আদ্যকৃত্যে ও প্রতিবার্ষিককৃত্যে সাধুপুত্র শরৎকুমার সময়োচিত উপাসনা অন্নদান অর্থদান ইত্যাদি সদনুষ্ঠান আন্তরিক ভক্তি সহকারে সুসম্পন্ন করিতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শরৎবাবুর অমায়িক বিনয়নম্রতায় ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া অনেক আনুষ্ঠানিক সুব্রাহ্মণ তাঁহার এই পিতৃশ্রাদ্ধো-পলক্ষ্যে তাঁহার বাটীতে শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে শুদ্ধভাবে স্বয়ং বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিবেশন করিয়া ব্রাহ্মণ-পক্ক ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণাস্পৃষ্ট দ্রব্যাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন।

গোঁড়া হিন্দুগণ হয় ত এ কথায় নানা কুতর্ক উত্থাপিত করিয়া তথাবিধ ব্রাহ্মণগণকে নিতান্ত অব্রাহ্মণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, আবার গোঁড়া ব্রাহ্মগণও হয় ত শরৎবাবুর উক্তরূপ ব্রাহ্মণভোজন কপটতার লক্ষণ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবেন। আমরা অনেকেই কিন্তু তথাবিধ ব্যাখ্যাকারক হিন্দু ও ব্রাহ্মগণকে সাধারণ সমাজদ্রোহী সর্ব্বজনীন সদ্ভাব-ভঙ্গকারী স্বস্ব সাম্প্রদায়িক ভণ্ডামির পাণ্ডা বলিয়াই অবধারণ করিব।

শরৎবাবু তাঁহার স্বর্গগত মাতাপিতার স্মৃতিরক্ষার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিয়ৎপরিমাণ অর্থ দান করিয়াছিলেন; ঐ অর্থ হইতে প্রতিবর্ষে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে এবং তথাবিধ ছাত্রীকে একখানি করিয়া পদক প্রদত্ত হইয়া থাকে। ছাত্রদত্ত পদক-খানির নাম "রামতনু লাহিড়ী পদক"; এবং ছাত্রীদত্ত পদকের নাম "গঙ্গামণি পদক"। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার স্বপ্রকাশিত "Lahiri's Select Poems" নামক ইংরাজি কবিতা পুস্তকখানির সম্পূর্ণ স্বত্ব চিরদিনের নিমিত্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া উহার উপস্বত্বে বাঙ্গলা সাহিত্যতত্ত্বের একজন

বিশিষ্ট উপাধ্যায় নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে বাঙ্গলা সাহিত্যাধ্যাপক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে উক্ত নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শরৎবাবুর স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামানুসারে উক্ত উপাধ্যায়-পদের নাম হইয়াছে "Ramtanu Lahiri Research Fellowship in the History of Bengali Language and Literature."

শরৎবাবুর এই শেষোক্ত দানের উদ্দেশ্যটি বড়ই সুমহৎ। একাল পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে কোন দানশীল ব্যক্তিই এতাদৃশ গুরুতর ত্যাগস্বীকার বা এরূপ কোন সুব্যবস্থা করেন নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, মাতৃভাষানুরাগী মহাত্মা শরৎকুমার বঙ্গসমাজে এ এক নূতন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বকীয় কায়িক শ্রমফলদ্বারা এই নিত্যফলপ্রদ মহাশ্বথ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিশ্চিতই বঙ্গবাসিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শরৎকুমারের এই রাজোচিত সংকীর্ত্তি শরচ্চন্দ্র-মরীচিবৎ বঙ্গসমাজকে বহুকাল সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে, এবং বঙ্গবাসিগণ বহুকাল ব্যাপিয়া এই শুভানুষ্ঠানের বহু প্রকার শুভফল উপভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত কবিতাপুস্তকখানি তাঁহার ব্যবসায়ের একটি প্রধান উপকরণ ছিল, উহাতে তাঁহার বার্ষিক আয় যথেষ্টই হইত। একটি জমিদারের পক্ষে জমিদারির কিয়দংশ দান এবং শরৎ বাবুর পক্ষে ঐ পুস্তকখানির চিরস্তন উপস্বত্বদান একই কথা। তিনি যতই ধনবান্ হউন না কেন, শ্রমোপজীবী ভিন্ন পৈতৃক ঐশ্বর্য্যভোগী ছিলেন না। তাঁহার মাত্র মাতৃভাষার্থে এরূপ দান বড়ই শ্লাঘনীয়, বড়ই ঔদার্য্যের পরিচায়ক। ইতঃপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ব্যবহারশাস্ত্র, সংস্কৃত বেদান্তশাস্ত্র প্রভৃতির পর্য্যালোচনার্থে কোন কোন মহাত্মা এইরূপ দান করিয়া সাধু দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ধনিসমাজে শরৎ বাবু ঐ সকল মহাত্মগণের নিতান্ত নিম্নশ্রেণিক হইলেও, দাতৃসমাজে নিশ্চিতই তাঁহার আসন আজ উঁহাদিগের সমশ্রেণীতেই উন্নীত হইয়াছে; অথবা আনুপাতিক বিচারে তদূর্দ্ধেও নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

সর্ব্ব প্রথমে খ্যাতনামা স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যাপনাকল্পে মৃত্যুর পূর্ব্বে বিনিয়োগপত্র দ্বারা তিন লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। এই বদান্য বরণীয় মহাত্মার মাহাত্ম্য-ফলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর ল-লেক্‌চারের প্রতিষ্ঠা। অদ্যাবধি বঙ্গবাসিগণ অবাধে উহার ফলভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার অন্যান্য সংকীর্ত্তিও সামান্য নহে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুর—

কলিকাতা—পাথুরিয়া ঘাটার ৺গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিয়া গড়ে প্রতিবর্ষে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, কিছু দিন গবর্ণমেণ্ট-প্লীডারের কার্য্যও করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট্ তৎকালে নিষ্কর ভূমি বাজেআপ্ত করিবার প্রস্তাব করিলে, মহাত্মা প্রসন্নকুমার "বেঙ্গল হরকরা" নামক সংবাদপত্রে ঐ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু, সে প্রতিবাদে কোন ফল হইল না, গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই ব্যাপারে সরকারী তহশীলদারগণের অত্যাচার-অপন্যায় বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া, কলিকাতা টাউন হলে নিষ্কর ভূম্যধিকারিগণের একটি সভা সমাহূত করিয়া উক্ত বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। বিরাটসভার ব্যাপার শুনিয়া তৎকালীন গবর্ণর জেনেরাল্ লর্ড্ অক্‌লাণ্ড্, পাছে লাটভবন আক্রান্ত হয় ভাবিয়া, আশঙ্কিত হইলেন, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেই ব্যাপারের সংবাদ লইতে লাগিলেন। আন্দোলন-ফলে এক তায়দাদ্-ভুক্ত পঞ্চাশ বিঘার অনধিক নিষ্কর ভূমিগুলি অব্যাহতি পাইল। এইরূপ ভূমি অদ্যাবধি "ন্যূন-খালাশি" নামে অভিহিত।

লর্ড্ ডালহৌসির শাসনকালে ব্যবস্থাপক সভার প্রথম সৃষ্টি, এবং প্রসন্নকুমার ঐ সভার (Clerk Assistant) ক্লার্ক্ আসিষ্টাণ্ট্ পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে অনেক রাজবিধি প্রণয়ন উপলক্ষ্যে তিনি গবর্ণমেণ্টকে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন, বাঙ্গালীর মধ্যে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইবার সৌভাগ্যও সর্ব্বপ্রথমে ইঁহারই ঘটে, কিন্তু নিতান্ত পীড়িত থাকায় উক্ত সভায় একদিনও যোগদান করিতে পারেন নাই।

সুপণ্ডিত প্রসন্নকুমার সংস্কৃতশাস্ত্রের বড়ই অনুরাগী ছিলেন, ব্যবহারশাস্ত্রে ও জমিদারি কার্য্যেও ইঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ইনি মৃত্যুকালে ব্যবহার

শাস্ত্রের অধ্যাপনাকল্পে যেমন তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া যান, তেমনই মুলাজোড়ের সংস্কৃত বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণের নিমিত্ত ৩৫০০৲ টাকা, তথায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার্থে এক লক্ষ টাকা, আত্মীয় স্বজনকে এক লক্ষ নয় হাজার টাকা এবং নিজ কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণকে এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা দান করিয়া যান। এতদ্ব্যতীত জীবিতকালেও বিস্তর টাকা দান করিয়াছিলেন।

তরুণ বয়সে প্রসন্নকুমার "অনুবাদক" নামে একখানি বাঙ্গলা ও "রিফর্মার" নামে একখানি ইংরাজি সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং স্বয়ং ঐ পত্রদ্বয়ের সম্পাদক থাকিয়া রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে দায়-বিষয়ক ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে ইঁহার বিশিষ্টরূপ যত্ন ও উৎসাহ ছিল, এবং সর্ রাজা রাধাকান্ত দেবের পর ইনিই উক্ত সভার সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হন।

মহাত্মা প্রসন্নকুমার অসাধারণ মাতৃভক্ত মহাপুরুষ। কথিত আছে, তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবীর স্বর্গলাভের পর, তদীয় নিত্য ব্যবহার্য্য রজতনির্ম্মিত পালঙ্ক-খানি পাছে অপর কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়, এই আশঙ্কায় মুলাযোড়ে তাঁহার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ীদেবীর সেবার্থে ঐ পালঙ্কের উৎসর্গ করেন। মুলাযোড়ের ঠাকুরবাটীর সংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়টি অদ্যাবধি এই মহাত্মারই প্রদত্ত মূলধন দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসন্নকুমার তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত করিয়া, প্রথমতঃ ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন, তদন্তে ঠাকুরবংশের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান। পরে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ৩০শে আগষ্ট তারিখে মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুর পরলোক প্রাপ্ত হইলে, ক্রমশঃ তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া মোকদ্দমা বাঁধিয়া উঠে। বহুদিন ধরিয়া মোকদ্দমা চলিবার পর প্রিভি কৌন্সিলের বিচারে সিদ্ধান্ত হইল যে, যতীন্দ্রমোহন নিজ জীবন-কাল পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি ভোগদখল করিবেন, কিন্তু তাঁহার জীবনান্তে জ্ঞানেন্দ্রমোহনই উহার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

মহারাজ সর্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের

শ্বেতপ্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিন্দে অদ্যাবধি বিদ্যমান। দানশীল প্রসন্নকুমার-কৃত দানের মধ্যে "ঠাকুর ল-লেক্‌চার" প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ে দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং মহাত্মা প্রসন্নকুমারই এইরূপ সদনুষ্ঠানের পথপ্রদর্শক।

ইদানীং পটলডাঙ্গার বসু-মল্লিক-বংশসম্ভূত স্বর্গীয় মহাত্মা শ্রীগোপালবসু মল্লিক মহাশয়ও স্বর্গীয় প্রসন্নকুমারের মহৎ দৃষ্টান্ত-অনুসরণে বেদান্ত শাস্ত্রানুশীলনের নিমিত্ত মৃত্যুর পূর্ব্বে বিনিয়োগ পত্রদ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ দান করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তিন বৎসরের নিমিত্ত এক এক জন করিয়া বেদান্তাধ্যাপক মাসিক ১২৫৲ টাকা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত থাকিয়া ধারাবাহিক উপদেশ প্রদান করিবেন। প্রত্যেক অধ্যাপক তিনবৎসর অন্তে ১৪০০৲ টাকা পাইবেন; ঐ টাকার দ্বারা তৎপ্রদত্ত উপদেশগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া, ৪০০ খানি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১০০ খানি বন্ধুবর্গমধ্যে বিতরণ করিবার নিমিত্ত উক্ত বসুমল্লিক মহাশয়ের বংশের প্রতিনিধিকে দান করিবেন; অবশিষ্ট টাকা অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। দাতার অভিপ্রায়ানুসারে বৃত্তির নাম হইল "শ্রীগোপাল বসু-মল্লিক স্কলারশিপ্।" যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে, তাবৎকাল স্বর্গীয় সদাশয় মল্লিক মহাশয়ের এই সৎকীর্ত্তি সমগ্র বঙ্গে সুঘোষিত রহিবে।

মহাত্মা মল্লিক মহাশয়ের পর এ প্রকারের দান করিয়াছেন কেবল দরিদ্র রামতনুপুত্র কৃতকর্ম্মা মহানুভব শরৎকুমার লাহিড়ী। প্রসন্নকুমার দান করিয়াছিলেন ইংরাজি ব্যবহারশাস্ত্রের অনুশীলনার্থে, শ্রীগোপাল দান করিয়াছেন সংস্কৃত বেদান্ত শাস্ত্রার্থে, শরৎকুমার দান করিলেন তাঁহার মাতৃভাষা বাঙ্গলার উন্নতিকল্পে! প্রাগুক্ত অতুলঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মদ্বয়ের দান স্ব স্ব নামরক্ষার্থে স্ব স্ব নামে অভিহিত, শেষোক্ত শ্রমোপজীবী স্বাবলম্বী সাধুসত্তমের দান স্বীয় স্বর্গগত পুণ্যশ্লোক পিতৃদেবের পুণ্যার্থে এবং তাঁহারই পুণ্যনাম প্রচারার্থে! বলিতে ইচ্ছা হয়, শরৎকুমারের দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ!

আশা করি, যাবৎ বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত থাকিবে, তাবৎকাল বঙ্গবাসী শরৎবাবুর এই "রামতনুলাহিড়ী-রিসার্চ্‌ ফেলোশিপ্" প্রতিষ্ঠার উপকারিত্ব উপলব্ধি করিবেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আধুনিক বঙ্গের বিবিধ ব্যাপার।

শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের অন্তিমাংশে বঙ্গে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে লর্ড্ কর্জ্জন্ কৃত বঙ্গবিভাগ ও লর্ড্ হার্ডিঞ্জের সময়ে কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানীর পরিবর্ত্তন এই দুইটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ব্যাপার উপলক্ষ্যে ক্রমশঃ দেশে অনেক অনিষ্টাপাত হইয়াছে। ঐ বঙ্গবিভাগ-ব্যাপার সেই সমস্ত অনিষ্টের হেতু না হইলেও, ঐ উপলক্ষ্যেই যে দেশে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের অশেষ বিষময় ফল প্রকাশ পাইবার অবসর পাইয়াছে, ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তি-মাত্রেরই অনায়াসে অনুমেয়। পক্ষান্তরে বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ উপলক্ষ্যেই দেশের অন্তঃসঞ্চিত রোগবীজ উপযুক্ত সময়েই নির্দ্ধারিত ও নিরাকৃত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। নচেৎ, না জানি, এই গুপ্তবীজ হইতে কালে কি সর্ব্বনাশাত্মক বিষবৃক্ষের সমুদ্ভব হইয়া সমগ্র দেশকে উৎসাদিত করিত!

এই বঙ্গবিভাগের কিয়ৎকাল পরেই লর্ড্ হার্ডিঞ্জের শাসনসময়ে বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত পঞ্চম জর্জ্ ও সম্রাট্‌মহিষী মহামান্যা শ্রীল শ্রীমতী মেরী ভারতে শুভাগমন করেন। এই সময়ে উভয়ের অভিষেক উপলক্ষ্যে দিল্লী নগরীতে মহাসমারোহে দরবার-অধিবেশন হয়; এবং এই দরবারেই কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইবার আদেশ প্রচারিত হয়। অতঃপর দিল্লীনগরীই ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হইল; কলিকাতা মাত্র বঙ্গদেশের রাজধানী রহিল। এই সময়ে বাঙ্গলার ছোটলাটের পদ উঠিয়া গেল, এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের ন্যায় বঙ্গদেশও একজন গবর্ণরের শাসনাধীন হইল। মহামতি লর্ড্ কারমাইকেল বঙ্গের প্রথম গবর্ণর হইলেন।

প্রথমতঃ কলিকাতা হইতে ভারত-রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া যাওয়ায় কলিকাতার ক্ষতি হইবে বলিয়া অনেকের মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু, বস্তুতঃ দেখা গেল, রাজধানী-পরিবর্ত্তনে কলিকাতা নগরীর ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি বই অধোগতির কোনই কারণ হয় নাই। এক্ষণে আশা করা যায়, এইরূপ ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র শাসকের অধীনে বঙ্গদেশের সুখসমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিমে ও পূর্ব্বে মাত্র দুইটি রেলপথ ছিল, ইদানীং পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও মধ্যবঙ্গে অনেকগুলি রেলপথ খুলিয়াছে, এবং অনেক স্থানেই ষ্টীমার-যাতায়াত হইয়া থাকে। দার্জ্জিলিং হইতে বঙ্গোপসাগর অথবা চট্টগ্রাম হইতে বিহার পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভ্রমণকারীকে এখন ভূমিতে পদার্পণ না করিলেও চলিতে পারে।

এই সকল রেললাইন ও ষ্টীমারলাইনের ফলে বঙ্গের বাণিজ্যকার্য্যে অনেক সুবিধা ও উন্নতিসাধন হইয়াছে, অনেক পুরাতন কুপল্লী সুনির্ম্মল নাগরিক শ্রী ধারণ করিয়াছে, অশিক্ষিত অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের সুব্যবস্থা হইয়াছে, এবং সমগ্রদেশের আচারব্যবহার রীতিনীতি জল্পনাকল্পনা বেশবিন্যাস প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই একতাসাধন হইতেছে; এতদ্ভিন্ন পোষ্টঅফিসের যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি এবং মণিঅর্ডার, টেলিগ্রাফ্ টেলিগ্রাফিক্ মণিঅর্ডার, সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সৃষ্টিহেতু লোকের সুখসুবিধার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

কলিকাতার পশ্চিমে ও হুগলীর পূর্ব্বে গঙ্গার উপর ইদানীং যে দুইটি সুপ্রশস্ত সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কোন স্থানেই এরূপ সুন্দর সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। সম্প্রতি পদ্মানদীর উপর সাঁড়াঘাটে রেলগাড়ীর যাতায়াত নিমিত্ত যে অপূর্ব্ব সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, উহাতে পাশ্চাত্য শিল্পনৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় যথেষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে।

পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বঙ্গে সাধারণ লোকের তথা শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী বণিক্ ও স্বর্বৃত্তিধারীর সংখ্যাও তেমনই বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং বলিতে বড়ই লজ্জা ও দুঃখবোধ হয় যে, বিলাসিতা ব্যভিচার মাদকসেবন প্রবঞ্চনা সমাজদ্রোহ রাজদ্রোহ প্রভৃতি নানাবিধ পাপ-প্রবৃত্তি এবং অস্বাস্থ্য ও অভাববোধও বর্ত্তমান বঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক বই ন্যূন নহে।

রাজবিধির সীমাতিক্রম না করিয়া স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে কোনরূপ উপায়াবলম্বনেই আর এখন লোকের সাধারণতঃ পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মভয় বা সামাজিক লজ্জাভয় নাই। সহরগুলিতে সামাজবন্ধনের অধিকতর শিথিলতা হেতু ব্যভিচারমাত্রা বড়ই অধিক।

ফলতঃ নানাবিধ ধর্ম্মসংস্কার ও শিক্ষাবিভাগীয় শতচেষ্টা সত্ত্বেও সাধারণ বঙ্গের নীতি ও চরিত্র দিন দিন যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, ইহা অনেকেই অনুমান করিতে পারেন; তৎফলে, সর্ব্বসুখ-নিদান স্বাস্থ্য ও শান্তি যে ক্রমশঃ বঙ্গভূমি

হইতে অন্তর্হিত হইতেছে, তাহাতেও আমাদের দৃক্‌পাত বা চৈতন্যোদ্রেক নাই। না জানি, বর্ত্তমান বঙ্গের পরিণাম কতই ভয়াবহ!

বঙ্গীয় বর্ত্তমান নারীসমাজের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে। কুমারীগণের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনে যেরূপ বিলাস-বাসনার সঞ্চার হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের ভাবিজীবনে সুখশান্তি-প্রত্যাশা নিতান্তই অল্প। উচ্চ অঙ্গের বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ বড় বড় ডাক্তার উকিল বারিষ্টার জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মুন্সেফ ইত্যাদির পত্নীই প্রস্তুত হইতেছে, সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থপত্নী তথায় দুষ্প্রাপ্য; দেশে প্রয়োজন কিন্তু শেষোক্তেরই সমধিক।

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের স্বর্গীয় শরৎবাবুর বর্ণিত একটি কাহিনীর স্মরণ হইতেছে, সাধারণের অবগতির নিমিত্ত উহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

শরৎবাবু কোন একটি পিতৃহীন কুমারীকে নিজব্যয়ে বেথুনবিদ্যালয়ে পড়াইতেন, কুমারীর অন্যান্য ব্যয়ও অনেক সময়ে শরৎবাবুকে বহন করিতে হইত। ক্রমে বালিকা যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে সমুত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পাঠ করিতে লাগিল, সেই সময়ে শরৎবাবু মনে মনে বিচার করিলেন,— কুমারীকে যখন এতদিন প্রতিপালন করিলাম, এক্ষণে বিবাহযোগ্যাও হইয়াছে, তখন এই সময়ে আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে ইহাকে একটি সৎপাত্রে সম্প্রদত্ত করিয়া যাইতে পারিলে ইহার ভাবিজীবনের গতিনির্দ্ধারণ হইয়া যায়।

সেই সময়ে শরৎবাবুর সন্ধানে একটি সৎপাত্রও ছিলেন। পাত্রটি সবে এম, এ, পাস্ করিয়া মাসিক ১০০৲ একশত টাকা বেতনে প্রোফেসরি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, স্বাস্থ্য সুন্দর, স্বভাব সুনির্ম্মল।

শরৎবাবু কুমারীর অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত কোন বিশিষ্ট আত্মীয়ার দ্বারা উক্ত পাত্রের বিষয় জ্ঞাপন করাইলে, মদগর্ব্বিণী কলেজ-কুমারী উত্তর করিলেন,—

"সবে এম্ এ পাস করিয়া সামান্য ১০০৲ টাকা বেতন পাইতেছে,—সে বেটা আবার বিবাহ করিতে চায় কোন্ বিবেচনায়?"

শরৎবাবু শুনিয়া অবাক্!

কুমারীর উত্তরের নিগূঢ় অর্থ এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত পাত্রটি এম্ এ পাস করিয়াছেন মাত্র, এক্ষণে বিলাত গিয়া, বয়সে কুলায় ত সিভিলিয়ন্, নচেৎ ডাক্তার বা বারিষ্টার হইয়া আসিয়া, অন্ততঃ মাসে তিন চারি শত টাকা,

অথবা তদভাবেও দেশে থাকিয়াই প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, অন্ততঃ মাসে দুইশত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলে, তবে তিনি সেই বালিকার বিচারে বিবাহযোগ্য বা তাহার নিজ বরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন।

এইরূপ বিলাসিনীগণের দ্বারা দেশের দুর্দ্দশাবৃদ্ধি ব্যতীত সুমঙ্গল-সম্ভাবনা কিরূপে আশা করা যাইতে পারে?

কেবল শিক্ষিতা বালিকাগণের প্রতি নহে, এ দোষ শিক্ষিত বালকগণের প্রতিও সমানে আরোপিত হইতে পারে। তবে কি সর্ব্বদোষ শিক্ষাপ্রণালী-মূলে? শিক্ষাবিধানের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সমীপেই আমাদের এ বিষয়ের বিচার ও প্রতিবিধান প্রার্থনীয়।

একদিন,—সে অনেক দিনের কথা,—স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ডে প্রকাশ্য সভাতলে সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতাচ্ছলে এই মর্ম্মে কহিয়াছিলেন,—ইংলণ্ড ভারতকে তাঁহার সর্ব্ব সদ্‌গুণ শিক্ষা দিন্, তাহাতে ভারতের উপকার বই অপকার হইবে না, কিন্তু আমাদের গৃহিণীগণকে যেন বিলাসিতার শিক্ষা না দেন, ইহাই মাত্র প্রার্থনা। ভারতের দরিদ্র-কুটীরে গাউন্ ফ্রক্ প্রভৃতি রাখিবার স্থানসংকুলান হইবে না।

তৎকালে সেন মহাশয়ের উক্ত বক্তৃতায় সভাতলে সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়াছিলেন,—আমরাও সে সংবাদ শুনিয়া গৃহে বসিয়া মাত্র হাসিয়াছিলাম; আজ দেখিতেছি, সেই ভাববাদী মহানুভবের তথাবিধ ভয়সূচক ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকৃতই সফল হইবার সুস্পষ্ট সূচনা! প্রকৃতই আমাদের নিরন্ন পর্ণকুটীরে গাউন্ প্রবেশের উপক্রম! আমরা নিরুপায়! উপায় মাত্র শিক্ষাবিধাতৃগণের করায়ত্ত।

আমরা শিক্ষার উপক্রমকালেই প্রলোভন পাইয়াছি,—"লেখা পড়া শিখে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।" এক্ষণে চড়িব কি, চাপা পড়িবার আশঙ্কাই পদে পদে!

তথাপি কিন্তু কি শিক্ষার্থী কি অভিভাবক, সাধারণতঃ সকলেরই চক্ষে শিক্ষার চরম লক্ষ্য রহিয়াছে ঐশ্বর্য্যলাভে। চাকরীই হইয়াছে সে লক্ষ্যলাভের প্রশস্ত পথ। দাসত্ব করিয়াই প্রভুত্ব করিব, ইহাই আমাদের বড় সাধ! আমরা যে যত বড় চাকর হইতেছি, সে মনে মনে তত বড় প্রভু সাজিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছি। আমাদের এই দুরাকাঙ্ক্ষা ও প্রভুত্বলিপ্সার মাত্রা এত অধিক হইয়াছে যে, আমরা এক্ষণে তন্মদে মত্ত হইয়া সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়াছি; কেবল আত্মবিস্মৃত নহে, পরশ্রীকাতরতা এবং পরদ্রোহ-প্রবৃত্তিও

আমাদের বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। শুনিয়াছি, প্রচীনকালে কোন কোন ধৃষ্ট-বুদ্ধি রাজপুত্র পিতৃপদ-গৌরবে ঈর্ষাপরায়ণ ও স্বয়ং প্রভুত্বলাভে প্রলুব্ধ হইয়া পিতার অসামর্থ্য ও নিজের সামর্থ্য কালের পূর্ব্বেই পিতৃদ্রোহ ও পিতৃহত্যা রূপ মহাপাপাচরণে চিরকলঙ্ক কিনিয়াছেন; আমরাও সম্প্রতি সেইরূপ প্রলুব্ধ ও ধৃতিচ্যুত হইয়া তদ্রূপই ঘোর পাপাচরণে সমুদ্যত! স্বজাতি স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের মর্য্যাদা ভুলিয়া তুচ্ছ বিজাতীয় বৈদেশিক আদর্শে বিমোহিত হইয়া বিদ্রোহকেই শান্তিসৌভাগ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছি। আমরা অগাধে পতিত সত্য, কিন্তু যে আমাদের সমীপাগত, যাহাকে ধরিয়া উদ্ধারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, আমরা অধীর উদ্ধত হইয়া আশু-পরিত্রাণাশায় অগ্রে তাহাকেই ডুবাইতে উদ্যত! ঈদৃশ বৈদেশিক বিধর্ম্মবুদ্ধি ধর্ম্ম-ভূমি ভারতে কখনই শুভদায়ক হইবে না।

অধর্ম্মোপায়ে আততায়িতায় আত্মোন্নতিসাধন নিতান্তই কাপুরুষের চেষ্টা ও অধঃপাতেরই উপায়ান্তর মাত্র। অপরে—পামরে ঈদৃশ কাপুরুষাচারে পরম পৌরুষ জ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু লক্ষাধিক বর্ষ ব্যাপিয়া যে দেশের ব্যোম চতুর্ব্বেদমন্ত্রে নিশিদিন মুখরিত হইয়াছে, যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া যে দেশের মরুৎ পবিত্র হোমগন্ধ দিগ্‌বিদিক্ বহন করিয়াছে, যে দেশের অগ্নি রাশি রাশি সমিৎসর্পিতে সন্তর্পিত হইয়া সুপবিত্র হোমধূমে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে, যে দেশের গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধুকাবেরী প্রভৃতির পবিত্র সলিলপ্রবাহে সমন্তাৎ সর্ব্বকাল কল্মষাপসরণ করিতেছে, যে দেশের পুণ্যভূমি শশ্বৎকাল তুলসী তালতমাল শালপ্রিয়াল পলাসপনস আম্র আমলকী হরিতকী বিভীতকী প্রভৃতি সুপবিত্র সুফলপ্রদ তরুসমূহে সমাকীর্ণ, সোমাদি সর্ব্বৌষধি-জালে সমাচ্ছন্ন, সপ্তধাতু ও নবরত্নাকরে সুমণ্ডিত, যে দেশে উপনিষৎ সংহিতা ষড়্‌দর্শন রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থের উৎপত্তি ও নিত্য আবৃত্তি, যে দেশ চিরদিন ব্যাস বাল্মীকি বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র দাশরথি বাসুদেব ভীষ্ম যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন, তথা ধ্রুব প্রহ্লাদ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি আদর্শ-মহাপুরুষের অবতার-ক্ষেত্র, সে দেশে আজ দুর্দ্দিনের বৈদেশিক দৃষ্টান্তে বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতুকতা ইত্যাদি কাপুরুষোচিত আশ্বত্থামিক আততায়িবৃত্তি পৌরুষপরিচয়ে প্রপূজিত হইতে পারে না। এ দেশেই হউক বিদেশেই হউক, আততায়িতায় বিদ্রোহিতায় আপাত-মনোহর অভীষ্টলাভ হইলেও, উহার পরিণাম নিশ্চিতই ঘোর বিপৎপাতক।

দুরাশা দুরাকাঙ্ক্ষার কুহকে পড়িয়া বঙ্গদেশের অনেক শিক্ষিত যুবক আজ

পরম পৌরুষজ্ঞানে কাপুরুষনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, এমন কি উপার্জ্জিত স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্যাকে নিজ নিজ পাপবুদ্ধির অনুসারিণী করিয়া লইয়া, শাস্ত্রের অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইয়া, স্ব স্ব কুপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দান করিতেছেন, আশ্রয়শাখা-চ্ছেদনই অবরোহণের উৎকৃষ্ট কৌশল বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু এ কেবল আশুমৃত্যুরই প্রশস্ত পন্থা!

আমরা বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানাভিমানে মনে করিতেছি যে, না জানি কতই আত্মোন্নতিসাধন করিয়া আজ সশরীরে স্বর্গসোপানে অধিরোহণ করিতেছি, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, আমাদের কি ব্যক্তিগত কি সমাজগত উন্নতি, কই, কিছুই ত হইতেছে না! আমাদের শরীর অসুস্থ, আয়ুঃ স্বল্প, চিত্ত চঞ্চল, চরিত্র কলুষিত, গৃহ নিরন্ন অশান্তিময়, সমাজ শত পাপস্রোতে প্লাবিত! তথাপি আমরা জ্ঞানী, তথাপি আমরা উন্নত! এ কাল অভিমান কোথা হইতে আসিল!

এই অভিমানে মত্ত হইয়া আমরা উপাধ্যায় অভিভাবক শাসক শাস্ত্রকার সকলকেই উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ উদ্ভাবিত অভিনব পথে পদার্পণ করিতে একান্ত আগ্রহান্বিত! আপনাদিগকে গুরু হইতেও গরীয়ান্ জ্ঞান করিয়া হিতৈষীর হিতোপদেশ-বাক্যেও অবহেলা প্রদর্শন করিতেছি! আত্মপরীক্ষা অন্তর্দৃষ্টি বিচার বিবেচনা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতিকে কাপুরুষ-লক্ষণ জ্ঞানে পরিহার করিয়া অবোধ পতঙ্গের ন্যায় পাবককেই পরমাশ্রয় জ্ঞান করিতেছি! এ দুর্ম্মতি বিষম দুর্গতিরই অবতরণিকা।

আমাদের সমাজে ইতঃপূর্ব্বে এরূপ কুপ্রথা কদাচার অনেক ছিল, যাহা এখন আর নাই বলিলেই হয়, কিন্তু নূতন নূতন পাপাচার কি তত্তৎ স্থান অধিকার করে নাই? পূর্ব্বের অশিক্ষিত বঙ্গসমাজে কন্যাবিক্রয়পদ্ধতি বড়ই বীভৎস ছিল, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতসমাজে পুত্রবিক্রয়ীর সংখ্যা যে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে! শিক্ষিত বঙ্গের বিবাহ-হাট যে ক্রমশঃ গো-হাটায় পরিণত! তথাপি আমরা শিক্ষিত সমুন্নত!

প্রাচীন অশিক্ষিত বঙ্গের নারীনিগ্রহ বড়ই দুষ্প্রবৃত্তির পরিচায়ক সত্য, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত বঙ্গসমাজ হইতে কি সে পাপ তিরোহিত হইয়াছে? সহরে বাজারে হতভাগিনী বারবিলাসিনীর সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? আমাদের নিগ্রহফলে না অনুগ্রহফলে? তথাপি কি আমরা শিক্ষিত সমুন্নত?

কোন একটি বিশিষ্ট দুর্ঘটনা উপলক্ষ্যে কোন একজন ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ

মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার একটি ইংরাজবন্ধুকে, দেখিলাম, পত্রপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,— "এদেশের বালিকাগণ শ্বশুরালয়ের বিষম নিপীড়নে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। তাই দিন দিন বারাঙ্গনা-সংখ্যার এত বৃদ্ধি!"

ইংরাজ বন্ধুমহাশয় মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের পত্রাংশটুকু আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন; আমি অবাক্ অধোবদন!—ছি ছি, তথাপি আমরা শিক্ষিত সমুন্নত!

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ অন্যান্য অনেক দোষ ইংরাজপ্রভৃতি উন্নতজাতির সমাজেও বর্ত্তমান।

যদি তাহাই সত্য হয়, তথাপি সে আপত্তি উত্থাপনে আমাদের অব্যাহতি কোথায়? আমাদের উন্নতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানাভিমানের ভিত্তি কোথায়?

তুমি গাঁজা খাও কেন?—দাদাও ত খাইয়া থাকে,—এরূপ তর্ক ত কেবল বিদ্বেষ-বুদ্ধিরই পরিচায়ক। ইহাতে কি গাঁজার মাদকত্ব বা অপকারিত্ব কিছু কমিয়া থাকে, না গঞ্জিকাসেবীর কৃতিত্ব কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে?

পূর্ব্বোক্তরূপ নানাদোষে আমাদের বর্ত্তমান তথাভিহিত শিক্ষিত বঙ্গসমাজ এখনও কলুষিত, আমরা শিক্ষিত হইয়াও স্বার্থপরায়ণতা হেতু ঐ সকল দোষ পরিহার করিতে অপ্রবৃত্ত, অনিচ্ছুক। ন্যায়বান্ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ যদি এ সকল অত্যাচার ব্যভিচার অপনয়নে প্রয়াস পান, তখন, 'ওই, রাজা আমাদের সমাজ-ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলেন!'—বলিয়া আমরা অশান্ত বালকের ন্যায় কাঁদিয়া জয়লাভ করিতে ও কোলাহলে পল্লী হুলুস্থুল করিতে সবিশেষ তৎপর! তবে আর এ সকল সামাজিক অত্যাচারের প্রতীকার-প্রত্যাশা কোথায়?

কিন্তু আমাদের নিঃসন্দেহে জানিয়া রাখা উচিত যে, আমরা আত্মসংশোধনে এইরূপ অচৈতন্য থাকিলে এমন দিন সত্বরই আসিবে, যে দিন সামাজিক নিপীড়কগণের আপত্তিচীৎকার অপেক্ষা নিপীড়িতগণের আর্ত্তনাদ অধিকতর শ্রুতিপীড়ক হৃদয়বিদারক হইবে, এবং দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট্ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ সকল বীভৎস অত্যাচারের প্রতীকারচেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

আমরা শিক্ষিত হইয়া থাকি, সুখের কথা, কিন্তু শিক্ষার সম্যক্ ফললাভ করিতে হইলে, অভিমান পরদ্রোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মদর্শী আত্ম-সংশোধক হইতে পারিলে, তবেই ত জানিব, শিক্ষায় আমাদের সমুন্নতি হইতেছে। নতুবা ত 'পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।'

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গের বর্ত্তমান বর্ণবিপর্য্যয়।

প্রাচীন কালে বঙ্গে তথা সমগ্রভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা যেরূপ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে আর সেরূপ নাই। সহসাই আমাদেব মনে হয়, পূর্ব্বে আমরা বর্ব্বব ছিলাম, এক্ষণে জ্ঞানালোকে আমাদের মূর্খতা-জনিত কুসংস্কাররূপ অন্ধকার দূর হইয়াছে, আমরা মানুষে মানুষে ইতর-বিশিষ্টত্ব আর মানি না, মনুষ্যসমাজের মধ্যেই একদল দেবতা, একদল মানুষ, একদল পশু সাজিয়া পরস্পরের প্রতি তদনুযায়ী উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট ব্যবহার করিবার জঘন্য প্রবৃত্তি আর আমাদের নাই, এক পরম পিতার সন্তান হইয়া আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই বসিব, একের বৃত্তিতে অপরের অধিকার থাকিবে না, একের আলোচ্য বিষয় অপরের অনালোচ্য হইবে ইত্যাদিরূপ পরস্পরের সহিত পার্থক্যবিচার আমাদেব ইদানীন্তন উদাব অন্তঃকরণে আসিতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা কি উক্তরূপ উদারতার অধিকারী হইয়াছি? উদরপূরণে উদারতাপ্রদর্শন জ্ঞানী অজ্ঞানী, মনুষ্য পশুপক্ষী, সকলেরই পক্ষে অনায়াস-সাধ্য; চণ্ডালেব অন্ন ব্রাহ্মণের নিকটে সবিশেষ দুর্ভক্ষ্য বা দুষ্পাচ্য নহে,—গলাধঃকরণে বাধা নাই, জীর্ণ হইতেও অধিক কাল বিলম্ব হয় না, বা উদরাময়াদিও উৎপত্তি কবে না। অতএব সেরূপ ক্ষেত্রে উদারতা প্রদশন আমরা অনায়াসেই কবিতে পারি, কখন কখন কেহ কেহ বা করিয়াও থাকি; কিন্তু অপরাপর বিষয়ে,--নিজ নিজ ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদা পদমর্য্যাদা বা স্বার্থসংঘটিত সমস্যাস্থলে সেরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতে পারি কই?

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ মনুষ্যসমাজমাত্রেই স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক দেশেই প্রত্যেক জাতিতেই প্রত্যেক সমাজেই কিয়দংশ লোক দৈবাবলম্বী ও দেবসেবাপরায়ণ, কিয়দংশ স্বাবলম্বী পুরুষকার-বৃত্তি সুতরাং রাজ্যৈশ্বর্য্যপরায়ণ, কিয়দংশ সংসারোপাসক গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রাহক কৃষিবাণিজ্যাদিপরায়ণ, অবশিষ্টাংশ উক্ত ত্রিবিধবৃত্তি-বিমুখ, পরপিণ্ডোপজীবী সুতরাং পরসেবাপরায়ণ। সংসাবরক্ষার্থ সমাজরক্ষার্থ দেশরক্ষার্থ উক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যবসায়ের ও চতুর্ব্বিধ ব্যবসায়ীরই সম প্রয়োজন সুতরাং সমান সমাদর।

বিদ্যালয়ের নিম্নোচ্চ শ্রেণিবৎ প্রয়োজনীয়তা-বিচারে এই ব্যবসায় বা ব্যবসায়ি-চতুষ্টয়ের মধ্যে ইতরবিশিষ্টত্ব বা হেয়োপাদেয়ত্ব কিছু নাই সত্য, কিন্তু সাধনীয় বিষয়েব গুরুত্বলঘুত্ব অনুসারে তথা সাধনে অন্তঃশক্তির প্রয়োজনীয়তানুসারে উক্ত সাধকশ্রেণিচতুষ্টয়ের মধ্যে সামাজিক মর্য্যাদার বিলক্ষণ ইতরবিশিষ্টত্ব থাকা সম্ভবপর, এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্য প্রভৃতি প্রত্যেক সমাজেই তাহা চিরদিন আছে। এই চাতুর্ব্বর্ণ্য বা বর্ণাত্মক মর্য্যাদা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণিবিশেষের বিদ্বেষ-বুদ্ধি বা স্বার্থবুদ্ধি-কল্পিত নহে, ইহা মনুষ্যসমাজের সহজ ধর্ম্ম। এই জন্যই শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদুক্তি আছে,—'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যাদি"। তবে উক্তরূপ মর্য্যাদার অপব্যবহার অবশ্যই ব্যক্তিগত বা সমাজগত ব্যভিচার।

আমরা ভাবিতেছি বটে, ইদানীং অসবর্ণের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন পানভোজন শয়নোপবেশনাদি অভ্যাস করিয়া আমরা দিন দিন উদারতা ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের মধ্যে জাতিভেদ ক্রমশঃ অতি কদর্য্যমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে!

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে জাতিগত বিদ্বেষের দিনদিনই বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। আদৌ ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু কালক্রমে যতই তাঁহারা আচারভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন, ততই স্বার্থ ও পূর্ব্বপ্রাধান্য রক্ষার্থ নানারূপ অলীক ভীতিপ্রলোভন-প্রদর্শক কল্পিতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া অপরাপর জাতিকে পদদলিত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ ত একবারেই অধঃপতিত, তথাপি তাঁহারা পূজ্য!—এইরূপ কল্পনাই বর্ত্তমান শিক্ষিত বঙ্গে ব্রাহ্মণেতর জাতিমধ্যে সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্বেষের বাচনিক হেতু। তাঁহারা ঐ রূপ হেতুবাদে তাঁহাদের বিদ্বেষজাত বুদ্ধিকে সুবিচারসিদ্ধ ন্যায়সঙ্গত বুদ্ধি বলিয়া বচনে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেও, আচরণে সপ্রমাণ,—ব্রাহ্মণগণ যতই অধঃপতিত হউন না কেন, যাবৎ তাঁহারা ব্রহ্মকুলে জাত তাবৎ তাঁহারা যে ঐ সকল ব্রাহ্মণেতর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা ঐ সকল জাতীয় ব্যক্তি নিজ নিজ অন্তরে জানেন ও মানেন। এবং সেই জ্ঞান ও মননই তাঁহাদের অন্তর্বিদ্বেষোৎপত্তির হেতু। তৎফলেই আজকাল এদেশের শিক্ষিত ব্রাহ্মণেতর জাতিমধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণের সাযুজ্য না সামীপ্য লাভের নিমিত্ত বড়ই লালায়িত।

বিশেষতঃ, প্রাচীন কালে শূদ্রজাতীয় ব্যক্তিগণ যেমন ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন; যে দিন হইতে প্রকাশ যে, শূদ্রগণ এদেশের পরাজিত অনার্য্যজাতিসম্ভূত বলিয়াই তাঁহারা (Servile class) দাস-

শ্রেণীরূপে পরিগণিত, সেই দিন হইতেই তাঁহারা সেরূপ না করিয়া, এই দাসত্ব বা শূদ্রত্ব-পরিবাদ পরিহারের নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্‌ভাবন করিতে প্রবৃত্ত। কেহ সপ্রমাণ করিতেছেন,—আমরা পতিত ক্ষত্রিয়, প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক পুনঃসংস্কার গ্রহণে অধিকারী; কেহ কহিতেছেন,—আমরা মুনির সন্তান, কর্ম্মদোষে পতিত, সুতরাং বর্ত্তমান আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণের প্রায় সমকক্ষ, কেহ বা বুঝাইতেছেন,—আমরা যোগিবংশোদ্ভূত অতএব ব্রাহ্মণ। ইত্যাদিরূপ মতপ্রচার করিয়া কেহ ক্ষত্রিয় বা দ্বিজ হইতে যাইতেছেন, আবার হয়ত তদপেক্ষা নিম্নজাতিক ব্যক্তিও আপনাকে ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া উক্তরূপ ক্ষত্রত্বাভিমানীকেও নিজের নিকৃষ্ট বলিয়া পরিহার করিতেছেন। যিনি দ্বিজত্বলাভের কোন সুযোগই পাইতেছেন না, তিনি অন্ততঃ নিজ পুরুষানুক্রমপ্রচলিত 'দাস'.পদবীটি লিখিবার সময়ে দন্ত্য'স'কারের পরিবর্ত্তে তালব্য 'শ' লিখিয়া দাসত্ব কলঙ্ক হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিতেছেন। জগতের দাস বা সেবক, এ সুখ্যাতি লাভ করিবার নিমিত্ত আজকাল অনেকেই আগ্রহান্বিত, কিন্তু স্বদেশীয়ের—স্বজাতীয়ের দাসত্ব স্বীকারে অনেকেরই আপত্তি। কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা যতই জঘন্য দাস্যবৃত্তিগ্রহণ করি না কেন, সামাজিকক্ষেত্রে স্বভ্রাতৃবর্গের মধ্যে লঘুত্বস্বীকার,—সে যেন বড়ই বিড়ম্বনা!

আবার, ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও কৌলীন্য-নিন্দা অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ অনেকেই কুলীন বলিয়া পরিচিত হইতে প্রয়াসী! আজকাল এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যে, রায় চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য ঘটক পাঠক সমাদ্দার জদ্দার প্রভৃতি বিপ্রবর্গের শিক্ষিত পুত্রগণ সমাজমধ্যে (বিশেষতঃ বিবাহসময়ে) মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিয়া স্বীয় কাল্পনিক কুলীনোচিত পরিচয় প্রদানে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জাবোধ করেন না, বরং শ্লাঘা-জ্ঞানই করেন। এইরূপে, কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্তির নিমিত্ত সকলেরই আন্তরিক লালসা, কিন্তু সকলেরই মুখে কৌলীন্যপ্রথার শতনিন্দাবাদ! সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমরা ব্রাহ্মণনিন্দা কুলীননিন্দা যে যতই করি না কেন, সে সমুদায়ই মৌখিক এবং ঈসপ্-বর্ণিত শৃগালের দ্রাক্ষানিন্দাবৎ ("The grapes are sour!")।

শিক্ষিত বঙ্গসমাজে যাঁহারা জাতিভেদ অমান্য করেন, তাঁহাদের মধ্যেও আমরা কখন কখন কপটাচার দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হই। কখন কখন দেখিতে পাই, জাতিভেদ-অস্বীকারী মহাশয়েরাও পুত্রের বা কন্যার বিবাহসময়ে

প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বা সবর্ণের পাত্র বা পাত্রীরই অনুসন্ধান অগ্রে করিয়া থাকেন, তদভাবে, অথবা অধিকতর স্বার্থসিদ্ধি সম্ভাবনাস্থলে, নীচবংশের সহিত আদানপ্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না; এমন কি শয়নোপবেশনেও অনেক জাতিভেদবিরোধী ব্যক্তিকে নিতান্ত নীচবংশোদ্ভব স্বসম্প্রদায়ভুক্ত ভদ্রব্যক্তির সঙ্গ প্রকারান্তরে পরিহার করিতে দেখা গিয়াছে।

পূর্ব্বোক্তরূপ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, পরস্পরের নিন্দাবাদ, স্বস্ব প্রাধান্য-লিপ্সা ও কপটাচার কি বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের উন্নতি ও উদারতার পরিচায়ক? যে কোন মণ্ডলীই হউক না কেন, তাহাতে যদি একের প্রাধান্যে অপরের ঈর্ষা লালসার উৎপত্তি হয়, সে মণ্ডলীর পরিণাম কি দৃঢ় একতাবন্ধন, না ছত্রভঙ্গ? শত শত সামাজিক কপটাচার সত্ত্বেও কি স্বীকার করিব, এই নবযুগের বাঙ্গালী—আমরা আর কাপুরুষ নহি, শিক্ষামাহাত্ম্যে সৎসাহসী হইয়াছি, বীর হইয়াছি? ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতাই কি এ যুগের বীরত্ব? স্বজাতি মধ্যে সকলেই প্রধান সাজিতে চাই, একের প্রাধান্য অপরের অসহ্য, তথাপি কি ভাবিব যে, বাঙ্গালী জাতির অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী?

আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের এই সকল কলঙ্ক যদি কেহ ভিত্তিহীন বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চান, করুন্‌, আপত্তি নাই, এবং ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে আমাদের সমাজ নিষ্কলঙ্ক হউক ইহাই প্রার্থনা; কিন্তু যদি যথার্থ আত্মপরীক্ষায় আমরা প্রকৃত দোষী বলিয়াই নির্দ্ধারিত হই, তবে আমাদের লজ্জার পরিসীমা নাই। কিন্তু নির্লজ্জ আমরা আমাদিগের দাম্ভিকতাকে তেজস্বিতা, শঠতাকে সুমার্জ্জিতবুদ্ধি এবং অধঃপাতকে উন্নতি মনে করিয়া আত্মশ্লাঘায় উন্মত্ত! আমাদের একমাত্র পরিত্রাণোপায় পরদোষকীর্ত্তন, অর্থাৎ আমরা এই মাত্র বলিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিতে চাই যে, ঐরূপ দোষসমূহ অনেক উন্নতিশীল সমাজেও বর্ত্তমান।

যদি তাহাই সত্য হয়, তাহাতেও আমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী প্রতিপন্ন না হইয়া, বরং সেই সকল দোষান্বিত বর্ত্তমান উন্নতিশীল সমাজেরও ভবিষ্যৎ অধঃপতন অদূরবর্ত্তী বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু, পরের প্রতি দোষারোপণের পূর্ব্বে এ কথাও স্মরণ করা উচিত যে, দোষান্বিত চক্ষে জগৎসংসার সকলই দুষ্ট বলিয়া সহসা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বেষ-হিংসা প্রাধান্যপ্রিয়তা কপটতা প্রভৃতি সমাজপাতক কুপ্রবৃত্তিনিচয় বাঙ্গালীসমাজে বহুল বিদ্যমান থাকিলেও, তন্মধ্যে এরূপ মহাত্মাও অনেক সম্প্রদায়ে অনেক আছেন, যাঁহাদের চরিত্র মাত্র যে ঐ

সকল কাপুরুষলক্ষণবর্জ্জিত তাহা নহে, বরং তৎপরিবর্ত্তে সমাজশ্রীসংবর্দ্ধক এবং স্বস্ব পৌরুষপ্রকাশক অসংখ্য সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত।

বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত বঙ্গসমাজে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্তরূপ দোষরাহিত্য ও সদ্‌গুণশালিত্ববিচারে,—আমরা শত আপত্তি উপেক্ষা করিয়াও স্পর্দ্ধার সহিত স্বীকার করিব,—সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই দুই মহাত্মাই মুখ্যপাত্র। যদি আজ আমাদিগের শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়কে কেহ কপটাচার কাপুরুষ সম্প্রদায় বলিয়া নিন্দা করেন, আমরা ঐ দুই মহাত্মাকেই উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ আমাদের শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়া নির্ভয়ে নিন্দকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্ব করিতে পারি। কিন্তু, হায় হায়, নির্বোধ আমরা কখন কখন ঈর্ষাবশে ঈদৃশ শিরোরত্নেও অযত্ন করিতে লজ্জাবোধ করি না; কূপমণ্ডূক আমরা মাতঙ্গকেও, চতুষ্পদ অতএব স্বগণান্তর্গত জ্ঞান করিয়া, কখন কখন কদাকার কিম্ভূতশ্রী বলিয়া অবজ্ঞা করিতে অগ্রসর হই! সাধে কি বলি, বাঙ্গালী আমরা স্বভ্রাতৃ-শ্রীবৃদ্ধি সহ্য করিতে পারি না? সাধে কি বলি, বাঙ্গালী আমরা উন্নত নহি, এখনও অধঃপতিত? উপরিউক্ত উভয় মহাত্মার পুণ্যজীবনী এই গ্রন্থে ইতঃপূর্ব্বেই সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে স্বজাতিবিদ্বেষ স্বধর্ম্মোপেক্ষা কপটাচার প্রভৃতি দোষ-বিচারে হিন্দু অপেক্ষা মুশলমান সম্প্রদায় যে অধিকতর প্রশংসার্হ, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকল মুশলমানই সাধারণতঃ স্বধর্ম্মবিশ্বাসী স্বজাতি-অনুরাগী এবং অভীরুভাবে স্বধর্ম্মাচারী। এই জন্যই,—পরস্পরের অন্নগ্রহণ জন্য নহে,—আমাদের বঙ্গীয় মুশলমান ভ্রাতৃগণ সকলেই অদ্যাপি এক-জাতি; এবং ঐ সকল গুণাভাবেই,—অন্নবিচার জন্য নহে,—হিন্দুগণ নানাজাতি। এ সকল গুণে মুশলমানগণ সাম্যবাদী ব্রাহ্মসম্প্রদায়কেও পরাজিত করিয়াছেন। অবশ্য, আমাদের ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ সকলেই যে কপটাচার, বা সকলেরই যে স্বধর্ম্মে অনাস্থা তাহা বলিতেছি না, কিন্তু মুশলমান ভ্রাতৃগণের ন্যায় তাঁহাদের সাম্যবাদ, অকপটাচার এবং স্বধর্ম্মানুরাগ-প্রতিষ্ঠা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে যথার্থ সাম্যবাদ অকপটাচার স্বধর্ম্মানুরাগাদি সদ্‌গুণ-শালিতার আদর্শস্বরূপ আমরা নির্ভয়ে নিঃসন্দেহে শতপ্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া—

(দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।)

—মহাত্মা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-

-মহাশয়ের চরিত্র সগৌরবে বর্ণন করিতে পারি। শাস্ত্রীমহাশয়ের শুভ জন্ম ২৪ পরগণার অন্তর্গত চাংড়ীপোঁতা গ্রামে তদীয় মাতুলালয়ে। 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার মাতুল, পিতার নাম হরানন্দ বিদ্যাসাগর, নিবাস উক্ত জেলার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে। পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাতেজস্বী পুণ্যবান্ ব্যক্তি ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রকৃতই পিতৃপুণ্যবলে বলীয়ান্।

শিবনাথ সংস্কৃত কলেজ হইতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নবযৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অদ্যাপি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্মেই সমানে নিষ্ঠাবান্ রহিয়াছেন।

কেশব প্রতাপ বিজয়কৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ব্রাহ্মভ্রাতারই অন্তর্জীবনে তথা বহির্জীবনে আমরা অনেক সময়ে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি। এইরূপ নানা সম্প্রদায়ে নানা ব্যক্তিরই নানারূপ মতপরিবর্ত্তন আচারপরিবর্ত্তন সাধারণতঃই দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু শান্ত সদাশিব শিবনাথ আমাদের যথার্থই যেন ব্রাহ্মসমাজের এক অব্যয় অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যবস্তু, অবিচল পবিত্র বিগ্রহ! একাল সেকাল সকল কালেই শিবনাথ সমান সাম্যবাদী সাধারণব্রাহ্ম; ইহাই তাঁহার অনন্যসাধারণ অসাধারণত্ব! তাঁহার বিশুদ্ধ ব্রাহ্মত্ব যেন সুপবিত্র সুরধুনীর ব্রহ্মবারি,—কালাকাল স্থানাস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে সমান সুধীর সুপবিত্র প্রবাহে অনন্ত মহাসাগরাভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর!

পুত্রের ধর্ম্মান্তরপরিগ্রহ হেতু নিষ্ঠাবান্ তেজোয়ান্ হিন্দুপিতা তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিলেন, তেজীয়ান্ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মপুত্রও পৈতৃক বাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পিতার সহিত একত্র বাস করিয়া তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করা বা তাঁহাকে সমাজে নিগৃহীত করা পুত্রের পক্ষে একান্ত অনুচিত, তাই সুপণ্ডিত পুত্র মায়িক মমত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অম্লানবদনে মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানেই পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া

জন্মস্থান হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইয়া কলিকাতায় দীনভাবে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পিতাপুত্রে বিরোধভাব চলিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কেবল পুত্রকে স্বধর্ম্মে পুনরানয়ন নিমিত্ত তেজীয়ান্ পিতার দুরন্ত ষড়্‌যন্ত্রফলে; ফলতঃ তৎপরে পিতার পুত্রস্নেহ বা পুত্রের পিতৃভক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও ক্রটী লক্ষিত হয় নাই। পিতাও পুত্রকে গুণবান্ বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ও স্ববিবেকানুসারী সৎপুত্র মনে করিয়া গৌরব জ্ঞান করিতেন, পুত্রও তাঁহাকে স্বধর্ম্মানুরাগী স্ববিবেকানুসারী সুমহান্ পিতৃদেবতা মনে করিয়া যথার্থই দেববৎ ভক্তি করিতেন।

পিতা হরানন্দ অকপট তেজীয়ান্ হিন্দু ছিলেন, পুত্র শিবনাথও তেমনই অকপট তেজীয়ান্ ব্রাহ্ম হইলেন। তিনি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক বিধি যথাশক্তি মানিয়া চলিতেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তিনি সুপণ্ডিত, সৎসাহসী, উদ্যমশীল, নিষ্ঠাবান্ ও নির্ম্মলচরিত্র, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের তথা সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের অলঙ্কার, একথা অবনত মস্তকে স্বীকার্য্য। তাঁহার কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজের তথা বঙ্গসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন কোচবিহারের মহারাজের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেওয়ায়, উক্ত বিবাহে ব্রাহ্মবিধি অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ প্রধান প্রধান কতকগুলি ব্রাহ্ম সেনমহাশয়ের সঙ্গ ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসামাজ" নামে এক স্বতন্ত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাবধি শাস্ত্রী মহাশয়ই এই সমাজের প্রধান আচার্য্য।

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেব আচরণে কখন কখন অনেকে সন্দিহান হইতে পারেন সত্য, তাঁহাদের প্রচার ও আচার সর্ব্বদাই সর্ব্ববিষয়ে পরস্পর অবিরোধী বলিয়া সকলের নিকট প্রতিপন্ন না হইতেও পারে সত্য, কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন মহাত্মা কে আছেন, যিনি দীক্ষাবধি প্রচারের সহিত স্বীয় আচারের যথাসম্ভব সামাঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি বাহিরে যেমন ব্রাহ্ম অন্তরেও তেমনই ব্রাহ্ম, যিনি সমাজ-বেদিতেও যেমন বক্তা গৃহ-পরিবারেও তেমনই অনুষ্ঠাতা, যিনি প্রচারেও যেমন প্রতিষ্ঠাবান্ আচারেও তেমনই নিষ্ঠাবান্, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বাগ্রেই অবিতর্ক চিত্তে উত্তর করিতে পারি,—সেরূপ মহাত্মা এক মাত্র পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এখনও বর্ত্তমান!—স্বার্থে যাঁহাকে স্বপথচ্যুত করিতে পারে নাই, কুলাভিমান বিদ্যাভিমান

পদাভিমান প্রভৃতিতে যাঁহার চরিতপ্রবাহ কিঞ্চিন্মাত্রও কুটিলবক্র করিতে পারে নাই, প্রভুত্বেও যাঁহার সেবকস্বভাব এবং গুরুত্বেও যাঁহার শিষ্যোচিত বিনয় নম্রতার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই, যিনি যৌবনেও যে ব্রাহ্মত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বার্দ্ধক্যেও তাহারই পরিপাকমাত্রে অচলপ্রতিষ্ঠ রহিয়াছেন।

এই মহাত্মা "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" "পুষ্পমালা" প্রভৃতি কয়েক খানি কাব্য, "মেজবৌ" "নয়নতারা" প্রভৃতি সদ্ভাবসূচক উপন্যাস এবং "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক বঙ্গসমাজের সাময়িক ইতিবৃত্ত এবং অনেকগুলি সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সবিশেষ সংবর্দ্ধন করিয়াছেন।

আমাদের গ্রন্থনায়ক শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় চিরদিনই শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি যথেষ্ট ভক্তিমান্ ছিলেন, বিশেষতঃ স্বীয় পিতৃবিয়োগান্তে তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কেই তৎস্থানীয় স্থানে তাঁহার আদেশোপদেশ গ্রহণ করিয়া চলিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ও যে শরৎবাবুর প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ও স্নেহবান্ ছিলেন সে কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল শাস্ত্রী মহাশয় কেন, কি হিন্দু কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম কি খৃষ্টিয়ান্ যে কোন ব্যক্তির সহিত শরৎবাবুর কোন দিন আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তিনিই তাঁহার বিনয় নম্রতা সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাতে অনুরক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তিম কাল ও পরলোক প্রাপ্তি।

শেষজীবনে শরৎবাবু একবার দার্জ্জিলিং যাইয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মহামান্য লর্ড্ কারমাইকেলর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন, মহাত্মা কারমাইকেল সেই সময়ে কথাপ্রসঙ্গে বঙ্গভাষা ও বঙ্গবাসিগণের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আলাপের আভাসে শরৎবাবুর স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, উক্ত মহাত্মা বঙ্গভাষাকে (Foreign language) বৈদেশিক ভাষা বা বঙ্গবাসিগণকে (Foreign people) বৈদেশিক লোক বলিতেও যেন দুঃখবোধ করেন।

শরৎকুমার বাবুর অমায়িকতা ও বিনয়নম্রতায় বাধ্য হইয়া মহামান্য বঙ্গশাসকের প্রাইভেট্ সেক্রেটারি অনরেবল্ মিঃ ডব্লিউ, আর, গুর্লে, আই, সি, এস্, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি অনরেবল সর্ লরেন্স্ জেঙ্কিন্স্ মহোদয়ের পত্নী মাননীয়া শ্রীমতী লেডি জেঙ্কিন্স্ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ তাঁহার হারিসন্ রোড্স্থিত বাসভবনে শুভাগমন করিতেন এবং সাদরপ্রদত্ত পানীয়-ভোজ্যাদি গ্রহণে গৃহস্বামীর সম্মান রক্ষা করিতে ত্রুটী করিতেন না।

নদীয়ার মহারাজ মহামান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র দেবরায় মহোদয় শরৎ বাবুর জীবনাবসানের কিয়ংকাল পূর্ব্বে একবার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বাসভবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

কি বিদেশীয় কি স্বদেশীয়, কি রাজা রাজপুরুষ কি প্রজা প্রতিপালিত, কি আমন্ত্রিত অভ্যর্থিত, কি অতিথি অনাহৃত, যে কোন ব্যক্তি শরৎকুমারের গৃহে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে সমুচিত সম্মানসমাদরে আপ্যায়িত করিতে কখনই ত্রুটী করিতেন না। সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিত সতত সমান সদ্ভাবরক্ষা মাত্র কৃত্রিম শিষ্টাচারে কখনই হইতে পারে না। আন্তরিক অনসূয়তা অমায়িকতা ও সমদর্শিতা না থাকিলে মাত্র অভ্যস্ত ভদ্রতায় সর্ব্বদা সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন একান্তই অসাধ্য। এই হেতুই স্বীকার করি, শরৎবাবু

সাধুপিতার প্রকৃতই সাধুপুত্র, এবং উক্তরূপ অকৃত্রিম সাধুতাসংবলিত বলিয়াই তিনি দরিদ্রসন্তান হইয়াও যথেষ্ট সম্পৎশালী ও মহাজনসম্মান্য হইয়াছিলেন।

নিত্য নিয়মিত কর্ম্মনিষ্ঠা, অবসর সময়ে ভ্রাতা কলত্র কন্যাপুত্র সুহৃন্মিত্র প্রভৃতির সহিত সদালাপ, যথাশক্তি পরোপকারসাধন ইত্যাদিরূপ পবিত্রাচার-জনিত পরম সুখে কালাতিপাতপূর্ব্বক শরৎকুমার ক্রমশঃ যৌবনাতিক্রমে বার্দ্ধক্যদ্বারে উপনীত, বয়ঃক্রম অনুমান ৫৫ বৎসর, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সন্তোষকুমার মাত্র ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই এ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন, নবপ্রতিষ্ঠিত গৃহে ব্যবসায়কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে, কটন্ প্রেসেরও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি, চারিদিকেই সুখসমৃদ্ধির সম্ভাবনা, সেই সময়ে সহসা লীলাবসান!

১৩২০ সালের মাঘ মাস আনন্দে অতিবাহিত, ফাল্গুনের প্রথম প্রভাতে লাহিড়ী মহাশয় প্রাতর্ভ্রমণোপলক্ষ্যে পার্ক ষ্ট্রীটে কোন এক বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত; সেই স্থানেই সহসা হৃদ্দেশে বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। তৎক্ষণাৎ মোটর গাড়ীতে স্বগৃহে উপনীত হইলে, ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় আসিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক হৃদ্‌রোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, এবং প্রতীকারার্থ যথোপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। ৬ ঘণ্টার পর যন্ত্রণার কিয়ৎপরিমাণ উপশম হইল বটে, কিন্তু শরীর একান্তই অপটু রহিল। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কেহই তখনও এ সংবাদ শুনিতে পান নাই; পরিবার মধ্যেও কেহই তখনও ব্যাধি মারাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সায়াহ্ন ৫ টা ৪৫ মিনিটের সময়ে শরৎকুমারের জীবলীলা সাঙ্গ হইল!

তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইলে কলিকাতার ও মফস্বলের বহুসংখ্যক মান্যগণ্য ব্যক্তি সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। "ডেলি নিউস্" "বেঙ্গলী" "অমৃতবাজার পত্রিকা" "বঙ্গবাসী" "সঞ্জীবনী" "বসুমতী" প্রভৃতি ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রেও এই শোকসংবাদ ও তৎসহ গতাসু মহাত্মার চরিতমাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শোকপ্রকাশ।

শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি অনরেবল্ সর্ লরেন্স্ জেঙ্কিন্স্ মহোদয় স্বর্গগত মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সন্তোষ কুমারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতৃদেবের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। তাঁহার প্রতি আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। আপনার ও পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের এই নিদারুণ শোকে আমিও শোকান্বিত জানিবেন।"

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অফিঃ প্রধান বিচারপতি সর্ চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়-প্রেরিত পত্রের মর্ম্মানুবাদ,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার ভক্তিভাজন পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তিসংবাদে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। উক্ত মহাত্মা যেরূপ সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে তদীয় মৃত্যু সকলেরই অনুশোচনীয়, সন্দেহ নাই। আপনার এই নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় আমরাও সমব্যথিত।"

সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র-মর্ম্ম,—

"প্রিয় সন্তোষবাবু, আপনার পিতার আকস্মিক অকালমৃত্যুর সংবাদ পাইয়া যার-পর-নাই অনুতপ্ত হইলাম। তাঁহার ন্যায় সাধু অমায়িক মহাত্মা সংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গসমাজে তদীয় মৃত্যুজনিত অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমি আপনার এই মহাদুঃখে নিতান্ত দুঃখিত; জগদীশ্বর আপনাদিগের অন্তরে এই অসহ্য শোক সহ্য করিবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চার করুন্।

আশীর্ব্বাদ করি, আপনিও আপনার পিতৃদেবের মহৎচরিত্রের অনুসরণ পূর্ব্বক সংসারে তদ্বৎ সম্মানিত হউন্।"

কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি অনরেবল্ সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের মর্ম্মানুবাদ,—

"প্রিয় সন্তোষকুমার, তোমার ভক্তিভাজন পিতৃদেবের পরলোকগমন-সংবাদে যার-পর-নাই ব্যথিত হইলাম। ২৫ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্ব হইতে আমি তাঁহাকে আমার একজন সম্ভ্রান্ত সুহৃৎ বলিয়া বিবেচনা করিতাম, সুতরাং এই শোকসংবাদে আমাকে বড়ই মর্ম্মাহত করিয়াছে। তোমার মাতাঠাকুরাণী ও পরিবারস্থ আর আর সকলকেই এই নিদারুণ বিয়োগবেদনায় আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিবে।

ভরসা করি, তোমরা সকলেই তোমার পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য পথে ও পুণ্যপথে অবিচ্যুত ভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে। সময়ানুসারে একবার তোমার সাক্ষাৎ পাইলে সুখী হইব।"

বিচারপতি অনরেব্‌ল সর্ ডব্‌লিউ, সি, কার্ণডফ্ মহোদয়ের পত্রার্থ,—

"প্রিয় মহাশয়, আমার বহুদিনের বন্ধু—আপনার পূজনীয় পিতৃদেবের মৃত্যু-সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, প্রকৃতই আমি তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতাম।

এই নিদারুণ শোক আপনাদের পক্ষে নিতান্তই অসহ্য, সন্দেহ নাই; আমিও আপনাদের এ বিপত্তিতে সমশোকাতুর জানিবেন।"

পঞ্জাব-হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি এবং পঞ্জাব ইউনিবার্সিটির ভাইস্‌চান্‌সেলর সর্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রমর্ম্ম,—

"প্রিয় সন্তোষকুমার, তোমার মাননীয় পিতৃদেবের আকস্মিক অকাল মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তাঁহাকে আমি বড়ই সমাদরের বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতাম। তোমাদের এই বিয়োগব্যথায় আমাকে সমব্যথিত বলিয়া জানিবে।

ভরসা করি, তুমিও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক পিতৃপিতামহের নাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। মনে করিয়াছিলাম এসময়ে একবার গিয়া তোমাদিগকে দেখিয়া আসিব, কিন্তু বৃষ্টিহেতু পারিলাম না।"

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অনরেব্‌ল মিঃ ই, ই, ফ্রেচার মহোদয়ের পত্রের মর্ম্মানুবাদ,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতা মিঃ এস্, কে, লাহিড়ী মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হইলাম। আপনার পিতৃশোকে আমিও শোকান্বিত জানিবেন।"

বিচারপতি অনরেবল্ মিঃ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রার্থ,—

"প্রিয় সন্তোষকুমার, তোমার পিতৃদেবের আকস্মিক অকাল মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। ভরসা করি, ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তুমি ধীরতার সহিত শোকসংবরণ করিতে এবং সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক তোমার পিতৃ-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে।"

বিচারপতি অনরেবল্ মিঃ আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্রার্থ,—

"প্রিয় সন্তোষ, তোমার পত্র যখন পৌছিয়াছে, তখন আমি স্থানান্তরে ছিলাম। এই নিদারুণ সংবাদে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাহা তুমি সম্ভবতঃ সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিবে না। শৈশবাবধিই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তাঁহার প্রতি আমার যার পর নাই শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তিনি তোমার স্বর্গীয় পিতামহ রামতনুলাহিড়ী মহাশয়ের সুনাম সম্যক্ রক্ষা করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ এই সপ্তাহেই আমি তোমাদের বাটীতে গিয়া সকলেরই সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

বিচারপতি অনরেবল্ মিঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের ভাবার্থ,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পূজনীয় পিতৃদেবের মৃত্যুসংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। আপনাদের এই নিদারুণ শোকে আমিও সমশোকান্বিত।"

নদিয়া-মহারাজের প্রেরিত তারের সংবাদ,—

"আপনাদের এই নিদারুণ শোকসংবাদে আমি বড়ই ব্যথিত হইলাম, জানিবেন।"

কাশিমবাজারাধিপতি অনরেবল্ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের পত্রের মর্ম্মানুবাদ,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে আপনার পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদ পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। আপনার এই নিদারুণ শোকে আমিও শোকান্বিত জানিবেন।

আশা করি, আপনিও পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়াই পরিগণিত হইবেন।"

অনরেব্‌ল্‌ মিঃ পি, সি, লায়ন মহোদয়ের পত্রমর্ম্ম, —

"প্রিয় লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। আমিও আপনার এই বিয়োগ-দুঃখের সহভাগী জানিবেন। বহুদিন হইতেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়, এবং সে পরিচয়ে তাঁহার অমায়িকতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয়ও সবিশেষ পাইয়াছিলাম, এবং বুঝিয়াছিলাম যে উক্তরূপ সদ্‌গুণ প্রভাবেই তিনি সুহৃন্মণ্ডলীতে সতত সমাদৃত।

আপনি সানুগ্রহে পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের নিকট আমার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবেন।"

বঙ্গের মহামান্য শাসনকর্ত্তার প্রাইভেট্‌ সেক্রেটরি অনরেব্‌ল্‌ মিঃ ডবলিউ আর, গুর্লে মহোদয়ের পত্রমর্ম্ম,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তি-সংবাদে আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। বহুদিন হইতে স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব। সে বন্ধুত্বে আমি চিরদিনই পরম পরিতৃপ্ত। তাঁহার পীড়ার কথা পূর্ব্বে কিছু মাত্র শুনি নাই, এজন্য আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে বড়ই বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। আপনারা সকলেই আমার সহানুভূতি জানিবেন।"

অনরেব্‌ল্‌ মিঃ জে, এইচ্‌ কর, আই, সি, এস্‌ প্রেরিত পত্রের মর্ম্মানুবাদ,—

"প্রিয়মহাশয়, আপনার পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। প্রকৃতই তিনি আমার সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন। আপনারা এই শোকসময়ে আমার অকৃত্রিম সহানুভূতি জানিবেন।"

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, এস্‌, আই, এম্‌, এ, বি, এল, মহোদয় প্রেরিত পত্রের মর্ম্মার্থ,—

"প্রিয় সন্তোষকুমার, আমার প্রীতিসম্মানভাজন সুহৃদ্‌বরের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। এ মহাবিপত্তিতে তোমরা আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবে। ভগবান্‌ তোমাদিগের অন্তরে এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান করুন।"

রাজা হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই, মহোদয়ের পত্রার্থ, —

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ব্যথিত হইলাম। এই শোকসময়ে আপনি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। ভগবৎকৃপায় পরলোকগত আত্মার শান্তিলাভ হউক।"

পাইকপাড়া রাজবাটীর কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ মহোদয়ের পত্রানুবাদ,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতা শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। তিনি স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আমি নিতান্তই দুঃখিত। আপনি এই নিদারুণ শোকসময়ে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি পরলোকগত আত্মার অনন্তশান্তি বিধান করুন।"

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি, এস্, আই, সি, আই, ই, ডি, এস-সি, এফ্, এ, এস্, বি, মহোদয়ের প্রেরিত পত্রার্থ,—

"প্রিয় মহাশয়, এই শোকসময়ে আপনি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। আপনার পিতৃদেবের সহিত আমার পরিচয় ছিল। তাঁহার পরলোকগমনে যথার্থই আমি আজ একজন পরমাত্মীয় হারাইলাম।"

এফ্, বি, ব্রাড্‌লিবার্ট্, এস্কোয়ার, বিএ, আই সি এস্ মহোদয় প্রেরিত পত্রের মর্ম্মানুবাদ,—

"প্রিয় লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পিতা মিঃ এস্ কে লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদে আমি বড়ই ব্যথিত হইলাম। অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই আমি যখন গবর্ণমেণ্ট্ হাউসে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন তিনি বেশ স্বাভাবিক সুস্থশরীর! যাহা হউক, তাঁহার লোকান্তরগমনে আমি নিতান্তই দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা ছিল।

আপনাদের এই শোকসময়ে আমার সহানুভূতি জানিবেন। আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ন্যায় মহাত্মগণই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশকে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সহানুভূতিসম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে সমর্থ।"

এইচ্, পি, ডুভাল্ এস্কোয়ার, আই সি এস্ মহোদয়ের পত্রমর্ম্ম,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদে নিতান্তই দুঃখিত হইলাম। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি যেরূপ একান্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, আমিও তদ্রূপই ছিলাম। আপনারা আমার সহানুভূতি জানিবেন।"

মিঃ বি, দে, এমএ, আই সি এস্ মহোদয়ের পত্রানুবাদ,—

প্রিয় সন্তোষ, তোমার পিতার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আমি যে কিরূপ ব্যথিত হইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। ১৫ই তারিখে তিনি আমার এখানে আসি-

বেন বলিয়া আশা করিতেছিলাম, ইত্যবসরে ১৪ই প্রাতে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তিসংবাদ পাঠ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। "তোমার পিতা উদ্যমশীলতা কর্ম্মদক্ষতা ও সাধুতা বিষয়ে বাস্তবিকই মহাজনোচিত সুযশঃ রাখিয়া গিয়াছেন।

আশা করি, তুমি এবং তোমার সহোদরগণ তাঁহার স্বচেষ্টাসংস্থাপিত বৃহৎ ব্যবসায়টির সংরক্ষণে ও উন্নতিসাধনে সম্যক্ সমর্থ হইবে। এই শোকসময়ে তুমি আমার সহানুভূতি স্বয়ং জানিবে ও পরিবারস্থ আর আর সকলকে জানাইবে।"

অনরেব্‌ল্ মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বারিষ্টার মহাশয়ের পত্রমর্ম্ম,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতৃবিয়োগসংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। আপনি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। আপনি যেমন পিতৃহীন হইলেন আমিও তেমনই আমার সমাদরণীয় বন্ধুবরকে হারাইলাম।"

অনরেব্‌ল মিঃ এস্ সিংহ ব্যারিষ্টার, এলাহাবাদ,—

"প্রিয় লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পিতার আকস্মিক অকালমৃত্যুর সংবাদে নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার সহিত আমার বহুকালের বন্ধুত্ব। আপনারা আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন।

আশা করি, আপনি আপনার পৈতৃক বৃহৎ ব্যবসায়কার্য্যটি সুচারুরূপেই চালাইতে সমর্থ হইবেন। যদি কখনও কোনরূপ প্রয়োজন ঘটে, পত্রদ্বারা জানাইলে বাধিত হইব।"

অনরেব্‌ল্ মিঃ রাধাচরণ পাল,—

"প্রিয় মহাশয়, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ এস্ কে লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তিসংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার এই অকাল মৃত্যু দেশীয় সমাজের বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, সদয় সুবিনীত স্বভাব, চিত্তৌদার্য্য, দেশহিতৈষণাপ্রবৃত্তি ও অকৃত্রিম পরোপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ প্রকৃতই ভারতবাসিগণের আদর্শনীয় ও চিত্তোদ্দীপক। তিনি বাস্তবিকই পিতৃনামরক্ষক সাধুপুত্র তথা স্বয়ং স্বনামধন্য সুকৃতিমান্ পুরুষ।

আহা, কি পবিত্র দেবাত্মারই আজ তিরোভাব ঘটিল! এরূপ মহাজন ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এ কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আপনার এই নিদারুণ শোকসময়ে আমার সহানুভূতি জানিবেন। সহানুভূতি

যদি সত্যই শোকপ্রশামক হয়, তবে আপনার শোকাতুরা মাতৃদেবী, পিতৃব্য মহাশয়, ভ্রাতা ভগিনীগণ প্রভৃতির সমীপে এ সময়ে আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সমাদৃশ বহুসংখ্যক বন্ধুর সমবেদনা জ্ঞাপন করিবেন। ভগবান আপনাদিগকে নিরাপদে রাখুন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ এইচ্ আর জেম্‌স্, এম্ এ,—

"প্রিয় লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পিতৃবিয়োগে এই যে সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিতেছি, ইহা মাত্র লৌকিকতা রক্ষার নিমিত্ত, মনে করিবেন না। তাঁহার প্রতি আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, এবং তিনি আমার প্রতি যেরূপ বন্ধুজনোচিত অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, তাহাতে আমি বড়ই কৃতার্থম্মন্য ছিলাম। আপনাদের ন্যায় আমিও আজ একজন পরমাত্মীয় হারাইয়াছি।

এই আকস্মিক বিপৎপাত আপনাদের পক্ষে অসহ্য শোকাবহ, সন্দেহ নাই। এই শোকসময়ে আপনারা আমার সবিশেষ সহানুভূতি জানিবেন। আশা করি, ভগবান্ আপনাদের হৃদয়ে এই অসহ্য শোক সহনোপযোগী শক্তি সঞ্চার করিবেন।"

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল, এলাহাবাদ,—

"প্রিয় লাহিড়ী মহাশয়, আপনাদের নিদারুণ বিপত্তিসংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। আমার আন্তরিক সহানুভূতি স্বয়ং জানিবেন এবং পরিবারস্থ অন্যান্য সকলকে জানাইবেন।"

শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, বি এল, এটর্ণি,—

'প্রিয় মহাশয়, সংবাদপত্রে আপনার পিতার পরলোক প্রাপ্তি সংবাদ পাঠ করিয়া আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। আপনি আমার সহানুভূতি জানিবেন। ঈশ্বর আপনাকে এই অসহ্য শোক সহনোপযোগী শক্তি প্রদান করুন।"

রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শস্ত্রী বাহাদুর এম্ এ ;—

"প্রিয় সন্তোষকুমার, তোমার পিতাকে আমি প্রকৃতই অন্তরঙ্গ-বন্ধু বলিয়া জানিতাম; অতএব তাঁহার মৃত্যুসংবাদে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। অনেক দিন হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়; তাঁহার অমায়িক স্বভাব ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হইতাম। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ

শুনিয়া আমি বড়ই বিস্ময় জ্ঞান করিলাম। তোমাদের আজ যে নিদারুণ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা আমি সম্যক্ অনুভব করিতে পারিতেছি, এবং আমার মন যেন তোমাদের মধ্যে গিয়াই সমবেদনাগ্রস্ত হইতেছে।

আশা করি, কৃপাময় জগৎপিতা তোমাদিগকে এই নিদারুণ শোকসহনোপযোগী শক্তি প্রদান করিবেন এবং তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব যেরূপ উদ্যম অভিনিবেশ গুণে ভারতীয় ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তোমাদিগকেও সেইরূপ উদ্যম অভিনিবেশের সহিত তৎপথানুসরণে সমর্থ করিবেন।"

ডাক্তার আর, এল, দত্ত এম্ ডি, আই, এম, এস্,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতৃদেবের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছি। এই বিপত্তিসময়ে আপনারা আমার সহানুভূতি জানিবেন। সদ্গুণসমবায়হেতু তিনি স্বীয় ব্যবসায়ে যথোচিত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, আশা করি আপনারাও তদাদর্শে তদ্রূপই সদ্গুণান্বিত হইবেন। জগদীশ্বর আপনাদিগকে শান্তি প্রদান করুন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।"

মিঃ জি, সি, চন্দর, সলিসিটর,—

"প্রিয় সন্তোষকুমার বাবু,—আপনার পিতৃদেবের পরলোক প্রাপ্তিসংবাদে নিতান্তই ব্যথিত হইলাম। এই নিদারুণ শোকসময়ে আপনি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল, তাঁহার তিরোভাব আমার পক্ষে বড়ই অনুশোচনীয়। আশা করি, ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে আপনি এই নিদারুণ শোকে পুরুষোচিত ধৈর্য্যাবলম্বনে সমর্থ হইবেন।"

জে, চৌধুরী এস্কোয়ার, এম এ, বারিষ্টার, —

"প্রিয় সন্তোষ, তোমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। বাল্য বয়স হইতেই তাঁহার সহিত আমার সোদরবৎ সৌহার্দ্য ছিল, সুতরাং তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আমি ও আমার পরিবারস্থ অন্যান্য সকলেই যে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি, ইহা বলাই বাহুল্য।

তোমাকে যে এ অবস্থায় কি বলিয়া প্রবোধ দিব তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমাদের এ দুঃখে যে কত দূর দুঃখিত হইয়াছি, তাহা কথায় অপ্রকাশ্য। শীঘ্রই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা রহিল। তোমাদের সকলেরই সুমঙ্গল হউক।"

অমিয়নাথ চৌধুরী, এস্কোয়ার, বারিষ্টার,—

"প্রিয় লাহিড়ী, তোমার পূজনীয় পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছি এবং এই পত্র দ্বারা তোমাকে আমার ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। জগদীশ্বর করুন, তোমাদের এই মনোবেদনা সত্বর প্রশমিত হউক।

আমরা সকলেই তোমার পিতার সহিত কিরূপ সুদৃঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম তাহা তোমার অবিদিত নাই, সুতরাং সকলেই তাঁহার বিয়োগে কিরূপ কাতর হইয়াছি তাহাও তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। যে কোন প্রয়োজনই হউক, যখন ইচ্ছা আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

রায় দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বাহাদুর,—

"প্রিয় সন্তোষ, তোমাদের এই নিদারুণ বিপত্তিতে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। সেদিন সন্ধ্যাকালে যখন তোমাদের ওখানে গিয়াছিলাম, তখন আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। তোমাদের এই শোকসময়ে আমার সহানুভূতি ও শুভানুধ্যান জানিবে।"

কর্ম্মাটর হইতে রায় প্রসন্নকুমার বসু বাহাদুর স্বর্গীয় শরৎবাবুর কনিষ্ঠ সহোদরকে লিখিয়াছিলেন,—

"প্রিয় বসন্ত, প্রিয় শরৎকুমার সহসা হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছেন শুনিয়া বড়ই সন্তপ্ত হইলাম। তাঁহার এরূপ অকালমৃত্যু বড়ই অনুশোচনীয়। আমি তাঁহার পুত্রের নাম জানি না, এজন্য তোমাকেই লিখিতেছি, তুমি তাঁহার বিয়োগবিধুরা বিধবা পত্নী ও শোকাকুল পুত্রকন্যাগণকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবে। পরলোকগত আত্মার প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হউক, ইহাই প্রার্থনা।"

রায় মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর, শ্রীরামপুর,—

"প্রিয় বৎস, বড়ই বিষাদের সহিত এই মাত্র ষ্টেট্‌স্‌মান পত্রিকায় পাঠ করিলাম যে, আমার প্রিয় ভ্রাতা তোমার পিতৃদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আয়ুঃসূর্য্য যে এত শীঘ্র সমুজ্জ্বল মধ্যাহ্নসময়েই সহসা অস্তমিত হইল, ইহাই সবিশেষ পরিতাপের বিষয়।

এই শোচনীয় সংবাদপাঠে আমার চিত্ত এতই অবসন্ন হইয়াছে যে, কাজকর্ম্ম আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। আমি প্রকৃতই আজ পরমাত্মীয় হারাইয়াছি,

তাই আত্মায় আঘাত লাগিয়াছে। নিজেই অশান্ত, এ অবস্থায় আর তোমাকে বা তোমার জননীকে সান্ত্বনা দিব কি বলিয়া?

যাহা হউক, সমবেদনায় শোক প্রশমিত হয়, এই ভাবিয়াই এই নিদারুণ শোক-সময়ে আমি তোমাদিগকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। পরলোকগত আত্মার শান্তিলাভ হউক, ইহাই প্রার্থনা।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এমএ, পি-এইচ্ ডি,—

(বসন্তবাবুর প্রতি) "প্রিয় মহাশয়, আপনার সম্মানার্হ অগ্রজদেবের পরলোকপ্রাপ্তিসংবাদে নিরতিশয় ব্যথিত হইলাম।

দিনত্রয় পূর্ব্বে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যকলাপের বিবরণ শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার কন্যার সংস্কৃত অধ্যয়ন বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতে এবং তৎকর্ত্তৃক প্রকাশের নিমিত্ত কয়েকখানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে দিন তাঁহাকে দেখিয়া ত সম্পূর্ণ সুস্থ স্বচ্ছন্দই বোধ হইল! এত শীঘ্র যে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহা কেহই অনুমান করিতে পারি নাই। জীবন যেরূপ নিষ্পাপ মৃত্যুও তাঁহার তেমনই নিরুদ্বেগে ঘটিল। বঙ্গসমাজে সহসা তাঁহার স্থান পরিপূরণ হওয়া সুকঠিন।

এই সেদিন মাত্র তিনি কবিবর ডি, এল, রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন! স্বয়ং যে এত শীঘ্রই তৎপথানুসরণ করিবেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই।

যাহা বিধাতৃবিধান, তাহা পুরুষোচিত সহিষ্ণুতার সহিত স্বীকার করিতে বিধাতাই আপনাদিগকে শক্তি প্রদান করুন।"

ঢাকা জগন্নাথকলেজের প্রিন্সিপাল্ রায় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর,--

"প্রিয় সন্তোষ, তোমার পিতার এরূপ আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আমরা একান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছি।

অনুমান একমাস পূর্ব্বে কলিকাতায় তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তখন তাঁহাকে দেখিয়া বেশ শান্ত সুস্থই বোধ হইল; এত শীঘ্রই যে তাঁহার পরলোকগমনের আহ্বান আসিবে, সে সময়ে তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারি নাই।

তিনি তোমাদিগের প্রতি যেরূপ বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন এবং স্বয়ং যেরূপ সদাশয় সাধুব্যক্তি ছিলেন তাহা আমার অবিদিত নাই। আজ তোমাদের যে কিরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত এবং সর্ব্বদিক্ কিরূপ অন্ধকারময় বোধ হইতেছে, আমি মানসচক্ষে সে সমস্তই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। এই নিদারুণ বিপত্তি-সময়ে জগদীশ্বর তোমাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ ও ধৈর্য্যপ্রদান করুন।

তোমার মাতৃদেবীর এবং অন্যান্য পরিজনগণের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, স্মরণ করিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। এইরূপ, মানব মাত্রকেই মৃত্যুদ্বার দিয়া কোন না কোন দিন যে অমৃতধামে গমন করিতে হইবে, আশা করি, দেখিয়া শুনিয়া এখন হইতেই তুমি তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারে অনাসক্ত সাধুজীবন যাপন করিতে শিখিবে।

মনোরমাকে (শরৎবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা) আমার কথা বলিয়া আমার এই পত্রখানি দেখাইবে। আমার পত্নী এবং আমি উভয়েই তাহার এই শোকাবস্থা স্মরণ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, সে ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া শোক সংবরণে সমর্থ হউক।”

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মিঃ এস্, সি, মহলানবিস্, বি, এস্-সি,—

“প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তিসংবাদে যে কিরূপ ব্যথিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া কি জানাইব? তাঁহার সহিত বহুসংখ্যক ব্যক্তির আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল এবং সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান সমাদর করিতেন। প্রকৃতপক্ষেই তিনি সকলেরই তথাবিধ সম্মান সমাদর পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র ছিলেন।

তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় মহাপুরুষ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম আমাদের স্বজাতিসমাজে প্রাতঃস্মরণীয়; শরৎবাবুও সেই পুণ্যাত্মা পিতার উপযুক্ত পুত্র। এই নিদারুণ শোক সময়ে জগদীশ্বর আপনাদিগকে শান্তিপ্রদান করুন।”

বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্‌এ, বিএল, ভাগলপুর,—

“প্রিয় সন্তোষকুমার, তোমার পিতৃবিয়োগের শোচনীয় সংবাদ পাইয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। সংবাদপত্রে উক্ত সংবাদ পাঠ করিবামাত্রেই আমি তোমার পিতৃব্য বসন্তকে একখানি পত্র লিখিয়াছি। সম্ভবতঃ ঐ পত্র যথাসময়েই পৌঁছিয়াছে। তোমার পত্র অদ্য পাইয়াছি। শৈশবাবধি তোমার পিতার প্রতি আমার সবিশেষ লক্ষ্য! সুতরাং তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আমি সহসা

বজ্রাহতপ্রায় হইয়াছি। তোমার পূজনীয় পিতামহ ঠাকুরের সময় হইতে তোমাদিগের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ। এ জন্য তোমার পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তিতে আমি বাস্তবিকই একজন পরমাত্মীয় হারাইলাম। বড়ই দুঃখের বিষয়! এই দুর্বিষহ দুঃখে চিত্তের একমাত্র প্রবোধ এই যে, মঙ্গলময় পরম পিতার সুবিধানে যাহাই বিহিত হউক, তাহাই সুমঙ্গল। তোমার শোকাতুরা জননীকে এবং তোমাদের সকলকেই আমি এই নিদারুণ শোকসময়ে শান্তির নিমিত্ত মাত্র সেই জগৎপিতারই শরণাপন্ন হইতে পরামর্শ দিতেছি। এ শোক তোমাদের পক্ষে একান্ত দুর্বিষহ সন্দেহ নাই, এবং সেই করুণাময় শান্তিদাতা ব্যতীত এ সময়ে সান্ত্বনা প্রদানে অপর কাহারই শক্তি নাই জানিবে।

তোমার পিতৃবিয়োগ আমাদের দেশের পক্ষেও বড়ই দুরদৃষ্টসূচক! তিনি একজন স্বাবলম্বী স্বনামধন্য সাধুপুরুষ। তিনি গ্রন্থপ্রকাশ ব্যবসায়টিকে সবিশেষ সমৃদ্ধিকর শ্লাঘনীয় ও দেশের পক্ষে শুভদায়ক করিয়া তুলিয়াছিলেন। এজন্য দশের নিকটে তাঁহার জীবনের মূল্য অনেক অধিক। আশা করি জীবনে তোমরাও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে সমর্থ হইবে। আমরা সকলেই তোমাদিগের এ বিষম মনোবেদনায় সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি, এবং জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, পরলোকগত সাধু-আত্মার সুমঙ্গল হউক।

পুঃ। তোমার সহোদরগণ এবং তুমি, কে কি করিতেছ জানিতে ইচ্ছা করি। চিত্তের একটু স্থিরতা হইলেই আমাকে তোমাদের সমাচারের সবিস্তার বিবরণ জানাইবে।"

রেভারেণ্ড্ জে, সি, স্কুম্‌জিয়র, এম্, এ, স্কটিস্ চর্চ্চ কলেজ, কলিকাতা,—

"প্রিয় রায়মহাশয়, লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। আমি একজন বিশিষ্ট-বন্ধু হারাইলাম। তাঁহার সহিত আমার আরও পূর্ব্ব হইতে পরিচয় হয় নাই বলিয়া আমার বড়ই দুঃখ।

তাঁহার শোকাতুরা পত্নী ও পুত্রকন্যা প্রভৃতির নিকট তাঁহাদের এই দুঃসময়ে আমার ও আমার পত্নীর আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করিবেন।",

প্রোফেসর জে, আর্, বন্দ্যোপাধ্যায়, মেট্রপলিটান কলেজ, কলিকাতা,—

"প্রিয় সন্তোষ, তোমার পূজনীয় পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তিসংবাদে নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছি। জগদীশ্বরসমীপে প্রার্থনা করি, এই নিদারুণ শোকসময়ে তিনি তোমাদিগকে শান্তিপ্রদান করুন। তোমরা আমার

আন্তরিক সহানুভূতি জানিবে। তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সকলেরই সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন।”

মিসেস্ নির্ম্মলা বালা সোম, এম্‌এ, “মুখার্জ্জিস্ রেষ্ট্”, বালিগঞ্জ,—

“প্রিয় সন্তোষ, তোমার পিতার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আমি যথার্থই যুগপৎ মর্ম্মাহত ও চমকিত হইলাম। তিনি নাই,—একথা এখনও আমার নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। তিনি আমার কেবল সহৃদয় বন্ধু নহেন, স্নেহময় সহোদরসদৃশ ছিলেন, তাঁহার বিয়োগে অন্তরে তীব্র বেদনা পাইয়াছি। আমার অন্তরাত্মা এ শোকসময়ে যেন তোমাদিগেরই নিকট চলিয়া গিয়াছে, তোমাদেরই কথা সদাই মনে জাগিতেছে। শীঘ্রই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

বৎস, জগদীশ্বর তোমাদিগকে কৃপা করুন এবং সতত তোমাদিগের সহায় হউন।”

প্রোফেসর সতীশচন্দ্র রায়, এম্‌এ, ভবানীপুর,—

“প্রিয় সন্তোষ, সংবাদপত্রে তোমার পিতার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পাঠ করিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত হইলাম। তিনি যে কেবল আমার একজন পরমবন্ধু ছিলেন তাহা নহে; আমার বিচারে সংসারে প্রকৃত সম্মানার্হ মহাজনের সংখ্যা অতি অল্প. এবং সেই স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে তোমার পিতা যথার্থই একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের এই নৈতিক অধঃপতনের দিনে তাঁহার ন্যায় সাধুপুরুষ দ্বিতীয় দুর্লভ।

আশা করি, তোমরা এই বিষাদ সময়ে তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া উৎসাহান্বিত হইবে, এবং সংসারে তাঁহার ন্যায় সৎপথানুসরণে শক্তিপ্রাপ্ত হইবে। যুগপৎ জগদীশ্বরের ও মনুষ্যমণ্ডলীর প্রিয়পাত্র হইতে হইলে যে সকল সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক, তোমার পিতৃদেবের চরিত্রে ঐ সকলের অপূর্ব্ব সংমিলনের পরিচয় পাওয়া যাইত। তোমরা যদি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে সমর্থ হও, নিশ্চিতই জানিবে, ইহপরত্র কৃতার্থ হইবে।

জগদীশ্বর পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন।”

প্রোফেসর্ অম্বিকাচরণ মিত্র, এম্‌এ; কটক,—

“প্রিয় সন্তোষকুমার, তোমার গতকল্য তারিখের পত্র পাইলাম। তোমার পিতার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। এই নিদারুণ পরীক্ষাসময়ে

তোমরা আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবে। সংসার এইরূপই অনিত্য! আমাদের জীবন জলবিম্বই বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের শক্তি সামর্থ্যের অপব্যবহার করা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। আশা করি, জগদীশ্বর তোমাদিগকে এই দুর্ব্বিষহ শোক ধীরভাবে সহ্য করিতে সামর্থ্য দিবেন।"

প্রোফেসর্ আর্, বসু, এম্এ, মেদিনীপুর,—

"প্রিয় রায় মহাশয়, লাহিড়ী মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। জগদীশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন। তাঁহার শোকাতুর পরিবারবর্গের সমীপে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবেন।"

কলিকাতা-হিন্দুস্কুলের হেড্ মাষ্টার বাবু রসময় মিত্র, এম্এ,—

"প্রিয় সন্তোষকুমার, গতকল্য তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পূজনীয় পিতৃদেবের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আমরা সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছি। তুমি এই শোকসময়ে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবে। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তোমরা এই দুর্ব্বিষহ শোক সহ্য করিতে সমুচিত সামর্থ্য লাভ কর এবং পরলোকগত আত্মা অনন্তশান্তি ও অক্ষয় স্বর্গসুখ উপভোগ করুন, এক্ষণে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।"

বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম্এ, বিএল্; "কার্ত্তিকভবন", কৃষ্ণনগর,—

"প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার পিতৃসম্বন্ধীয় শোচনীয়সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। তুমিই যে কেবল পিতৃহারা হইলে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গজননীও একটি উজ্জ্বল পুত্ররত্ন হারাইলেন। সর্ব্বজনীন সম্প্রীতি, স্বাভাবিক বদান্যতা, সাধুত্ব, অমায়িকতা, বিনয়নম্রতা এবং স্বাবলম্বিতা প্রভৃতি সদ্গুণে তোমার পিতৃদেবের পবিত্র চরিত্রের বড়ই মনোহারিত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পাদন করিয়াছিল। তিনি ঋষিকল্প মহাপুরুষ স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ীমহাশয়ের উপযুক্ত আত্মজ! আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমাদের সে প্রত্যাশা পূর্ণ হইলে, বঙ্গসমাজ তাঁহা হইতে আরও অনেক উপকার প্রাপ্ত হইত, সন্দেহ নাই। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান কৃষ্ণনগরের সমস্ত লোকই আজ তাঁহার জন্য শোকাকুল। তোমাদের এই শোক সময়ে, একাকী আমার নহে, তোমার পিতার বহুসংখ্যক বন্ধুর সহানুভূতি জানিবে। তোমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনের দুঃখহারী একমাত্র জগদীশ্বর। তিনিই ক্রমশঃ তোমাদিগের চিত্তের শান্তিবিধান

করিবেন। তোমার পিতাকে আমরা বাস্তবিকই বড় ভালবাসিতাম, বড়ই সমাদর করিতাম; ভরসা করি, তুমিও সেই রূপ সদ্‌গুণান্বিত হইয়া আমাদিগের সেইরূপ স্নেহ ও সমাদরের পাত্র হইবে, এবং তোমার মর্ম্মাহতা জননীর সান্ত্বনার স্থল হইবে।"

ময়মনসিংহের অবসরপ্রাপ্ত হেড্ মাষ্টার বাবু মোহিনীমোহন বসু,—

"প্রিয় মহাশয়গণ, আপনাদিগের ব্যবসায়ের স্বত্বাধিকারী বাবু শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। যদিও তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই, কিন্তু কিঞ্চিদধিক দ্বাদশবর্ষকাল তাঁহার সহিত আমার যেরূপ পরিচয় চলিয়াছিল, তাহাতে আমি তাঁহার সাধুতা ও ন্যায়নিষ্ঠার বিষয়ে সবিশেষ বিশ্বাসাপন্ন হইয়াছি। কলিকাতার গ্রন্থপ্রকাশক-সম্প্রদায়ে উক্ত বিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করে এমন কাহাকেও দেখি না। সাধুতাই যে তাঁহার ব্যবসায়ে সুযশঃ ও সাফল্যলাভের আদি নিদান, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। তিনি মহাজন পিতার মহাজন পুত্র, সাধুতার সুখ্যাতি তিনি যাবজ্জীবনই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি তাঁহার পুত্রগণও পিতৃআদর্শে তাঁহাদের ব্যবসায়ের ও বংশের সুনাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। আপনারা লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্রগণের সমীপে তাঁহাদের এই শোকসময়ে আমার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করিবেন। ঈশ্বর এ সময়ে তাঁহাদিগের চিত্তে শক্তিসঞ্চার ও শান্তিবিধান করুন। * * * * ইতি।"

বাবু সুরেন্দ্রলাল রায়, কৃষ্ণনগর,—

"প্রিয় সন্তোষ, আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা—তোমার পিতৃদেবের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে চমকিত হইলাম। তাঁহাকে আমি আমার পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতাম। এই অশুভ সংবাদ যখন পাইলাম তাঁহার লিখিত একখানি পত্রও সেই সময়ে হস্তগত হইল। এই নিদারুণ সংবাদে নিতান্ত হতবুদ্ধি হওয়ায় তোমাকে যথাসময়ে পত্র লিখিতে পারি নাই। তোমার পিতৃবিয়োগ মাত্র তোমাদের পক্ষে নহে, সর্ব্বসাধারণেরই পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয়; আহা, দীনদুঃখিগণই সে দুর্ভাগ্যের সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ফলভাগী! তুমি এখনও তরলচিত্ত বালক, কি বলিয়া তোমার চিত্তসান্ত্বনা করিব ভাবিয়া পাই না। যাহা হউক পরিবার-বর্গকে আমার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবে। বিধাতৃবিধান কে রোধ করিবে? বিধাতাই তোমাকে এ মর্ম্মাঘাত সহ্য করিতে সামর্থ্য প্রদান করুন।"

বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র, এল্-ই, কটক,—

"প্রিয় মহাশয়, 'বেঙ্গলী' পত্রের বিগত দুই সংখ্যায় আমাদের মাননীয় সুদক্ষ গ্রন্থপ্রকাশক মিঃ এস্ কে লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। কি আর লিখিব? লিখিতে লেখনী সরিতেছে না। আহা, কি সাধু সজ্জনই ছিলেন! আমাদের বঙ্গদেশ যথার্থই একটি মহাজন হারাইল! তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করায় আমাদের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া আজ দুই দিন বড়ই দুঃখবোধ হইতেছে। সকলই ঈশ্বরেচ্ছা, মনুষ্যের হাত কি আছে?

লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্র বঙ্গযুবকগণের পক্ষে শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ। আশা করি, আপনারা যেমন পূজনীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই শরৎকুমার বাবুরও একখানি জীবনী অতি সত্বর প্রকাশিত করিবেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাইবেন। আমি তাঁহার নাম জানি না, জানিলে তাঁহাকেই পত্র লিখিতাম।"

বাবু এস্ এন্ বানার্জ্জি, বি, এল্,—ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া,—

"প্রিয় সন্তোষ বাবু, আপনার পিতৃদেবের আকস্মিক পরলোকপ্রাপ্তিসংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। বহুবর্ষ যাবৎ তাঁহার নাম গ্রন্থকারগণের নিকট কি সম্পৎসুদিনে কি দারিদ্র্যদুর্দ্দিনে মহাসঙ্কীর্তনস্বরূপই প্রতীয়মান হইয়া আসিতেছিল। আপনার পিতৃবিয়োগে কেবল বঙ্গদেশের নহে, সমগ্র ভারতের গ্রন্থ-প্রকাশকসমাজ একজন উপযুক্ত অধিনায়ক হারাইল। সাধুতা ও উদারতায় তাঁহার সমতুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার কত দিনে তদভাব মোচন করিবে, কে বলিতে পারে? আপনাদের পক্ষে অবশ্য এ অভাব আর পূর্ণ হইবার নহে, কিন্তু আমার পক্ষেও বোধ করি তদ্রূপই। আপনারা আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। আশা করি, আপনিও আপনার পূজনীয় পিতৃদেবের সুনাম রক্ষা করিতে যথাসাধ্য যত্নবান্ হইবেন।"

হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রের সম্পাদক, (মাদ্রাজ হইতে তারের সংবাদ)—

"এই নিদারুণ শোকে জগদীশ্বর আপনাদিগকে সহিষ্ণুতাপ্রদান করুন। আমার সহানুভূতি জানিবেন।"

বাবু গৌরহরি সেন, সম্পাদক, চৈতন্য লাইব্রেরি, কলিকাতা,—

"প্রিয় সন্তোষবাবু, এই পুস্তকালয়-সমিতি আপনার পিতৃদেবের পরলোক-প্রাপ্তি সংবাদে নিতান্ত দুঃখিত। গত বিশ বৎসর ধরিয়া আপনার পিতার

সহিত আমার পরিচয়। তাঁহার শ্রমদক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠায় আমি সততই মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার মৃত্যুতে দেশীয় সমাজের যে অভাব ঘটিল, সম্ভবতঃ আর বহুকালেও সে অভাবের পরিপূরণ হইবে না। আপনি এবং পরিবারস্থ সকলেই আমাদিগের আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন।"

কলিকাতা, রামমোহন লাইব্রেরীর সম্পাদক বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পিতা মিঃ এস্ কে লাহিড়ী মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে যার পর নাই ব্যথিত হইলাম। তিনি আমাদিগের বাস্তবিকই পরম হিতকারী বন্ধু ছিলেন। আপনি এই শোক-সময়ে আমাদিগের আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন। ভগবান্ সত্বর আপনার শোকাপনয়ন করুন।"

কৃষ্ণনগর—ক্ষিতীশ মেমোরিয়েল ক্লবের সম্পাদক,—

"মহাশয়, সমিতির নিদেশানুসারে লিখিতেছি,—এই সমিতির সভ্যগণ সকলেই কৃষ্ণনগর—৩নং বিভাগের অধিবাসী বাবু শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের আকস্মিক অকালমৃত্যুহেতু বড়ই ব্যথিত হইয়াছেন। স্থানীয় উন্নতিবিধানে মৃত মহাত্মা সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। এস্থানের সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

সমিতি শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গকে পত্রদ্বারা সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

মেসর্স্ থ্যাকার স্পিঙ্ক্ এণ্ড কোং,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পূজনীয় পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদে আমরা অতীব দুঃখিত। এই বিষম শোকসময়ে আপনি আমাদিগের সহানুভূতি জানিবেন।"

মেসর্স ম্যাক্‌মিলান্ এণ্ড কোং,—

"প্রিয় মহাশয়, আপনার পরমারাধ্য পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তিসংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। এই শোকার্ত্তিসময়ে আপনি আমাদিগের আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন।"

স্বর্গীয় মহাত্মা শরৎকুমার লাহিড়ীর পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদ,—ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকা, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪,—

"কলেজ ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থব্যবসায়ী মিঃ এস্, কে, লাহিড়ী মহাশয়ের এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পাঠে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ নিশ্চিতই ব্যথিত ও বিস্মিত হইবেন। গত কল্য প্রাতঃকালেও তিনি স্বাভাবিক সুস্থ শরীরে প্রাতর্ভ্রমণে

বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া বক্ষঃস্থলে বেদনার কথা বলিলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় আসিয়া হৃদ্‌রোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। বেদনাটি প্রায় ছয়ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইবার পর সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটের সময়ে রোগী নিরুদ্‌বেগে নিত্যধামে চলিয়া গেলেন! স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগরের একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলের সন্তান। তিনি ৫৫ বৎসর বয়সে আজ তাঁহার পত্নী, ৫টি পুত্র, ৪টি কন্যা ও বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে কাঁদাইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গত রাত্রিতেই যথারীতি তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা হইয়াছে।"

ঐ তারিখের ইণ্ডিয়ান্ ডেলিনিউস্ পত্রিকায় প্রকাশিত,—

"আমরা বড়ই দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, কলিকাতা-কলেজ-ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ মেসর্স্ এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মিঃ শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় গতকল্য সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটের সময়ে কলিকাতা-হারিসন্ রোড্‌স্থিত স্বীয় ভবনে আকস্মিক হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কল্য প্রাতঃকালে তিনি প্রাতর্ভ্রমণচ্ছলে পার্ক ষ্ট্রীটে কোন এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সেই স্থানেই স্বীয় বক্ষঃপ্রদেশে সহসা যন্ত্রণা অনুভব করেন। গৃহে আনীত হইলে চিকিৎসার সবিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; সায়ংকালে সকলই ফুরাইল! তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। আজ তাঁহার বিরহে বিধবা পত্নী, ৯টি পিতৃহীন বালক-বালিকা ও বহুসংখ্যক আত্মীয় বন্ধু, সকলেই হাহাকার করিতেছেন! শরৎ বাবু বঙ্গের স্বনামধন্য অধ্যাপক ও সমাজসংস্কারক স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সাধুতা ন্যায়নিষ্ঠা ও অমায়িকতা গুণে দশের প্রশংসাভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। গ্রন্থব্যবসায়িগণের মধ্যে তিনি একজন মুখ্যপাত্র।"

ইং ১৯১৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারির অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত,—

"আমরা বড়ই সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থব্যবসায়ী মিঃ শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় গত শুক্রবার অপরাহ্নে ৫টা ৪৫ মিনিটের সময়ে ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রমে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র। শরৎবাবু পাঁচটি পুত্র এবং চারিটি কন্যা রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

১৯১৪ খৃঃ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সংবাদ,—

"বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ আমাদিগকে এই কলিকাতা নগরীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-ব্যবসায়ী বাবু শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিতে হইতেছে। গত শুক্রবার প্রাতঃকালে তিনি কার্য্যোপলক্ষ্যে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া, হঠাৎ বক্ষঃস্থলে তীব্র বেদনানুভব হওয়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ মোটর গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনা হইল। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়কে ও অন্যান্য কয়েকজন চিকিৎসককেও আনাইয়া চিকিৎসারম্ভ হইল বটে, কিন্তু সকলই বিফল! সন্ধ্যাকালে জীবনাবসান ঘটিল! আমরা তঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।"

ঐ সনের ১৭ই ফেব্রুয়াবি তারিখের ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত,—

"বর্ত্তমান যুগের একজন অসাধারণ উদ্যমশীল গ্রন্থব্যবসায়ী বাবু শরৎকুমার লাহিড়ী সহসা ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই একজন স্বনামধন্য পুরুষ। শরৎবাবু নিজ বুদ্ধি ও শ্রমদক্ষতা গুণে যে বৃহৎ ব্যবসায় স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে যেমন তাঁহার নিজ সম্পদ্‌বৃদ্ধি তেমনই দেশের অনেক কল্যাণসাধন হইয়াছে: ব্যবসায়শিক্ষা তাঁহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; কিন্তু ব্যবসায়ে বাঙ্গালী সুদক্ষ হইতে পারে কি না, তাহা তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও সাধুত্ববলে সকলকে সবিশেষ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার ত কথাই ছিল না, তদুপরি নিয়ম নম্রতা সহৃদয়তা ও লোকপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ এতই ছিল যে, পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাব অনুরাগী না হইয়া থাকিতে পাবিত না। এরূপ মহাত্মার মৃত্যু যে কেবল ব্যবসায় সম্বন্ধেই অশুভকর তাহা নহে, প্রকৃত পক্ষে দেশীয় সমাজের পক্ষেও বড়ই দুরদৃষ্টের বিষয়। তাঁহাব পরিবারবর্গের এই নিদারুণ শোকে আমরাও আজ শোকাকুল।"

উক্ত সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের বেঙ্গলী পত্রিকায় প্রকাশিত বাবু জ্ঞানচন্দ্র রায় বি, এল, লিখিত প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ,—

"মেসর্স্‌ এস্‌ কে লাহিড়ী এণ্ড্‌ কোম্পানির স্থাপয়িতা ও স্বত্বাধিকারী বাবু শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যু শিক্ষিত বঙ্গসমাজের পক্ষে বড়ই দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। শরৎবাবু বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় সাধুশিরোমণি স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র। তিনি যাবজ্জীবন যথাশক্তি পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিতে ক্রটী করেন নাই, এবং তাহাই তাঁহার

জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছিলেন। তিন বিষয়ে স্বর্গীয় শরৎবাবুর চরিত্র বঙ্গীয় যুবকগণের একান্ত অনুকরণীয়; সেই তিন বিষয়,—তাঁহার নিষ্কলঙ্ক সাধুতা, অসাধারণ স্বাবলম্বিতা ও অনুপম অমায়িকতা। গত বিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত আমার পরিচয়; এতাবৎ কালের মধ্যে আমি কখনও তাঁহাকে সৎপথচ্যুত হইতে দেখি নাই। তিনি প্রকৃতই স্বীয় সৌভাগ্যসংঘটক স্বনামধন্য পুরুষ! শরৎবাবুর পৈতৃক ধনসম্পত্তি তেমন কিছুই ছিল না। প্রথমতঃ তিনি আলিপুর কলেক্টরিতে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনের একটি চাকরীর উমেদার হইয়া তাঁহার পিতৃবন্ধু সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রায় রামশঙ্কর সেন বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি সুপারিশ-পত্র আনিতে যান।

রামশঙ্কর বাবু শরৎবাবুকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি শরৎবাবুকে চাকরির সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন।

এই ঘটনার প্রায় আঠার বৎসর পরে ইং ১৮৯৮ সালে রামশঙ্কর বাবু পরলোক গমন করিলে আমি একদিন শরৎবাবুর দোকানে গিয়াছিলাম। শরৎবাবু আমার নিকট রামশঙ্কর বাবুর সৎপরামর্শের কথা এবং তদনুসারে নিজের সফলতালাভের বিষয় উল্লেখ করিয়া সেই মৃতমহাত্মার নামোচ্চারণপূর্ব্বক বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"তিনি আমার পিতার ন্যায় ছিলেন, আমার সর্ব্বস্বই তাঁহার অনুগ্রহে।" এইরূপ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও কালীচরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রতি যে সকল অনুকূলাচরণ করিয়াছিলেন, সে কথার উল্লেখকালেও শরৎবাবু বড়ই আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদর্শন করিতেন। এরূপ অভিমানশূন্য কৃতজ্ঞতাস্বীকার অল্পলোককেই করিতে দেখা যায়।

শরৎবাবুর স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি বড়ই প্রশংসনীয়। তিনি স্বীয় সংকল্পসিদ্ধির নিমিত্ত কখনই কোন বড়লোকের সহায়তাপ্রার্থী হইতেন না, নিজ উদ্যম ও শ্রমশক্তিকেই তিনি সর্ব্বসংকল্পসিদ্ধির প্রধান সাধন বলিয়া মনে করিতেন। এই বঙ্গদেশে যদি কোন গ্রন্থকার স্যামুএল স্মাইল্সের ন্যায় স্বাবলম্বিতা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন, তবে বোধ করি,—স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্রই তাঁহার গ্রন্থে প্রধান উদাহরণ স্থল হইবে। উদ্যম, শ্রমশীলতা ও অমায়িক সাধুতা বলে যে ইহসংসারে স্বার্থসিদ্ধি সুনিশ্চিত, এ কথা শরৎবাবু স্বজীবনে যথেষ্ট সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল বঙ্গযুবক স্বীয় সঙ্কল্পসাধনে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়া হতাশায় অবসাঙ্গ হইয়া পড়েন, স্বর্গীয় মহাত্মা শরৎকুমারের

চবিত্রানুস্মরণ তাঁহাদের তদ্রূপ অবশাঙ্গতা-ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ। অক্লান্ত শ্রমশীলতায় শরৎবাবুর সমতুল্য ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। অসাধারণ শ্রমদক্ষতা তাঁহার চরিত্রের সহজ ধর্ম্ম। সময়ানুসারিতা বিষয়ে বঙ্গবাসিগণের এখনও সম্যক্ শিক্ষালাভ হয় নাই, এ কথা অনেকেই কহিয়া থাকেন; কিন্তু সে বিষয়ে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শরৎবাবু আমাদের যেন একটি ঘটিকাযন্ত্রস্বরূপ। তিনি যথার্থই যন্ত্রবৎ অবিরাম কর্ম্মনিরত থাকিতেন। কি দেশীয় কি ইউরোপীয়, যে কোন গ্রন্থকারই হউন, যাঁহার গ্রন্থপ্রকাশের ভার গ্রহণ করিতেন, তাঁহার সহিত শরৎবাবুর কখনও কোন কথায় বা কার্য্যে অবিশ্বাসিতার লেশমাত্র লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই।

মেসার্স্ এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানির নবনির্ম্মিত ব্যবসালয়-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহাশয় সর্ব্বজন-সমক্ষে স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের যেরূপ যশঃকীর্ত্তন করিয়াছিলেন (এই গ্রন্থের ২৬৬।৬৭ পৃষ্ঠা দেখুন) তাহা, কেবল উক্ত মহাত্মার আত্মীয়বন্ধুগণের পক্ষে নহে, বস্তুতঃ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষেই শ্লাঘনীয়, সন্দেহ নাই।

উক্ত মহাত্মাব চরিত্রে আব দুইটি অলঙ্কার ছিল—নম্রতা ও নিরীহতা। এই অপূর্ব্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া শরৎবাবু, কি স্বজনবন্ধুসমাজে কি সাধারণ জনসমাজে, বাস্তবিকই বড় মনোহর শ্রীধারণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কখনও কাহারও সহিত কাতর বই ক্রুদ্ধভাবে কথা কহিতে শুনি নাই। এই দীনতা ও নম্রতা তাঁহার অভিপ্রেত অভ্যস্ত বৃত্তি নহে, বস্তুতঃ উহা তাঁহার অমায়িক সহজ স্বভাব।

যাহাতে তাঁহার মহর্ষিকল্প পিতৃদেবের পুণ্য চরিতাভাস বর্ত্তমান অভ্যুদিত বঙ্গসমাজে সম্যক্ প্রতিভাসিত হয়, এই অভিপ্রায়ে পিতৃভক্ত সাধু পুত্র শরৎকুমার বহু অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত সুপণ্ডিত সুলেখক ব্যক্তিকর্ত্তৃক স্বীয় পিতৃদেবের চরিতকাহিনী বঙ্গভাষায় তথা ইংরাজিভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া সুন্দর সচিত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। এ অনুষ্ঠান তাঁহার অকৃত্রিম পিতৃভক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

স্বদেশে সংশিক্ষাবিস্তার বিষয়ে শরৎবাবু বড়ই আগ্রহবান্ ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত একখানি ইংরাজি সঙ্কলিত-কবিতাগ্রন্থ প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি তাঁহাব স্বর্গগত জনকজননীব পুণ্যার্থে উপযুক্ত ছাত্র ও ছাত্রীগণের পারিতোষিক-পদক প্রদান সঙ্কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে উপরি-

উক্ত গ্রন্থোপস্বত্বের সমুৎসর্গ করেন। এতদ্‌ভিন্ন, তাঁহার পৈতৃক বাসস্থল কৃষ্ণনগরের হিতসাধনার্থে তিনি সততই যথাসাধ্য যত্নবান্ ছিলেন।

গ্রন্থব্যবসায়টিকে শরৎবাবু বড়ই শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিতেন। "গ্রন্থসমবায়ই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়"—মহাত্মা কারলাইল লিখিত এই মহাবাক্যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং তদনুসারে তিনি ও তাঁহার সমব্যবসায়িগণ যে স্ব স্ব ব্যবসায় ব্যপদেশে স্বদেশে শিক্ষাবিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় সংস্কার। এইরূপ কার্য্যে দেশীয় যুবকগণকে প্রোৎসাহিত করিতে এবং সাধ্যমত সহায়তা করিতে তিনি সততই প্রস্তুত ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর এক ঘণ্টা পরেই আমি সংবাদ পাইয়াছিলাম। আমি তখন কোন একটি পুস্তকের দোকানে বসিয়াছিলাম। ঐ দোকানের স্বত্বাধিকারী এই অশুভসংবাদ শ্রবণে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহার দুই ঘণ্টা পরে আমি লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম তথায় দুই জন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রকাশক সমুপস্থিত। তাঁহারাও তাঁহাদের সুহৃৎ নেতা ও মন্ত্রণাদাতা হারাইয়াছেন বলিয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন না সত্য, কিন্তু সাধুতা ও শ্রমশীলতা ফলে মানুষ কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা তিনি স্বজীবনে সম্যক প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন্ কবি তাঁহার "জীবন সঙ্গীত" নামক কবিতাটিতে যে মহোপদেশের আভাস দিয়া গিয়াছেন, মহাত্মা শরৎকুমার স্বীয় চরিত্রে তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। লোকপ্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা ও অমায়িকতার উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার পুণ্যচরিত্র অনেকের স্মৃতিমন্দিরে অনেক দিন জাগরূক রহিবে। চরিত্রবলই তাঁহার সারসম্বল ছিল। বঙ্গের বর্ত্তমান যুগে যুবকগণের পক্ষে শরৎকুমারের সাধু জীবনচরিত অব্যর্থ রসায়ন ও অপূর্ব্ব উদ্দীপন স্বরূপ, সন্দেহ নাই। মহাত্মা বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্‌লিনের ন্যায় শরৎবাবু কতকগুলি সুনীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ সকলের তিনি একটি সুন্দর তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি এই তালিকার নাম দিয়াছিলেন "An Alphabet of Success=ইষ্টসিদ্ধির মন্ত্রমালা। ঐ তালিকাধৃত অমোঘ মহামন্ত্রগুলি তাঁহার স্বরচিত, এবং উহাদের মধ্যে সংক্ষেপে অসংখ্য সারতত্ত্ব সন্নিহিত। উহাদের কয়েকটির বঙ্গানুবাদ পরপৃষ্ঠে প্রদত্ত হইল।—

"পরীক্ষায় অধীর হইও না"
"সাধুতাই সারপুণ্য বলিয়া জ্ঞান করিবে"
"ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করিও না"
"সকলকেই সাদরে অভিবাদন করিবে"
"কোন অনুরোধেই মিথ্যা কথা কহিও না" ইত্যাদি।

বর্ত্তমান যুগের বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ মহাত্মা শরৎকুমার কৃত উপরিউক্ত মন্ত্রমালা অভ্যাস করিলে যে তাঁহারা সংসার-সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া সুনির্ম্মল যশোভাগী হইবেন, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ ;—

"দেশীয় গ্রন্থব্যবসায়িগণের মধ্যে সুবিখ্যাত এস্, কে, লাহিড়ী মহাশয় যেরূপ সম্মান ও প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন সেরূপ আর কেহই করিতে পারেন নাই। শরৎবাবু স্বর্গীয় সাধুপ্রবর পবিত্রস্বভাব মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর মধ্যম পুত্র ; ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতা নগরীতেই তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার পৈতৃক সদ্‌বৃত্তিসমূহের সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছিলেন ; তৎফলতঃ তাঁহার ব্যাবসায়িক আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত যথোচিত বিশুদ্ধ ও প্রীতিকর হইয়াছিল। লাহিড়ী মহাশয় বাল্যে কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু অস্বাস্থ্য বিধায় তাঁহাকে শীঘ্রই পাঠ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই শরৎবাবুর মনে স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বনে বড় সাধ। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে তিনি সামান্য আকারে পুস্তক বিক্রয়ের কারবার আরম্ভ করিলেন। স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শরৎবাবুর পিতৃবন্ধু, এবং রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতার প্রিয় ছাত্র। এই দুই মহাত্মাই শরৎবাবুর ব্যবসায়ের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ক্রমশঃ শরৎবাবু বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগ্য গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায় গুণে অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি হইল, তখন তিনি দেশীয় গ্রন্থপ্রকাশকগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তিনি যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থপ্রকাশ করিতেন তন্মধ্যে সর্ ডব্লিউ ডব্লিউ হণ্টর কে, সি, এস্, আই, জষ্টিস্ ওকিনিলি, জষ্টিস্ বিভর্লি, জষ্টিস্ ফিল্ড্, জষ্টিস্ র্যাম্পিনি, জষ্টিস্ আমির আলি, জষ্টিস্ পাজিটর্, জষ্টিস্ ক্যাস্পার্জ, মিঃ জেন্‌বী প্রিন্‌সেপ. জষ্টিস্ দিগম্বর

চট্টোপাধ্যায়, মিঃ আর, সি, দত্ত, সি, আই, ই, সর্ হেন্‌রী কটন কে-টি, কে, সি, আই, ই, সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে-টি, জষ্টিস্ কার্ণডফ্, জষ্টিস্ এ চৌধুরী প্রভৃতি মহাজনগণের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে ইংলিশমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়,—

"বিলাতে জন মরে, মাক্‌মিলান্ ও লংমান প্রভৃতি গ্রন্থব্যবসায়িগণের যেরূপ পদমর্য্যাদা ভারতে মিঃ এস্, কে, লাহিড়ীর পদমর্য্যাদাও ঠিক সেইরূপ। লাহিড়ী মহাশয় সদ্‌বংশসম্ভূত এবং সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, তিনি স্বীয় ক্ষমতায় শিক্ষা-বিভাগীয় সুবৃহৎ গ্রন্থব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহার যথোচিত উন্নতি-সাধনেও সমর্থ হইয়াছেন।

গ্রন্থকারগণের সহিত তথা জনসাধারণের সহিত সদ্‌ব্যবহারহেতু তিনি যথেষ্ট মানসম্ভ্রম ও সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি নিজেও গ্রন্থানুরাগী ব্যক্তি, সুতরাং গ্রন্থক্রেতা ও গ্রন্থপ্রণেতা সকলেরই তিনি হিতৈষী বন্ধু এবং সদুপদেশক। তাঁহারা অনেকেই লাহিড়ীমহাশয়ের প্রিয়াচরণের বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন।

মিঃ এস্, কে, লাহিড়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এমন কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন যাহার বার্ষিক আয় তিন হাজার টাকার কম নহে। ঐ আয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বঙ্গভাষা-পর্য্যালোচক অধ্যাপক নিযুক্ত রাখা হইয়াছে, এবং লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নামানুসারে ঐ অধ্যাপক-পদের নামকরণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, প্রতিবর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে যে ছাত্র, এবং ছাত্রীগণের মধ্যে যে ছাত্রী বি,এ, পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, সেই ছাত্র ও ছাত্রী একখানি করিয়া সুবর্ণপদক পারিতোষিক পাইবেন, এই বন্দোবস্তে তদুপযুক্ত সম্পত্তিও লাহিড়ী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া গিয়াছেন। উক্ত বদান্য মহাত্মার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর নামানুসারে ঐ সুবর্ণপদকের নাম যথাক্রমে "রামতনুলাহিড়ী-সুবর্ণপদক" ও "গঙ্গামণিদেবী-সুবর্ণপদক"।

লাহিড়ী মহাশয় সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের সুনীতিসঙ্গত সৎপথানুসরণে সতত তৎপর ছিলেন। দেশীয় ব্যবসায়িগণ সকলেই যদি শরৎবাবুর ন্যায় উদ্যমশীল স্বাবলম্বী ও সাধুপ্রকৃতি হয়েন, তবে দেশের পক্ষে উহা কতই সৌভাগ্যের কথা!"

সন ১৩২০ সালের ৯ই ফাল্গুন তারিখের "বঙ্গবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত,—

"এস্, কে, লাহিড়ী নামে সুপরিচিত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা ও পুস্তকপ্রকাশক গতসপ্তাহের শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ঐ দিন মধ্যাহ্নে তিনি সুস্থশরীরে কোন একটি ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করেন। সেইখানে তাঁহার বুকে হঠাৎ ব্যথা ধরে। সেই ব্যথায় তিনি কাতর হইয়া পড়েন। তখনই মোটরে করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং অন্যান্য চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। সন্ধ্যার সময় তাঁহার জীবনবায়ু ফুরাইয়া যায়। তিনি এস্, কে, লাহিড়ী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুরানাম শরৎ কুমার লাহিড়ী। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম রামতনু লাহিড়ীর পুত্র। শরৎকুমার প্রথমে আলিপুরে কালেক্টরি আফিসে আটচাল্লশ টাকা মাহিনায় কেরাণীগিরি করেন; কিন্তু প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। স্বাধীনভাবে সদ্‌ব্যবসায়ে জীবিকা-অর্জ্জনের প্রবৃত্তি হেতু তিনি চাকুরী ছাড়িয়া কেতাবের দোকান করেন। তিনি ভাবিতেন ইহাতে জ্ঞানপ্রচার ও উপার্জ্জনের সুবিধা ও সুযোগ। অধ্যবসায়ে ও সাধুতায় তিনি ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিলাসী ছিলেন না। সচ্চরিত্রতায় এবং অমায়িকতায় তিনি সকলেরই প্রীতিভাজন ছিলেন। কাহারও কোন অন্যায় কার্য্য দেখিলে তিনি ক্রুদ্ধ না হইয়া আপন স্বভাবসিদ্ধ মধুরতায় অন্যায় কার্য্যকারীকে শিক্ষা দিতেন। আধুনিক শিক্ষাসাধনায় তাঁহার প্রবৃত্তি যেমন প্রস্ফুরিত হইত, অধুনা পুস্তকবিক্রেতা বা পুস্তকপ্রকাশকের মধ্যে তাহা বিরল। তাঁহার বিয়োগে কলিকাতার পুস্তকবিক্রেতা ও পুস্তকপ্রকাশকবর্গ একজন পরমহিতৈষী পরামর্শদাতাকে হারাইলেন ভাবিয়া চক্ষুর জল ফেলিয়াছিলেন। সে দিন পুস্তকের দোকানসমূহ তাঁহার সম্মানার্থ বন্ধ ছিল। শরৎকুমারের ন্যায় সরল সচ্চরিত্র অধ্যবসায়ী পরমহিতৈষী লোকের বিয়োগে কাহার না ব্যথা হইবে? এখন গুণাবলী স্মরণীয়। মরণযন্ত্রণা না পাইয়া যিনি মরেন, তিনি ধন্য। শরৎকুমার মধ্যাহ্নে অসুস্থ হইয়া সন্ধ্যায় জন্মের মতন চলিয়া গেলেন।" (বঙ্গবাসীর প্রকাশিত এই সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থানে স্থানে ভ্রমসঙ্কুল।)

১৩২০ সালের ৭ই ফাল্গুন তারিখের "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় প্রকাশিত,—

"পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ

গত শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। পুণ্যাত্মা (রামতনু) লাহিড়ী মহাশয় সন্তানদিগকে পার্থিব কোন ধনের অধিকারী করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার সাধুতার অংশ সন্তানদের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। শরৎবাবু সাংসারিক ক্লেশ দূর করিবার জন্য একদা ৪০৲ টাকা বেতনের কেরাণীর পদ পাইবার জন্য উমেদারী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতার বন্ধু ৺রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের পরামর্শে পুস্তকের দোকান স্থাপন করেন। সাধুতাগুণে দরিদ্র শরৎকুমার ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ জজেরা তাঁহারই উপর পুস্তকপ্রকাশের ভার অর্পণ করিতেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

তিনি গত শুক্রবার প্রাতঃকালে ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীর কোন পীড়িত আত্মীয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন, সেখানে হঠাৎ মূর্চ্ছার ভাব হয়। তাঁহাকে মোটর গাড়ীতে করিয়া বাড়ীতে প্রেরণ করা হয়। তখনই প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ আসিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করেন। অপরাহ্ন ৫টা ১৫ মিনিটের সময়েই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে পুণ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলকে সান্ত্বনাদান করুক।"

উল্লিখিত সংবাদপত্রগুলি ব্যতীত আরও অনেক দেশীয়বিদেশীয় সংবাদপত্রে শরৎকুমার বাবুর জীবনান্ত-গুণগান সমস্বরে গীত হইয়াছিল; পূর্ব্বোক্ত মহাত্মগণ ব্যতীত অন্যান্য অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বিয়োগব্যথা নানামতে নানাকথায় প্রকাশ করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিজয়ী কাল ক্রমে সকল শোকসন্তাপ প্রশমিত করিয়া শরৎবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারে পুনর্ব্বার শান্তিস্থাপন করিয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী মহাশয় নবীন হইলেও সম্যক্ প্রবীণতার সহিতই পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণে পৈতৃক ব্যবসায়াদিকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত করিতেছেন। "পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ং"—লোকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিতে ইচ্ছা করে, কেবল পুত্রের নিকট পরাজয়ই প্রার্থনা করে। বিদ্যাবুদ্ধি বিত্ত ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়েই পুত্র আপনা অপেক্ষা মহত্তর পদপ্রাপ্ত হউক ইহাই সাধারণতঃ সকলেরই কামনা, এবং সে কামনা পূর্ণ হইলে সকলেই পরম প্রীতিলাভ করেন। অতএব, স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোকগত পুণ্যাত্মা আজ উপযুক্ত আত্মজকে কোন কোন বিষয়ে স্বীয় সম্যক্ আকাঙ্ক্ষিত অথচ

অসাধিত কর্ম্মের সাধন করিতে দেখিয়া নিশ্চিতই অপার আনন্দ লাভ করিতেছেন। তিনিও আশীর্ব্বাদ করুন, আমরাও প্রার্থনা করি, এই সাধুবংশের সন্তানগণ দীর্ঘায়ু হইয়া উত্তম অধ্যবসায় ও সাধুতাগুণে স্বস্বকার্য্যে উন্নতিসাধনপূর্ব্বক সুপবিত্র রামকৃষ্ণ-রামতনু-বংশের পুণ্যগৌরবরক্ষা ও যশঃসৌরভবিস্তার করুন।

উপসংহার

বর্ত্তমান বঙ্গে যে নবযুগ উপস্থিত, এ যুগে দেখিতেছি, সহৃদয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে বিদ্যাবাণিজ্য কৃষিশিল্পাদির আলোচনা যথেষ্টই চলিতেছে, তৎফলে দেশীয় জনসাধারণের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে এ কথাও অস্বীকার্য্য নহে; আমরা দেশীয়গণ এখনও যে অনেক বিষয়ে অধঃপতিত, ইহাও আজ বুঝিতে শিখিয়াছি সেই ইংরাজপ্রদত্ত জ্ঞানবৃদ্ধিবলে; অমায়িক ইংরাজ আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় সমতুল্য হইতে শিক্ষা দিতেছেন, আমরা উপযুক্ত হইলেই সাদরে সোদরবৎ একাসনে বসাইতেছেন সত্য, কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও আমরা অনেক সময়ে আমাদের অনেককালের অভ্যস্ত কুঅভ্যাস বশতঃ সে সকল শিক্ষা ও সমাদরের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। শিক্ষার সদ্ব্যবহার, সময়ের সদ্ব্যবহার, জাড্যের পরিহার, ব্যবসায়ে সমবায় ও সত্যনিষ্ঠা, মিতাচার, মিতভাষিতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে সাধারণতঃ আমরা এখনও অনেক পশ্চাৎ পড়িয়া আছি। আমাদের মধ্যে কৈচিৎ কেহ এই সকল সদ্গুণালঙ্কৃত থাকিলেও, এই সকল সদ্গুণ আমাদের জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ হইতে এখনও যে বহু বিলম্ব, এ কথা অনেকেই অবাধে স্বীকার করিবেন।

আমরা নানাবিধ ভোজ্য-ভোগ্যে পরিতৃপ্ত হইতেছি, ভিষক-ভৈষজ্যেরও অভাব নাই, শরীর কিন্তু সততই অসুস্থ! কেশবিন্যাস বেশবিন্যাস সাবানসৌগন্ধ-বিলেপন প্রভৃতির ত্রুটী নাই, দেহের লাবণ্যজ্যোতিঃ কিন্তু কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! থিয়েটার বায়স্কোপ সার্কাস্ হারমোনিয়ম্ নাটক নবেল প্রভৃতি আনন্দোপকরণের অভাব নাই, চিত্ত কিন্তু সাধারণতঃ সদাই নিরানন্দ! বিদ্যা শিখিয়াছি, বুদ্ধিও কম নহে, বিনয় সুবিবেক কিন্তু বড়ই বিরল! ঐকমত্যই যে জাতীয় উন্নতির মূলমন্ত্র, তাহা বিবিধপ্রবন্ধে বুঝিতে ও বুঝাইতে শিখিয়াছি, দুইজনে কিন্তু একযোগে কোন কারবার খুলিয়া দুইবৎসরকালও অবিরোধে চালাইতে পারি না, অথবা এক গ্রামে দশঘর বাস করিলে অন্ততঃ দুইটা দল না বাঁধিয়া থাকিতে পারি না! দশবিংশতি বা শতসহস্র উপার্জ্জন করিতেও শিখিয়াছি, পদমর্য্যাদাবোধ বা ঐশ্বর্য্যাভিমানও পূর্ণমাত্রায়, ঋণজালে কিন্তু প্রায়শঃই আপাদমস্তক বিজড়িত! সারা বৎসর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া চাষ-

আবাদ করিলাম, 'পশ্চাত্তু ঝঞ্ঝনায়তে'—হয় জলাভাবে জ্বলিয়া গেল, না হয় জলতলে ভাসাইয়া গেল! পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া ধরিল, সহরে পলাইলাম, সেখানেও প্লেগ্ আসিল, তবে এখন যাই কোথা? কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর ঋণ করিয়া পাঁচ হাজার টাকা দিয়া একটি উপযুক্ত জামাই কিনিয়া আনিলাম, কিছু দিন পরেই বাবাজি আমার হয়ত স্বদেশী দস্যুদলে ধরা পড়িয়া শ্রীঘরযাত্রা হইলেন। ভাবিলাম, পুত্রটি এম্ এ পড়িতেছে, পাস্ করিলেই বিবাহ দিয়া ঋণশোধ করিব, উদ্বৃত্ত কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে। যথাকালে শ্রীমান্ পরীক্ষোত্তীর্ণও হইলেন, কিন্তু,—সকল আশায় জলাঞ্জলি!—শ্রীমানের সহসা সর্দ্দি লাগিল, ক্রমে একটু খুক্‌খুকি কাস হইল, অবশেষে কাসের সহিত একটু একটু লাল ছিট্ দেখা দিল। বিবাহ দেওয়া ত ঘুচিলই, সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডও ঘুরিয়া গেল!

এ কি আমাদের অদৃষ্টেরই দোষ, না বিধাতার দোষ, না ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরই দোষ? আমরা স্বয়ং যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সে কথা স্থিরসিদ্ধান্তই করিয়া রাখিয়াছি। অতএব, যত কিছু দোষ, হয় গবর্ণমেণ্টের, না হয় দগ্ধ অদৃষ্টের অথবা নির্দ্দয় বিধাতার।

বাঙ্গালী আমরা বর্ত্তমানে অধিকাংশে এইরূপ সুখশান্তিতেই কালাতিপাত করিতেছি, এবং এ দুর্দ্দশার হেতুনির্দ্দেশও সচরাচর পূর্ব্বোক্তরূপই করিয়া থাকি। তথাপি কিন্তু আত্মদোষে দৃক্‌পাত নাই, আত্মসংশোধনে আগ্রহ নাই!

আমরা জানি কিন্তু মানি না যে, অনালস্য আগ্রহ সদাচার স্বাবলম্বন সংযম সহিষ্ণুতা বিনয়শিষ্টাচার প্রভৃতি গুণই মানবের সুখস্বচ্ছন্দতার আদি নিদান।

যেবারে দামোদরের জলে বর্দ্ধমান ডুবিল, সেবারে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রামের কৃষকেরা সেইদিন অপরাহ্নে সহসা মাঠে অল্প অল্প জল আসিতেছে দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ তাহারা গ্রামে আসিয়া মাতব্বর অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তিকে জানাইল। মাতব্বর তেমন কিছু ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি নহেন, তবে তাঁহার অবস্থা মোটামুটি মন্দ নহে, তাহাতে আবার তিনি ব্রাহ্মণ ও চিকিৎসক, একারণ সকলেই তাঁহার প্রাধান্য মানিয়া চলিত। মাতব্বর মহাশয় তৎক্ষণাৎ মাঠে গিয়া জলের গতি ও বৃদ্ধি দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, নিশ্চিতই দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। তিনি অবিলম্বে গ্রামের মধ্যে আসিয়া ভদ্রাভদ্র আবালবৃদ্ধবনিতা সকল লোক ডাকিয়া শ্রেণিবিভাগ ও কার্য্যবিভাগ করিয়া দিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গ্রামখানি একরূপ প্রাচীরপরিবেষ্টিত হইয়া গেল,

গ্রামস্থ গৃহস্থগণের গৃহে খাট চৌকি কবাট দরজা ঘরের বেড়া যত ছিল সবই প্রাচীরের বহিরাবরণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইল, ভদ্রাভদ্র স্ত্রীপুরুষ বালকবৃদ্ধে প্রায় পাঁচ ছয় শত লোক দুই তিন শত লণ্ঠন ও মশাল জ্বালিয়া সারারাত্রি কার্য্যে নিযুক্ত রহিল, পাঁচ সাত দল লোক কোদালি লইয়া চতুষ্পার্শে স্থানে স্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিল, যে স্থান ভাঙ্গিবার উপক্রম হইতেছে অমনি তথায় মাটি কাটিয়া লাগাইতেছে, চারি পাঁচ দল অবিরাম প্রাচীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে, স্বয়ং মাতব্বর মহাশয় সৈন্যাধ্যক্ষ সাজিয়া এক লণ্ঠন হস্তে লইয়া সারারাত্রি প্রাচীরের প্রতি অংশের ও রক্ষিদলের প্রতিকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা সারারাত্রি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের আর্ত্তনাদ কোলাহল শুনিতে লাগিলেন, প্রভাত হইলে দেখিলেন সেই সকল গ্রামের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রামখানির কোনই ক্ষতি হয় নাই। ভাগ্যে মাতব্বর মহাশয় পল্লীবাসী বর্ব্বর, তাই কেহ জানিল না শুনিল না, গ্রামখানি নিঃশব্দে রক্ষা পাইয়া গেল, কিন্তু যদি তিনি উচ্চশিক্ষিত সহুরে বা চাকুরে হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় সপরিবারে সারারাত্রি স্বয়ং নিরাপদে ছাতে বসিয়া চাষা-বেচারাদের সর্ব্বনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন, এবং পরদিন এই দুর্ঘটনার বিবরণ লিখিয়া ও তৎসঙ্গে বাঁধভঙ্গ সম্বন্ধে পবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের শতদোষ কীর্ত্তন করিয়া সংবাদপত্রে পত্রপ্রেরণ করিতেন; তৎপরে হয়ত খোলা ছাতে সারা রাত্রি শিশির ভোগ করায় অচিরেই তাঁহাকে নিউমোনিয়াগ্রস্ত হইতে হইত। স্বাবলম্বনই প্রকৃত স্বাধীনতা।

আবার, পল্লীগ্রামে মেলেরিয়া কলেরা প্রভৃতি সাময়িক পীড়ার প্রাদুর্ভাব-সময়ে অনেকবার অনেক স্থানে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, হিন্দু গৃহস্থালয়ে হয়ত সকলেই পীড়াগ্রস্ত শয্যাশায়ী, মাত্র দুই একটি বিধবা সুস্থস্বচ্ছন্দ থাকিয়া রোগিগণের ঔষধ পথ্য প্রদান ও শুশ্রূষাবিধান করিতেছেন, সময়ে স্নানাহার নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, তথাপি তাঁহাদের অবসাদ বা অস্বাস্থ্য বোধ নাই। প্রত্যহ গ্রামে দুই চারিটি মরিতেছে, দুইচারিটি পীড়াক্রান্ত হইতেছে, কিন্তু হতভাগিনীদের কথা যেন যমরাজ ভুলিয়া গিয়াছেন! দয়াবতীরা নিজের আত্মীয় স্বজনগণের শুশ্রূষার অবসরে আবার পাড়ার রোগিগণকেও এক এক পাক দেখিয়া আসিতেছেন, হয় ত প্রতিবেশিনী কোন রমণী কোলের শিশুসন্তানটি রাখিয়া মহাযাত্রা করিয়াছেন, কোন করুণাময়ী অবসর মতে এক একবার গিয়া সেই মাতৃহারা অবোধ অপোগণ্ডটিকে কোলে লইয়া সোহাগ করিতেছেন!

বঙ্গের সেই বর্ব্বর পল্লীবাসিনী নগণ্যা 'নাইটিংগেল্'-গণ নিজ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতার কথা ভুলিয়া গিয়া মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া পরসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন! তাঁহারা কোন দিন কোন প্রিভেণ্টিভ্ ঔষধও ব্যবহার করেন না, বা ফিল্টার করিয়াও জল খান না; ইন্দ্রিয়সংযম ও আহারবিহার-সংযম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রিভেণ্টিভ্।

হায় হায়, সংযম হারাইয়া আজ আমরা ব্যাবামরূপী শত ব্যাধের শাকার-স্বরূপ,—ডাক্তারবাবুদিগের কৃপা-পালিত শুকপক্ষী!

এইরূপে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে আমরা শত দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই,—ধীরচিত্তে বিচার করিলে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি, সংযম স্বাবলম্বন সন্তোষ সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণই মানবের যথার্থ শান্তিবিধায়ক, সুতরাং সে শান্তিলাভ—যেরূপ স্বীয় পুরুষকারায়ত্ত সেরূপ দৈবায়ত্ত অদৃষ্টায়ত্ত বা রাজায়ত্ত নহে। এবং উক্ত সদ্গুণাবলীলাভে যাঁহারা সচেষ্ট তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান্ ব্রিটিশ রাজবিধান বড়ই সহায়ভূত। এ সাহায্যে আমরা ইচ্ছা করিলে যে কোন সদভ্যাস সদনুষ্ঠান অবাধেই করিতে পারি, অবাধেই আমরা সুখের সংসার—শান্তির জীবন গড়িয়া লইতে পারি। আমরা হিন্দু মুশলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি বঙ্গসন্তানগণ স্ব স্ব ধর্ম্মানুমোদিত সাধুপথাবলম্বনে পরস্পর সহানুভূতিমান্ হইয়া, জমিদারপ্রজা, প্রভুভৃত্য, খাতকমহাজন, গুরুশিষ্য, লেখকপাঠক, বক্তাশ্রোতা প্রভৃতি সকলেই সংযমী, সত্যনিষ্ঠ স্বাবলম্বী অনসূয় শান্ত সহিষ্ণু হইয়া বৃটিশ মহাশক্তির আশ্রয়ে একটি অপূর্ব্ব বঙ্গীয় শক্তির ক্রমবিকাশ অবশ্যই প্রত্যাশা করিতে পারি। যদি কেহ মনে করেন যে, বর্ত্তমান বঙ্গে সে শক্তির জন্ম হইয়াছে, তবে তিনি যেন ইহাও মনে করেন যে, ব্রিটিশ মহাশক্তিই তাহার জননী, এবং সেই বালিকা-বঙ্গশক্তির জীবন এখনও অনেকদিন জননী-আশ্রয়সাপেক্ষ, নচেৎ তাহার জীবনরক্ষা সুকঠিন; মাতৃদ্রোহিতা কোন দিনই তাহার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে না। সাধক হইয়া সহসা সিদ্ধের অধিকার লাভ করিতে গেলে আমরা মাত্র ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টই হইব।

ইংরাজের এই সাম্যনীতিক শাসনসময়ে আমরা দুরাশা বা দাম্ভিকতার বশবর্ত্তী না হইয়া যদি সহিষ্ণুতাবলম্বনে উক্তরূপ সদ্গুণাবলীলাভের প্রয়াস পাই, তাহা হইলে আমরা আমাদের সেইরূপ সাধু প্রয়াসের শুভফল [illegible] ইংরাজ-রাজত্বের সম্যক্ উপকারিত্ব অচিরেই উপলব্ধি করিতে পারি।

উক্তরূপ গুণসমবায় হেতুই মহাত্মা শরৎকুমার লাহিড়ীর সুমহৎ চরিত্র

বঙ্গীয় বর্ত্তমান যুগের নবযুবকগণের পক্ষে অপূর্ব্ব আদর্শস্বরূপ। সবিশেষ অনুকরণীয় তাঁহার অপূর্ব্ব স্বদেশানুরাগ! তিনি বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনকল্পে যে অসাধারণ স্বার্থত্যাগিতার পরিচয় দিয়াছেন, সে স্বার্থত্যাগিতায় বঙ্গদেশের যেরূপ মহোপকার সাধিত হইয়াছে, সেরূপ হিতসাধনের প্রয়াস এযাবৎ কোন স্বদেশহিতৈষী মহাজনের কল্পনাতেও উদিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। তিনি যেরূপ আড়ম্বরবিহীন ও সমারোহশূন্য নিঃশব্দ সদনুষ্ঠানে দেশের ও দেশবাসীর হিতসাধন করিতেন, এযুগে এদেশের বিষাণ-বিঘোষী দেশহিতৈষী মহাশয়গণের তথাভিহিত দেশহিতৈষণার বৃষোৎসর্গ-ব্যাপার-সমূহ তৎতুলনায় বিষম বিড়ম্বনা মাত্র বলিয়াই প্রতীয়মান। মহাকবি কালিদাস রঘুরাজগণের গুণবর্ণনায় যে বলিয়াছেন—"ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ", মহাত্মা শরৎকুমারের সদর্থে স্বার্থত্যাগিতায় সে বর্ণনা সম্যক্ প্রযোজ্য। এ যুগের কোন কোন মহাজন দুর্দ্দিনে দুরবস্থায় সহৃদয় রামতনু-পুত্রের যথাসম্ভব সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু সে সকল কথা শরৎকুমার কোন দিনই ভ্রমক্রমেও কাহারও নিকট নিজমুখে ব্যক্ত করেন নাই, কিংবা উক্ত মহাশয়গণের নিকট কোন দিন কোনরূপ প্রত্যুপকার প্রত্যাশাও করেন নাই।

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও মনে অদ্যাপি এরূপ একটা সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, ব্যবসায়কার্য্যে একটু প্রবঞ্চনাবুদ্ধি না খাটাইলে, লোক্‌শান্ না হউক, বিশিষ্ট লাভবান্ হওয়া অসম্ভব। বঙ্গীয় ব্যবসায়িসমাজে এ সংস্কার অতিসংগোপনে অনেকের অন্তর্মূলে সন্তর্পণে সংপোষিত। বিশত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া বিশ্বাসিতার চরম পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সুযোগ বুঝিয়া একবার বিশ ত্রিশ হাজার মারিয়া বসিলেন, এরূপ সুবিজ্ঞ সাধু ব্যবসায়ী বঙ্গীয় ব্যবসায়িসমাজে অদ্যাপি বোধহয় একান্ত অদৃশ্য নহে। এই হেতুই আমরা ব্যবসায়ী শরৎকুমারের সাধু চরিত্র সাধারণ ব্যবসায়িগণেরও আদর্শরূপে প্রদর্শন করিতে প্রয়াসী। শরৎকুমারের ব্যবসায় যে সম্পূর্ণ সাধুতামূলক সে বিষয়ে অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন; তাহা তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে শোকসূচক পত্রাবলীতেই সুপ্রকাশ।

যশোর-নড়াইলের বিষয়াভিজ্ঞ সুবিচক্ষণ প্রবল-প্রতাপ জমিদার স্বর্গীয় রামরতন রায় মহাশয় বলিতেন,—"যাহারা ভাবে যে, আয় যত অল্পই হউক না কেন, ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া ক্রমে অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক বড়লোক হইব, তাহারা নিতান্ত ছোট লোক; আর, যাহারা মনে করে যে, মানসম্ভ্রম রক্ষা, পোষ্যবর্গের পরি-

পোষণ, অভাবীর অভাবমোচন, যাচকের যাচ্ঞারক্ষা, পিতৃদেবাতিথির পরিতর্পণ ইত্যাদি মনুষ্যজীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য সম্পাদনার্থে যেরূপ ব্যয় আবশ্যক উহা করিতেই হইবে, এবং সেই ব্যয় সঙ্কুলনার্থে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অনাহারে অনিদ্রায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলেও তাহাই স্বীকার্য্য, তাহারাই যথার্থ বড়লোক, এবং তাহারা কখন দরিদ্র হয় না।" জমিদার মহাশয়ের ছোটলোক-বড়লোকের এই সংজ্ঞাসূত্রটি বড়ই বীরোচিত বচন।

স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ও সম্ভবতঃ উক্তরূপ নীতিরই অনুসরণ করিতেন। একদিন অনেকগুলি লোক ক্রমশঃ আসিয়া তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিল,—কেহ পাওনাদার, কেহ সাহায্যপ্রার্থী, কেহ ঋণপ্রার্থী ইত্যাদি। সে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় বিষয়বিশেষে বড়ই ব্যতিব্যস্ত, আমিও তথায় উপস্থিত। ক্রমে যখন সর্ব্ববিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া সুস্থির হইলেন, তখন শরৎবাবুর জনৈক বন্ধু বলিলেন,—"আজ যেমন ব্যস্ততার দিন, তেমনি নানা লোকে আসিয়া বড়ই বিরক্ত করিয়াছে।"

সদাশয় শরৎকুমার উত্তর করিলেন,—"না না, কাহারও প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হই নাই। ও সকল কার্য্য ত আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। উহার নিমিত্তই ত এত পরিশ্রম, এত উপার্জ্জনচেষ্টা! পত্নীপুত্রকন্যা ও ভৃত্যগণ যেমন আমার প্রতি পতি পিতা ও প্রভুস্থানে ভরণপোষণাদির দাবি করিতে পারে, তেমনই আত্মীয়-কুটুম্বগণও পরমাত্মীয় জ্ঞানে, বিপন্ন ব্যক্তি সম্পন্ন জ্ঞানে, প্রার্থী অর্থবান্ জ্ঞানে আমার প্রতি যথাসম্ভব দাবি করিতে অবশ্যই পারে; ঐ সকল দাবি যথাসাধ্য পূরণ করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি বিরক্ত হইব, তবে আর এত পরিশ্রমে অর্থউপার্জ্জনের প্রয়োজন কি, জীবনেরই বা সার্থকতা কি? আহা, এরূপ দাবির সংখ্যা যাহার উপর যত অধিক, তাহার জীবন ততই ধন্য!"

ধন্য শরৎকুমারের সাধু সঙ্কল্প! তিনি তাঁহার ঐ সকল সঙ্কল্পিত দাবিপূরণে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন নাই। ধন্য তাঁহার সাধুজীবন! এই জন্যই বলি, কি অর্থের উপার্জ্জনে কি তাহার বিনিয়োগে সর্ব্বত্রই শরৎকুমারের সাধুচরিত্র বঙ্গীয় বর্ত্তমান শিক্ষিতসমাজের একান্ত অনুকরণীয়। বিশিষ্ট প্রতিভাপ্রভাবে এ বঙ্গে অনেক মহাজন অনেক মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, তাঁহাদের সাধুচরিতাবলী সাধারণের আদর্শস্থানীয় হইলেও অনায়াসে অনুকরণীয় নহে। কিন্তু বর্ত্তমান-যুগের সাধারণ গৃহস্থ সন্তানগণের পক্ষে সাধু শরৎকুমারের চরিত্রের অনুকরণ

সর্ব্বত্র সুসাধ্য এবং সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। তিনি অসাধারণ বিদ্বান্, অসাধারণ প্রতিভাবান্, অসাধারণ ধনবান্ ইত্যাদিরূপ অসাধারণ কিছুই নহেন, অসাধারণত্ব তাঁহার কিছুতেই ছিল না, সর্ব্ববিষয়েই তিনি আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তি; অসাধারণ কেবল তাঁহার অধ্যবসায়, অসাধারণ তাঁহার শ্রমশীলতা, অসাধারণ তাঁহার স্বাবলম্বিতা, এবং সর্ব্বোপরি অসাধারণ তাঁহার অমায়িক সাধুত্ব ও সদাশয়তা। ইহাতেই তাঁহার চরিত্রের অসাধারণত্ব সম্যক্ প্রতিপন্ন। এবং ইচ্ছা করিলে সাধারণতঃ সকল গৃহস্থসন্তানই স্ব স্ব সাধারণ জীবনে, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র বা জগদীশচন্দ্রের ন্যায় না হউক, দরিদ্রতনয় মহাত্মা শরৎকুমারের ন্যায় অসাধারণত্ব লাভ করিয়া অবাধে কৃতার্থ হইতে পারেন।

শরৎবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি অন্য কোন ধর্ম্মবলম্বীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। ব্যবসায়ক্ষেত্রে কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহার কাহারও সহিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। বলিতে গেলে, শরৎবাবু এ সংসারে প্রকৃতই শত্রুহীন ছিলেন। সংসার-বিপণিতে আসিয়া বিনয়নম্রতা বিনিময়ে তিনি বহুবন্ধুত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। শরৎকুমারের ন্যায় শান্তি সৌহার্দ্দের জীবন এ সংসারে বড়ই বিরল, বড়ই বাঞ্ছনীয়।

তাঁহার জীবনের শেষ অংশে তিনটি ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ঘটনাটি বড়ই শোচনীয়, উহা তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার দেহত্যাগ। এই কন্যার নাম শ্রীমতী প্রিয়তমা দেবী। ইনি একটি পুত্রসন্তান রাখিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কন্যাশোকে লাহিড়ী মহাশয় বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সে গুরুতর আঘাত তাঁহার স্বীয় আয়ুঃক্ষয়ের অন্যতম হেতু বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই শোকসময়ে অনেক সহৃদয় মহাত্মা তাঁহাকে সান্ত্বনা-প্রদান করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সর্ লরেন্স্ জেঙ্কিন্স্ বাহাদুরের পত্নী মহামান্যা শ্রীমতী লেডী জেঙ্কিন্স্ মহোদয়ার পত্রখানিই বড়ই অমায়িক সান্ত্বনা-প্রদ।

দ্বিতীয়ঘটনাটি বড়ই আনন্দদায়ক। উহা তাঁহার ব্যবসায়ের নূতনগৃহ-প্রবেশোৎসব। এই ঘটনার সবিস্তার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

তৃতীয় ঘটনাটি যেমন প্রীতিপ্রদ তেমনই প্রয়োজনীয়। এই ঘটনা দার্জ্জিলিং সহরে মহামান্য বঙ্গশাসক শ্রীলশ্রীযুক্ত লর্ড্ কারমাইকেল বাহাদুরের সহিত শরৎবাবুর সাক্ষাৎকার। এই সময়ে মহামতি বঙ্গেশ্বর তাঁহার সহিত কথা-

প্রসঙ্গে বাঙ্গালীজাতি ও বাঙ্গলাভাষার প্রতি যেরূপ অমায়িক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বঙ্গবাসিমাত্রেরই যে একান্ত কৃতজ্ঞতাভাজন ও অকৃত্রিম প্রীতিভক্তির পাত্র, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা ও উহাতে অভিজ্ঞতালাভই তাঁহার বঙ্গানুরাগের অন্যতর নিদর্শন।

সংপ্রতি এই মহাত্মা স্বদেশগমন করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড্ রোণাল্ড্সে বাহাদুর বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনিও নিজ নয়নৈপুণ্যে ও সদাশয়তাগুণে বঙ্গে প্রজারঞ্জন তথা রাজগৌরব সংবর্দ্ধন করিয়া ধন্য ও চিরস্মরণীয় হইবেন, এতদৃশ আশান্বিত হৃদয়ে আমরা এই বর্ত্তমান বঙ্গশাসক মহোদয়ের তথা মহামহিমার্ণব ব্রিটিশ্ সম্রাটের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক এই গ্রন্থের উপসংহার করিলাম।